চতুর্থ অধ্যায়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পের বিষয়ভাবনা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত্তোর পটভূমিতে খুব স্বাভাবিকভাবেই কয়েকটি বিশেষ প্রবণতা বাংলা সাহিত্যের লক্ষণে ধরা পড়েছিল—

প্রথমত, আন্তর্জাতিক জীবনবোধ ও ফ্যাসিবাদ বিরোধিতা।

দ্বিতীয়ত, সমকালের ঘটনাবলি ও রাজনৈতিক আলোড়ন।

তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক সংকট ও তার প্রভাব।

চতুর্থত, বিশ্বসাহিত্যের প্রভাব—ফ্রয়েডীয় মনোসমীক্ষণ ও মার্কসীয় তত্ত্বভাবনা প্রভৃতি।

সমসাময়িক সমাজকে আলোচ্য প্রভাবগুলি যেমন উদ্দীপ্ত-প্রভাবিত করেছে তেমনি করেছে সমকালের সাহিত্যকেও। এরই মাঝে চলেছে সাহিত্যিকদের নতুন পথের অন্বেষণ। প্রেমেন্দ্রও এই সময় দ্বারা প্রভাবিত- আলোড়িত হয়েছেন; খুঁজেছেন এরই মাঝে সাহিত্যের বিষয় ও আঙ্গিক। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ২২শে জুন হিটলার কর্তৃক সোভিয়েত রাশিয়া আক্রান্ত হলে প্রগতিমনস্ক বুদ্ধিজীবীরা ফ্যাসিস্টদের বিরোধিতায় সরব হয়ে ওঠেন। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ১৯শে জুলাই লেখক -শিল্পী -বুদ্ধিজীবীদের এক প্রশস্ত বিবৃতি প্রকাশিত হয়। বিবৃতিটির শিরোনাম ছিল—'মানব কল্যাণে সোভিয়েটের অবদান : নাৎসী সামরিক অভিযানে পৃথিবীর ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা :

সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতি বাংলার মনীষীবৃন্দের সহানুভূতি।'—এই বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে বহু শুভবোধসম্পন্ন মানুষের সঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্রেরও নাম ছিল। প্রেমেন্দ্র যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে প্রত্যক্ষভাবে সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল এটি তার প্রমান। বাংলার ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলন বিপুলভাবে আলোড়িত হয় ঢাকার তরুণ কমিউনিস্ট শিল্পী সোমেন চন্দের হত্যাকাণ্ডের পর, ১৯৪২ খিস্টাব্দে। মাত্র একুশ বছর বয়সে সম্ভাবনাময় ছোটগল্পকার সোমেন চন্দের মৃত্যু হয় জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দলের সশস্ত্র আক্রমণে। সোমেন চন্দের মৃত্যুর অভিঘাতে বাংলায় গঠিত হয় 'ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ'। দলমতনির্বিশেষে সাহিত্যসেবীরা মিলিত হয়েছিলেন সেই মঞ্চে। প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রথমাবধি যুক্ত ছিলেন এই সঙ্ঘের সঙ্গে। এই সঙ্ঘের দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারির মাঝামাঝি, কোলকাতায় 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' হল-এ—এখানে মূল সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। এই সম্মেলনে সংঘের গঠিত নতুন কমিটির সভাপতিও নির্বাচিত হন প্রেমেন্দ্র মিত্র। 'জনযুদ্ধ' পত্রিকায় ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে সভাপতি হিসেবে প্রেমেন্দ্র যে ভাষণ দিয়েছিলেন তার সারাংশ ছাপা হয়েছিল সেখানে। দেখা গেছে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন প্রেমেন্দ্র। এছাড়া ফ্যাসিবিরোধী বিভিন্ন সংকলন গ্রন্থের অনেকগুলিতেই স্থান পেয়েছে প্রেমেন্দ্র মিত্রের রচনা। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয়েছিল একটি প্রবন্ধ সংকলন। ঐ সংঘের পক্ষ থেকে প্রকাশিত ঐ সংকলনে প্রায় পনেরো জন লেখক প্রত্যেকের 'কেন লিখি' —এই কৈফিয়ৎ-এর সঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্রও লিখেছিলেন। এই প্রবন্ধে প্রেমেন্দ্র তাঁর লেখার কারণ 'মানসিক বিলাস' নয় 'জীবনের বিরাট বিপুল দায়' বলেই উল্লেখ করেছিলেন। তাঁর সমসময়ে এই কারণেই তাঁর জীবনে রাজনৈতিক ও সাহিত্যগত সংযুক্তি ঘটেছিল। কিন্তু, ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে ইতালি-জার্মানি-জাপান জোট পরাজিত হলে ফ্যাসিবিরোধী কর্মোদ্যমের প্রয়োজনীয়তা কমে আসে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির পরিবর্তন হয় স্বাধীনতালাভের পর। সমাজতন্ত্রবাদ প্রেমেন্দ্রকে প্রভাবিত করলেও, কমিউনিজম প্রেমেন্দ্রকে ততখানি স্বাচ্ছন্দ্য দেয় নি। তাছাড়া, ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ থেকেই প্রেমেন্দ্র চলচ্চিত্র নির্মাণের সঙ্গে ক্রমেই জড়িয়ে পড়েছিলেন। তাই দীর্ঘকাল প্রত্যক্ষভাবে 'প্রগতি' শিবিরের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সংযোগ রাখা তার পক্ষে

সম্ভব হয়নি। তবে মানবতাবাদী সংগঠনগুলির সঙ্গে মানসিক সংযোগ যে তার ছিলই তার প্রমাণ ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে 'ভারতীয় প্রগতি লেখক সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠিত হলে তখন তার প্রাদেশিক শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন প্রেমেন্দ্র মিত্র। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে প্রেমেন্দ্র ছিলেন প্রতিষ্ঠিত কবি। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের পরে সাহিত্যচর্চা ছাড়া অন্য কোনো জীবিকার সঙ্গে প্রেমেন্দ্র নিজেকে যুক্ত করেন নি। এ সময় শারীরিকভাবেও তিনি দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। বিশেষত দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। ত সত্ত্বেও ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বহু সাহিত্যে তার সক্ষমতার প্রকাশ দেখা গেছে। কিন্তু, ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দের পরে তাঁর ছোটগল্প তেমন পাওয়া যায় নি। বিশ ও তিরিশের দশকে বাংলা ছোটগল্পে যে নতুন দিগন্ত প্রেমেন্দ্র উন্মোচিত করেছিলেন পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে সেখানে নতুন কোন চমক আর সৃষ্টি হয়নি। তবে, চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে যে সব প্রতিভাবান সাহিত্যিক সৃষ্টিশীল হয়ে উঠেছিলেন, অভিনন্দিত হয়েছিলেন অভিনবত্বে,প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁদের পূর্বসুরী। ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত সৃষ্টিশীল ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং তাঁর অসংখ্য বিচিত্র সাহিত্যকীর্তির মধ্যে প্রধানতম সংরূপ নিঃসন্দেহে তাঁর লিখিত ছোটগল্পগুলিই।

১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে পরবর্তী মোটামুটি সত্তরের দশক পর্যন্ত প্রেমেন্দ্র রচিত গল্পগ্রন্থের এবং গল্প সংকলনের সংখ্যা মোট ষোলটি। তবে 'অঙ্কে মেলেনা' এবং 'অরণ্যপথ'-এ দুটির গল্পগ্রন্থ ও তাদের অন্তর্ভুক্ত গল্পগুলির সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। এছাড়া অন্যান্য গল্পসংকলন ও তাদের অন্তর্ভুক্ত গল্পগুলি হল—

১. 'কুড়িয়ে ছড়িয়ে' [১৯৪৬ খ্রিঃ] — 'ষ্টোভ', 'জ্বর', 'চিরদিনের ইতিহাস', 'এক অমানুষিক আত্মহত্যা', 'পিস্তল', 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার', 'পটভূমিকা'।

২. 'সামনে চড়াই' [১৯৪৭ খ্রিঃ] — 'সামনে চড়াই', 'ময়ূরাক্ষী', 'পলাতকা', 'লেভেল ক্রসিং', 'নিরুদ্দেশ', 'পান্থশালা', 'কালবৈশাখী'।

৩. 'সপ্তপদী' [১৯৫৫ খ্রিঃ] — 'মল্লিকা', 'রবিনসন ক্রুশো মেয়ে ছিলেন', 'আয়না', 'যূথিকা', 'দাতা', 'ভিজে বারুদ', 'পাহাড়'।

৪. 'জলপায়রা' [১৯৫৮ খ্রিঃ] — 'জলপায়রা', 'দৃষ্টি' এবং 'কুড়িয়ে ছড়িয়ে' সংকলনটির সঙ্গে উক্ত

দুটি গল্প যোগ করা হয়েছে।

৫. 'প্রেমই ধন্বন্তরি' [১৯৫৯ খ্রিঃ] — 'আদ্যক্ষর', 'বাসস্টপ', 'ছবি', 'বিপদ মানে বিপদবারণ', 'নাম নেই', 'বই', 'একটি কড়া টোস্ট', 'প্রেমই ধন্বন্তরি'।

৬. 'যখন বাতাসে নেশা' [১৯৬২ খ্রিঃ] — 'যখন বাতাসে নেশা', 'বেইমান বাটকারা', 'রূপান্তর', 'নিরুদ্দেশ'।

৭. 'ক্বচিৎ কখনো' [১৯৬২ খ্রিঃ] — 'মৃদুলা', 'হারানো মেয়ে', 'বাঘ', 'সাপ', 'ভুল', 'অলভ্যা', 'ছায়াকায়া', 'ম্যাজিক', 'নাম নেই', 'ক্বচিৎ কখনো', 'দেখা', 'ছেদ', 'কালো জল', 'গল্পে নেই'।

৮. 'শ্রাবণে ফাল্গুনে' [১৯৬৫ খ্রিঃ] — 'মুক্তি', 'মেয়েটি', 'বিপরীত', 'মুহূর্ত', 'একটি পুরনো স্মৃতি', 'মন্দির', 'নূতন বাসা', 'অভিনয়', 'আট্যম', 'সখীর দলের মেয়ে', 'গল্পে ধরে না', 'বাসস্টপ'।

৯. 'সালঙ্কারা' [১৯৬৬ খ্রিঃ] — 'ঘটনা সামান্য', 'ছেঁড়া চিঠি', 'রোদ', 'শরবী', 'ফোন', 'কালবৈশাখী', 'লেভেল ক্রসিং'।

১০. 'হাতে হাত রাখো' [১৯৬৭ খ্রিঃ] — (নামহীন দুটি গল্পের দীর্ঘ সংকলন)।

১১. 'অষ্টপ্রহর' [১৯৭৩ খ্রিঃ] — 'দর্পণ', 'বিধাতা', 'বিদেশিনী', 'ট্রাঙ্ককল', 'তুলনা', 'ঘুম নেই', 'যষ্টিরূপে তমোনাশ', 'ইকেবানা'।

১২. 'সবুজে সোনায়' [১৯৭৫ খ্রিঃ] — 'যখন বাতাসে নেশা', 'ময়ূরাক্ষী', 'বেইমান বাটখারা'।

১৩. 'নির্বাচিতা' [১৯৭৬ খ্রিঃ] — বিভিন্ন গল্পগ্রন্থ থেকে গৃহীত গল্প সংকলন।

১৪. 'সংসার সীমান্তে' [১৯৭৭ খ্রিঃ] — 'সংসার সীমান্তে', 'মল্লিকা' প্রভৃতি গল্প এবং 'দর্পণ', 'কঠিনা', 'অন্বেষণ', 'ট্রাঙ্ককল', 'যষ্টিরূপে তমোনাশ' প্রভৃতি গল্পগুলির সংকলন।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পের দ্বিতীয় পর্ব অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ প্রথম পর্বের তুলনায়। ফলে, সময়গত নানা বৈশিষ্ট্যে এ সময়ের গল্পও বিচিত্র। আবার, অভিজ্ঞতায় তা অনেক বেশি সমৃদ্ধও বটে। প্রথম পর্বে উল্লেখিত গল্পগুলিতে সে অর্থে প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে সংযুক্ত কোন গল্প প্রেমেন্দ্র লেখেন নি। প্রাক্ স্বাধীনতার যুগে অবশ্য স্বাদেশিকতার সুর প্রেমেন্দ্রের মনে ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উত্তরকালে মানবতাবোধ ও মানবপ্রেমে উদ্বোধিত কবি স্বাধীনতার প্রতিও ক্রমশ যেন আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেছেন। রাজনৈতিক মতাদর্শের অভাব, চোরাবাজার, মধ্যবিত্তের সর্বহারা হয়ে পড়া প্রভৃতি ক্রমশ প্রেমেন্দ্রের সামনে সামাজিক

হতাশাকেই প্রতিষ্ঠিত করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উত্তর পর্বে তাই বাঁচার সংগ্রাম, আদর্শহীনতা, অর্থনৈতিক সংকট, মূল্যবোধহীনতা, মন্বন্তর প্রভৃতি বিষয় তাঁর ছোটগল্পে মানুষের অবনমনকে স্পষ্ট করে তুলেছে। এ পর্বে প্রেমেন্দ্র ক্রমেই হয়ে উঠেছেন মননঋদ্ধ এক শিল্পী। জীবনের নিছক রূপকার তিনি নন, তিনি মর্মভেদী বিশ্লেষক। জীবনের ভাঙন ও অবক্ষয়ের স্বরূপ উন্মোচনে তিনি অকম্পিত, আবার জীবনের জটিলতার তিনি নিপুণ বিশ্লেষক।

তাই, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পের শ্রেণীবিচার প্রথম পর্বের মত দ্বিতীয় পর্বেও কিছু ভিন্ন স্বাদের গল্প পাওয়া যাচ্ছে যা প্রথম পর্বের চেয়ে স্বতন্ত্র। যেমন—প্রতীকী গল্প ও হাস্যরসাত্মক গল্পগুলি। প্রতীকী গল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—বাঘ, সাপ, যষ্টিরূপে তমোনাশ প্রভৃতি গল্প। তাই, প্রেমেন্দ্র মিত্রের দ্বিতীয় পর্ব অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উত্তর পর্বে প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পগুলিকে স্বাভাবিকভাবেই কয়েকটি বিশেষ শ্রেণী হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে —

প্রথমত, যুদ্ধোত্তর সামাজিক চেতনামূলক গল্প—'গল্পে নেই', 'সামনে চড়াই', 'পাহাড়', 'চিরদিনের ইতিহাস', 'ভিজে বারুদ', 'ময়ূরাক্ষী', 'যখন বাতাসে নেশা'।

দ্বিতীয়ত, সামাজিক পটপরিবর্তনের গল্প — 'আয়না', 'ম্যাজিক', 'দর্পণ', 'সখীর দলের মেয়ে', 'পিস্তল'।

তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক সংকট ও মূল্যবোধহীনতার গল্প — 'জ্বর', 'চুরি', 'হারানো মেয়ে', 'মেয়েটি বিধাতা'।

চতুর্থত, রোমান্টিক গল্প — 'অলভ্যা', 'মৃদুলা', 'ছেদ', 'ক্বচিৎ কখনো', 'হাতে হাত রাখো', 'রোদ', 'বৃষ্টি'।

পঞ্চমত, প্রতীকী গল্প — 'বাঘ', 'সাপ', 'যষ্টিরূপে তমোনাশ', 'লেভেল ক্রসিং'।

ষষ্ঠত, মনস্তাত্ত্বিক গল্প — 'মন্দির', 'দেয়াল', 'ছেদ', 'ছায়াকায়া', 'অসমাপিকা', 'কলকাতার আরব্য রজনী'।

সপ্তমত, হাস্যরসাত্মক গল্প — 'আদ্যক্ষর', 'বিপদ মানেই বিপদ বারণ', 'সভাপতি খুঁজতে নেই', 'পরোপকার', 'ট্রাঙ্ককল'।

অষ্টমত, চিত্রনাট্যের আদলে লেখা গল্প — 'ইকেবানা', 'ঘটনাসামান্য'।

নবমত, দাম্পত্যজীবন ভিত্তিক গল্প — 'মল্লিকা', 'কালো জল', 'ষ্টোভ', 'যুথিকা' প্রভৃতি।

বর্তমান অধ্যায়ে আলোচ্য শ্রেণীভুক্ত গল্পগুলির যথাসাধ্য বিশ্লেষণই আমাদের উদ্দেশ্য —

যুদ্ধোত্তর সামাজিক চেতনামূলক গল্প —

এই পর্বেই এ ধরনের গল্প লেখার শুরু। রাজনীতি, পরিবর্তিত সমাজ এ ধরনের গল্পের অন্যতম বিষয়। যেমন 'গল্পে ধরে না' গল্পটি। 'শ্রাবণে ফাল্গুনে' (১৯৬৫ খ্রিঃ) গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত এ গল্পের প্রধান চরিত্র ম্যাথু। লোকটার বিবরণ দিয়েছেন এভাবে—'বছর ছাব্বিশ বেশ সুঠাম গড়নের জোয়ান। গায়ে একটা ফিকে নীল রঙের শার্ট আর কালো প্যান্ট।' (পৃ. ১০৫, গল্পে ধরে না, প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প, ৩য় খণ্ড) এবং লোকটা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। এই পরিচয় সূত্র ধরেই মূল গল্পটার সূত্রপাত। যদিও লেখক উল্লেখ করেছেন ম্যাথুর আগমন এদেশে প্রথম মহাযুদ্ধের পরে এবং ম্যাথুর সঙ্গে তার আলাপের স্বল্পকিছু সময়ের মধ্যেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালীন অভিজ্ঞতা হিসেবে আমরা গল্পটি বিবেচনা করতে পারি। অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বলে যাকে লেখকের মনে হয়েছিল সে লোকটি ম্যাথু। ম্যাথু লেখকের অফিসে ক্যান্টিন চালাত। তার চেহারা সম্পর্কে বিবরণ দিয়ে লেখক জানিয়েছেন—'এরকম একজন ইউরোপীয়ের পক্ষে আমাদের মতো প্রতিষ্ঠানের ক্যান্টিনের ভার পাওয়া যেমন আশ্চর্য তার পক্ষে সে ভার নিতে আসাও তাই।' (পৃ. ১৮৫, ঐ) এবং চা দিয়ে যাবার সময় ইংরেজিতে লেখক তাকে বলেছিলেন, 'বিস্কুট ছাড়া আর কিছু নেই।' (ঐ) উত্তর পেয়েছিলেন বাংলায় এবং এই সূত্রটি ধরে মূল গল্পে পৌঁছে গেছেন লেখক। তার পাশের সহকর্মীটি জানিয়েছেন যে ম্যাথু 'বাংলাই বলে' বরং ইংরেজি ভালো জানে না। বিস্মিত লেখককে তার সহকর্মী এও জানিয়েছিলেন ম্যাথু 'এদেশের লোক না।' (ঐ) কিন্তু, এতে লেখকের কৌতূহল নিবৃত্ত হয়নি। এরপর ক্রমশ তাকে নতুনভাবে আবিষ্কার করতে থাকেন। 'ম্যাথুর দুটি মাত্র শখের কথা তখন জেনেছি। একটি পোশাক-আশাকে ফিটফাট থাকা আর একটি যেখানে যত ছবি আসে সব দেখা।' (পৃ. ১৮৬, ঐ) কিন্তু, এতেও যেন অনুসন্ধান সম্পূর্ণ হয় নি। ম্যাথু সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন থাকলেও সৌজন্যবশত তা প্রকাশ করতে পারেননি লেখক। আর তার এও মনে হয়েছে যে ম্যাথুর 'অতীত স্মৃতিতে এমন একটা কিছু ক্ষত যেন

আছে যা নিজেই স্পর্শ করতে চায় না।' (পৃ. ১৮৬, ঐ) এই অনুভূতিতেই ম্যাথু সম্পূর্ণ হয়নি লেখকের কাছে। অপ্রত্যাশিতভাবে ম্যাথুর সেই আবরণ সরে গেছে এবং চেনা গেছে মূল মানুষটিকে সে ঘটনাটিও অদ্ভুত ও আকস্মিক। এর বর্ণনা দিয়ে লেখক বলেছেন—'ছুটির দিনে চৌরঙ্গি অঞ্চলের নামকরা একটি সিনেমা হলে একটি বিদেশি ছবি দেখতে গিয়েছিলাম। ইন্টারভ্যালের সময় দেখি আমার এক সারি আগে একটি সিটে ম্যাথু বসে আছে। ম্যাথুকে ওই সিটে ও ওই হলে দেখে একটু অবাকই হয়েছিলাম'। (পৃ. ১৮৬, ঐ)। এরপর সিনেমা হল থেকে বেরিয়েই ম্যাথু এসেছে লেখকের পিছুপিছু। লেখকের দেখেছেন ম্যাথু গম্ভীর। ভিড় ছাড়িয়ে ম্যাথু ও লেখক বসেছেন ফাঁকা একটি রেস্তোরায় এবং ম্যাথু এখানে উন্মুক্ত করেছে নিজেকে। সে সময়কালও লেখক নিজেই উল্লেখ করেছেন—'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হতে তখনো দেরি আছে।' (পৃ. ১৮৬, ঐ) এসময় নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার কথা বলেছে ম্যাথু চরিত্রটি। অভিজ্ঞতা সূত্রটি এনেছে ম্যাথুই। সে বলেছে—'আমি গেছিলাম ওই ট্র্যাভেলস দেখতে।' (পৃ. ১৮৭, ঐ) কি ছিল ঐ ট্র্যাভেলসে? লেখক জানাচ্ছেন 'প্যালেস্টাইন আর সিরিয়ার একটু ভাসাভাসা বিবরণ আর মামুলি ছবি।' (ঐ) আর, ম্যাথু জানিয়েছেন 'ওই সিরিয়াই আমার দেশ।' (ঐ) তারপরের কাহিনি খুবই সাধারণ, যুদ্ধোত্তর আর পাঁচটি অনাথ শিশুর মতই। প্রথম মহাযুদ্ধের পর যখন অগণিত পরিবার নিশ্চিহ্ন, মিত্রশক্তির মধ্যে ফ্রান্সের আধিপত্য সেখানে তখন যুদ্ধের অত্যাচারে নিশ্চিহ্ন পরিবারের এক অনাথ গ্রাম্য শিশু ম্যাথু ক্রমশ এগিয়ে গেল অনিশ্চিতের দিকে। এভাবেই যুদ্ধোত্তরকালের হতাশার ইতিহাস রচিত হয়। এবং রাজনৈতিক কূটৈষণায় হারিয়ে যায় মানুষ। কিন্তু, এরপরেই গল্পটি ব্যক্তিক অনুভূতির কেন্দ্রে পৌঁছে দেয় পাঠককে। ফরাসি সরকারের কাছ থেকে করুণাপরবশ হয়ে এক ভদ্রলোক এই অনাথ শিশুদের মধ্যে থেকে দু'জনকে দত্তক নিয়েছিলেন। দত্তক নেওয়া এই দুটি শিশুর অন্যতম ম্যাথু। সেই ভদ্রলোকের সহৃদয়তায় ম্যাথু আশ্রয়, ভরণপোষণ ও শিক্ষার সুযোগ পায় ভারতবর্ষে এসে। কিন্তু তাদের সাবালক হবার আগেই ভদ্রলোকের মৃত্যু হলে অজানা ভারতবর্ষে তারা সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় হয়। আশ্রয়হীন বালক দুটির অজানা পরিবেশ যেন পাঠককেও অনুভূতিতে আকুল করে তোলে। এখানেই রাজনৈতিক চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে লেখাটি। নিঃসঙ্গ মনে করে ম্যাথু নিজেকে, কোথাও সে মেলাতে পারে না, তার গোত্রের লোকেদের সঙ্গেও নয়, ভারতের মানুষের সঙ্গেও নয় এবং

সে সাধারণের মত নয়, কোথাও সে আলাদাও—'সাধারণ স্থূল সচেতনতার বেশি কিছু তার মধ্যে না থাকলেও স্বাভাবিক কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার চেষ্টাতেই সে মোটামুটি সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন কাটিয়ে দিতে পারত। কিন্তু তা সে পারে নি।' (পৃ. ১৮৮, ঐ) এইখানেই তার অনুভূতিতে সে গভীর, একাকী, নিঃসঙ্গ; তার শৈশব স্মৃতি সব মধুর নয়, তবু তা আত্মিক বন্ধনে জড়িত। সেই তার অন্তরঙ্গ একমাত্র, অন্যকিছুতে সে আত্মিক সাড়া পায় না, আর তাই সে নিজ যন্ত্রণায় নিদারুণ ভাবে স্পন্দিত হয় একাই। লেখক তার একক চেতনাকে বন্টিত করে উপদেশ দিয়েছেন—'নিজেকে কেন তুমি এমন একলা ভেবে দুঃখ পাও ম্যাথু? যেখানে মানুষ থাকে সেই তো তার দেশ।' (ঐ) এর উত্তরে ম্যাথু হেসে জানিয়েছে সে ইংরেজি জানে না, অথচ চেহারা—পোশাকের জন্য সে বাঙালিও হতে পারবে না, বলেছে—'যেখানে সত্যিকারের আত্মীয়তার কোনো ভিত নেই সেখানে নকল ধার করা সাজে তরে যাওয়ার চেয়ে লজ্জার আমার কাছে কিছু নেই।' (পৃ. ১৮৮, ঐ) এই উত্তরে ম্যাথু গভীর, অনবদ্য হয়ে উঠেছে, এরপরে লেখক যখন তাকে প্রশ্ন করেছেন তাকে ম্যাথু বন্ধু ভাবে কিনা? উত্তরে ম্যাথু স্পষ্ট বলেছে—'না, করিনা। আপনি লেখেন টেখেন জানি, লেখক হিসেবে আপনার কাছে আমি একটা নতুন ধরনের বই মাত্র (ঐ)।' ম্যাথুর এই উক্তি যেন মেকী ভদ্রতার বিদ্রূপ হয়ে উঠেছে, আর এই তীক্ষ্ম সংলাপে ম্যাথুর আত্মিক সংকট স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বস্তুত, গল্পটিতে যেন দুটি পর্ব বলে মনে হয়। এরপরের অংশে দেখা যাচ্ছে যে ম্যাথুকে, সে শৌখিনতা বর্জিত, উদাসীন। এই পরিবর্তনের কারণ জানতে অনুসন্ধিৎসু লেখক চিন্তান্বিত হয়েছেন। এরপরে রূপান্তরিত ম্যাথু নিজেই ধরা দিয়েছে। এসপ্ল্যানেড অবধি অফিস থেকে পাশাপাশি হেঁটে কার্জন পার্কে এসে বসেছেন তারা, এবং তখন ভূমিকা না করেই ম্যাথু বলেছে—'আমি সিরিয়ায় ফিরে যাব। খিদিরপুরে ডক অঞ্চলে খোঁজ নিয়ে আমি জেনেছি, কোনো মালের জাহাজে খালাসী হয়ে যদি নাও হয়, তবু অনেক সস্তায় সেখানে যাওয়া সম্ভব। তারই জন্য আমি পয়সা জমাচ্ছি।' (পৃ. ১৯০, ঐ) এরপরে ম্যাথু আরও অনুরোধ করেছে লেখককে তার জন্য পাশপোর্টের ব্যবস্থা করে দিতে। লেখক তাকে প্রশ্ন করলে ম্যাথু বলেছে—'সেই মাটিতেই তো আমার যুগযুগান্তরের শেকড়।' (ঐ) লেখক প্রত্যুত্তরে বলেছেন—'মানুষ গাছপালা না, ম্যাথু। চিরকালের শেকড় তার কোনো এক জায়গায় পোঁতা

থাকে না। গাছপালাও এক দেশ থেকে আর এক দেশে সমুদ্র পাহাড় পার হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। মানুষ তারও চেয়ে বেশি সচল।' (পৃ. ১৯০, ঐ)। কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি যেন কাগুজে তর্ক হয়ে দাঁড়ায় কারণ ম্যাথুকে তা স্পর্শও করে না। ইতিমধ্যে আবার, 'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে।' (১৯১, ঐ) এবং 'ম্যাথুকে কোনো সাহায্য করার দরকার হয়নি, সিরিয়ায় সে আজও যেতে পারেনি বলেই জানি।' (ঐ) এভাবেই ম্যাথুর চাওয়া পাওয়া হারিয়ে যায় যুদ্ধকালীন তৎপরতায়। সর্বোপরি এভাবেই 'ম্যাথুর মত নগন্য একজন মানুষের ইচ্ছা আর সংকল্প ধুলোর মত গুঁড়ো হয়ে গেছে ইতিহাসের বিরাট দুরন্ত রথচক্রতলে।' (ঐ) লেখকের এই উক্তিতে রাজনীতির বেড়াজালে মনুষ্যত্বের অবমাননা প্রতীয়মান হয়ে উঠেছে। গল্প সূচনায় ছিল—'ম্যাথু সত্যিকারের জীবন্ত মানুষ বলেই কোনো কাহিনীর চরিত্রে তাকে আঁটোসাটো কি ঢিলেঢালা করেও ধরানো যায় না।' (পৃঃ ১৮৫, ঐ)। এবং জীবন ব্যর্থ হয়ে যায় যুদ্ধ রাজনীতির চাপে, সে ইতিহাসও অব্যক্ত থেকে যায়। এভাবে সরল সত্যটিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন লেখক। ম্যাথুর কাহিনি তাই বিচ্ছিন্ন কোন কাহিনিমাত্র নয়, রাজনীতির আবর্তে সাধারণ মানুষেরই আবেগ-অনুভূতি হারিয়ে যাওয়ার গল্প। ম্যাথু তাই গল্পের চরিত্র মাত্র নয়, সে সাধারণ হয়েও অসাধারণ, গল্পের চরিত্র হয়েও বাস্তব। এইখানেই গল্পটি রাজনৈতিক ও মানবিক চেতনায় সমৃদ্ধ, সার্থক ও বলিষ্ঠ গল্প। গল্পের অতিরিক্ত তীব্র বাস্তবতাতেই এর উত্তরণ সমকালের যুগবৈশিষ্ট্য ধারণেই গল্প বিষয়ের অসামান্যতা—তাই 'গল্পে ধরেনা' নামকরণও সার্থক।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ও সমনামের গল্পগ্রন্থভুক্ত 'সামনে চড়াই' গল্পে এই রাজনৈতিক পটপরিবর্তন যেমন বিষয় হয়েছে, তেমনি গল্পটি গভীর সংবেদনশীলতাকে আশ্রয় করেছে। গল্পটির প্রধান চরিত্র মহিম। মহিমের আপাত পরিবর্তনের মধ্যেই বিপ্লবের বীজ বপিত হয়েছে এবং সেটাই গল্পটির প্রধান বিবেচ্য। গল্প থেকে জানা যাচ্ছে মহিম নামে এক বিপ্লবী চরিত্রের সঙ্গে গল্প কথকের পরিচয়—'প্রায় পনের বছর আগে কাশীর গোলকধাঁধার মত গলির একটি জরাজীর্ণ বাতির দোতলায়।' (পৃ. ৩১৯, সামনে চড়াই, প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প, ২য় খণ্ড)।

এই মহিম সে সময়কার বিপ্লবী যখন দেশের কথা ভাবাও 'যখন দণ্ডনীয় অপরাধ, ঘুমের মধ্যে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতেও যখন সাধারণ লোকে ভয় পায় তখন সেই যুগ চলছে।' (পৃ. ৩২০, ঐ)

স্বাধীনতা পূর্ব ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের একটি অনুপুঙ্খ চিত্র এ রচনাটির মধ্যে দিয়ে উঠে এসেছে। সে অল্পবয়স্কদের মনে 'চুপি চুপি উচ্চারিত কয়টি নাম শুনলে অদ্ভুত শিহরণ জাগে।'(ঐ) এরকমই একজন গল্প কথকের মহিমদা, যার অত্যাশ্চর্য কীর্তিকাহিনী প্রচারিত ছিল লোকশ্রুতিতে। একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে তাকে দেখার সুযোগ হয়েছে কথকের— 'কাশীর বিখ্যাত গলিকেও হার মানায় এমন একটি সঙ্কীর্ণ প্রায়ান্ধকার পথ দিয়ে মন্দির ও ধসে পড়া বাড়ির চত্বর পার হয়ে একটি শ্যাওলাধরা প্রাচীন দেউড়ির সামনে আমাদের দাঁড় করিয়ে রেখে আমাদের পথ প্রদর্শক বলেছে, 'দাঁড়া, আগে খবর দিয়ে আসি।' (ঐ) প্রায়ান্ধকার স্যাঁতস্যাতে সংকীর্ণ ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে উঠে আলোয় এসে চমকে গিয়েছিলেন কথক মহিমদাকে প্রথম দেখে। কারণ—'রাস্তাঘাটে চায়ের দোকানে হাজার হাজার যেসব লোক দেখা যায় তাদের থেকে আলাদা করবার মত কোন বিশেষত্বই সে চেহারায় চোখে পড়েনি।' (ঐ)।

আর তার পরণে 'একটি সস্তা টুইলের হাতকাটা সার্ট আর মিলের ধুতি।' (ঐ) এবং কথোপকথনের মাঝে হঠাৎই জিজ্ঞেস করেছিলেন তিনি 'দাবা খেলতে জানিস?' (পৃ. ৩২১, ঐ) তাকে দেখে হঠাৎ কথক চরিত্রের মনে হয়েছে 'এরকম আশ্চর্য অবিস্মরণীয় মুখ'(ঐ) কখনো তিনি দেখেননি। এরপর হঠাৎ কখনো রাস্তার ধারে ডেকে মহিমদা তাকে খাইয়েছেন গোলগাপ্পা। কখনো তার পিছনে ছায়ার মত লেগে আছে যে গোয়েন্দা তাকে নিয়ে ঠাট্টা করছেন—'ছায়ার মত পেছনে লেগে থেকেও একটুর জন্যে বেচারার দশ হাজার টাকার তোড়াটা ফস্কে গেল।' (পৃ. ৩২২, ঐ)। এহেন মহিমদার সঙ্গে থাকতেন গেরুয়া বসনধারী এক স্বামীজি। একদিন একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করেছেন কথক এবং সেদিনই বিশেষভাবে তিনি মহিমদাকে আবিষ্কার করেছেন — মহিমদার বাড়িতে গিয়ে তিনি দেখেছেন গেরুয়াধারী তাদের তৎপরতা, দেখেছেন স্বামীজি পাঞ্জাবী শিখের ছদ্মবেশ ধরেছেন এবং তাকে দেখে খিঁচিয়ে উঠেছেন—'যাও তাড়াতাড়ি'। (পৃ. ৩২২, ঐ) এরপর মহিমদা তাকে টেনে নিয়ে গেছেন 'ভাঙা দালান ঘরের পেছনে।' (ঐ) এরপর সুড়ঙ্গের মত অন্ধকার একটা নালা দেখিয়ে বলেছেন 'পারবি এর ভেতর দিয়ে যেতে? সাহস হয়?' (ঐ) যখন ঐ সুড়ঙ্গপথে যাওয়ার জন্য অগ্রসর হচ্ছেন গল্পকথক তখন মহিমদা তার কাঁধে হাত রেখে বলেছেন 'ভয় না থাকলে আর সাহসের দাম কি?' (পৃ. ৩২৩, ঐ) এবং তার হাতে ধরিয়ে দিচ্ছেন পুজোর ফুল বিল্বপত্রে ঢাকা একটি ছোট চ্যাঙারি। কথক সেটি যথাস্থানে

পৌঁছেও দিয়েছেন। এই ঘটনার পর হঠাৎ একদিন কথক খবর পেয়েছেন পুলিশের গুলিতে মহিমদার মৃত্যু হয়েছে। এবং তখনই তিনি যেন উপলব্ধি করেছেন—'স্বামীজির সেদিন উত্তেজনার কারণ এবার বুঝতে পেরেছিলাম। আমার জন্যেই দেরী হওয়ায় মহিমদাকে শেষ পর্যন্ত আহত হতে হয়েছে ভেবে মনটা একেবারে খারাপ হয়ে গিয়েছিল।' (পৃ. ৩২৩, ঐ) এই মহিমদাকেই অনেকদিন বাদে কথক দেখতে পেয়েছেন নগণ্য পাণ্ডববর্জিত লোকালয়ে এবং দেখে বিস্মিত হয়েছেন—'ধারের বড় বড় গাছগুলোর ঝাঁকড়া ডালপালা আকাশের তারার আলোককেও ঢেকে রেখেছে। ক্ষণিকের জন্যে রাত্রিরসমস্ত অন্ধকার শুধু একটা মুখকে স্পষ্ট করে তোলবার পশ্চাদপট হয়ে উঠল।' (পৃ. ৩০০, ঐ) এরপর মহিমদার সঙ্গে তার বাড়িতে গেছেন কথক। দেখেছেন 'ষ্টেশন থেকে যে রাস্তাটা বাজার ছাড়িয়ে পাঁচমুড়ির জঙ্গলের দিকে গেছে তারি পাশে মাড়োয়ারীদের পর পর কয়েকটা চালের কল। মহিমদা শুনলাম তেমনি একটি চালের কলের ম্যানেজার।' (পৃ. ৩১৯, ঐ) মহিমদার বাড়িতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল কথকের তা মোটেই সুখকর নয়, মহিমদা বলেছিল—'আগে থাকতে সাবধান করে দিই। বড় একলা ষেঁড়ে লোক তো বৌদি। অতিথি সজ্জন পছন্দ করে না মোটে।' (ঐ) আর লেখক দেখেছিলেন বৌদির মুখ প্রসন্ন নয়, 'মহিমদার দিকে একবার ভ্রূকুটি করে আমাকে সম্পূর্ণরূপে অবজ্ঞা করে দোলনায় শায়িত শিশুটিকে কোলে নিয়ে তিনি আবার ভেতরে চলে গেলেন।' (ঐ) দ্বিধা জড়িত পদে ঐ বাড়ি থেকে বেরিয়ে কথক ভেবেছিলেন যে মহিমদার বাড়িতে আর আসবেন না। কিন্তু, 'কৌতুহল বড় বেয়াড়া বস্তু। মহিমদার রহস্যটা উদ্ধার না করে এ জায়গা থেকে চলে যেতে কিছুতেই মন সরল না।' (পৃ. ঐ) তারপর পাঁচমুড়ির রাস্তায় মহিমদাকে নতুন করে আবিষ্কারের চেষ্টায় কথক গেলেন মারোয়াড়ী মহাজনের চালের কলে এবং সেখানে মহিমদাকে দেখে তার মনে হল 'যে কোন জায়গাতে যে কোন আবেষ্টনের সঙ্গেই নিজেকে তিনি এমনভাবে মিশখাওয়াতে পারেন যে এতটুকু বিসদৃশ ঠেকে না।' (পৃ. ৩২৩, ঐ)। সেখানে বিচিত্র আবহাওয়ায় মিশে গেছেন মহিমদা এবং দিনের আলোয় দেখা গেল—'কপালে ও চোখের কোণে বয়সের যে রেখাগুলি দেখা দিয়েছে, এই চালের কলের চাকরীর ঝামেলা ও দারিদ্র্যের সঙ্গে নিত্য সংগ্রামের ক্ষতচিহ্ন' (পৃ. ৩২৪)। এরপর মহিমদার আরেকটি মূর্তি দেখা গেল, ঘটনাটি এই যে—গুটিদশেকজীর্ণশীর্ণ লোক এসেছিল চালের গুদামে, পরে জানা গেল

তার ভাগচাষী। তারা সুদ মকুবের আবেদন এমনকি কাতর অনুনয় করেছিল মহিমদার কাছে। কিন্তু, মহিমদার হৃদয় তাতে গলেনি। কঠিন মুখে তিনি বলেছিলেন—'পায়ে ধরেই তোরা সবখানে তরে যাবি কেমন? দশটাকা তো পায়ে ধরে পাবি। এ দশটাকা ফুরোলে কি করবি? চুরি ডাকাতি করবি না বাজার লুট করে খাবি।' (৩২৪, ঐ) এরই পাশাপাশি যখন হাটবারে 'অর্দ্ধ উলঙ্গ শীর্ণ কঙ্কালসার' বৃদ্ধ চাষী লাউ নিতে চেয়েছে এবং দু'আনা পয়সা দিয়ে কথক লাউ না নিয়েই ফিরতে চেয়েছে তখন মহিমদা বলেছেন ভিক্ষে না দিয়ে আত্মমর্যাদাকে সম্মান জানাতে। সুতরাং আপাতভাবে যে মহিমদাকে মনে হচ্ছিল রূপান্তরিত তিনি আদৌ তা হননি। এরপর জানা গেছে মহিমদার ব্যক্তিগত ইতিহাস যা তৎকালীন রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। ঘটনাক্রমটি এরকম যে—যেদিন কথক চ্যাঙারিটি পৌঁছে দিয়েছিলেন মহিমদা নির্দেশিত বাড়িতে সেখানে পুলিশের গুলিতে অচৈতন্য মহিমদার দীর্ঘদিন চিকিৎসা চলেছে। এমনই একদিনে যখন পুলিশের ভারী জুতোর আওয়াজ শোনা গেল ঐ বাড়িতে তখন মহিমদার শয্যায় বিছানার মশারি তুলে প্রবেশ করল অন্ধকারে একটি মেয়ে। গৃহকর্তা বললেন ঐ ঘরে তার বোন থাকে, মেয়েটি এল দৃঢ়পদে এবং জানা গেল সে বোবা। এরপর মূক ও বধির মেয়েটিকে বিবাহ করে দেশত্যাগ করেন মহিমদা। কথক প্রশ্ন করেন কিন্তু সেই থেকেই কি ওসব রাস্তা তুমি ছেড়ে দিয়েছ? (পৃ. ৩২৯, ঐ) আর উত্তরে মহিমদা যা বলেছেন তা যেন অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের জীবনভাষ্য হয়ে উঠেছে—'এইসব মানুষকে খুঁজে বের করতে হবে, এই লাভ এর বীজের মত তাদের ইজ্জতের বীজ ছড়িয়ে নতুন করে চাষ করতে হবে অনেক যুগের মরা, পাথুরে জমিতে। সবচেয়ে কঠিন সে সাধনাই আমাদের সামনে।' (ঐ) বিপ্লববাদ, রাজনীতি, আন্দোলন এবং পরিবর্তনশীলতা এভাবেই আলোচ্য গল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে। মহিমদা একটি বিশেষ শ্রেণীর প্রতীক শুধু নয়, এই বিশেষ সময়ের প্রতিনিধি হয়ে উঠেছেন। এবং পরিবর্তনের যারা রূপকার তাদের লড়াই যে নিরন্তর চলতে থাকে নামকরণের মধ্যে দিয়ে তাই ইঙ্গিত দিয়েছেন লেখক। 'সামনে চড়াই' তাই আক্ষরিক অর্থেই বিপ্লববাদের আদর্শপথকে চিহ্নিত করেছে।

'সপ্তপদী' (১৯৩৫ খ্রিঃ) গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'পাহাড়' গল্পে কেন্দ্রীয় বিষয় বিপ্লবীদের আত্মগোপন ও আদর্শবাদ। এই বিষয়কে কেন্দ্র করেই আলোচ্য গল্পটি গড়ে উঠেছে। গল্পের প্রধান চরিত্র শশধর।

শশধর তার স্ত্রী মেনকাকে নিয়ে চলে যায় এক অজানা শহরে এবং শশধর বেছে নেয় দোকান করার পেশা। মেনকা প্রশ্ন করলে উত্তর দিয়েছিল—'লুকাতে যদি হয় তো হাটের ভিড়েই সবচেয়ে সুবিধে'। (পৃ. ২৭৭, পাহাড়, প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প, ২য় খণ্ড) অথচ শশধর দোকান নিয়ে ভাবিত নয়। সে গতানুগতিকভাবে বাকি জীবন কাটাতে প্রয়াসী হয়েছে। আবার, প্রতিমুহূর্তে তাদের তাড়া করে বেরিয়েছে বিভীষিকা আর আতঙ্ক। তাই, একদিন সত্যিই পুলিশ এলে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে তাদের উত্তেজনা—'প্রায় তখন মাঝরাত। বাইরের দরজায় প্রচণ্ড ধাক্কার শব্দে ঘুম থেকে জেগে উঠেছিল। না, আর আশা নেই। এতদিন ধরে সভয়ে যে মুহূর্তের প্রতীক্ষা করছিল, তাই বুঝি এসেছে।' (২৭৭, ঐ) শশধর ম্লান হেসেছে আর মেনকা ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। কিন্তু উদ্বেগ তাদের প্রতিমুহূর্তে উদ্বেলিত করেছে, বিশেষ করে মেনকাকে। বিপ্লববাদের উত্তেজনা কিভাবে মেনকাকে প্রভাবিত করেছে ক্রমশ তাই গল্প বিষয় হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে, শশধরের আদর্শভ্রষ্টতাও হয়ে উঠেছে গল্পের অন্যতম আঙ্গিক। তাই, মেনকা যখন উত্তেজিত, শশধর তখন উদাসীন কিংবা অন্যমনস্ক—'শশধর আজকাল প্রায়ই অন্যমনস্ক থাকে। কী যে রাতদিন ভাবে কে জানে, কিন্তু এক ডাকে তার সাড়া পাওয়া আজকাল ভার।' (পৃ. ২৭৬, ঐ) কিন্তু, মেনকার 'জীবনে একটা উত্তেজনা ছিল। প্রতিমুহূর্তেই আশঙ্কাটাই একটা উত্তেজনা।' (পৃ. ২৭৭) ঐ উত্তেজনা কিন্তু তার নেভেনি। অথচ এর পূর্বের দিনগুলি—মেনকার স্মৃতি উদ্বেল হয়ে উঠেছে সেসব মনে করে—'এখানে চলে আসার সময়কার ঘটনাগুলো মেনকা কোনোদিন ভুলতে পারবে না। তার আগেই ঘরের কাগজ থেকে কিছু তার জানতে বাকি নেই। জেল থেকে যে কজন পালিয়েছিল তাদের প্রায় সকলেই তখন ধরা পড়েছে। পড়েনি শুধু একজন।' (ঐ) বস্তুত, মেনকা সেকথা ভুলতেও পারেনি। আমূল পরিবর্তন ঘটেছে শশধরেরই। অথচ এই শশধরই যখন বিদায় নেবার জন্য এসেছে তখন পুলিশের নজর এড়িয়ে অসীম দুঃসাহসে দিনেরবেলাতেই মেনকার সাথে দেখা করেছে। এ ঘটনাটিও মেনকার স্মৃতিতে উজ্জ্বল—'বাড়ির কেউই চিনতে পারেনি, সে নিজেই কি বুঝেছিল? কাটা কাপড়ের ওরকম জামা-সেমিজ-ফেরিওয়ালা রোজ কত আসে যায় বাড়িতে।' (পৃ. ২৭৮, ঐ) এই নাটকীয় সাক্ষাৎ পালটে দিয়েছিল আটপৌরে মেনকাকে, যে অনাথা, অপরের কৃপায় পালিত, সেও আদর্শে ভাবিত হয়েছিল। পুলিশের চিহ্নিত একমাত্র পালিয়ে যাওয়া অপরাধী শশধরের সাহস সেদিন মেনকাকে মুগ্ধ

করেছিল এবং এই মুগ্ধতার মূলে ছিল মহৎ আদর্শের উত্তেজনা। ঘরের বাইরে এজন্য মেনকাকে অনেক লাঞ্ছনা গঞ্জনাও সহ্য করতে হয়েছিল কিন্তু, মেনকা সবকিছু ভুলেছিল। কারণ—'সমস্তক্ষণ একটা তীব্র নেশার মধ্যে তার কেটেছে। দুরন্ত একটা উত্তেজনার ঢেউয়ের মাথায় এমন জায়গায় সে উঠে গেছে, তুচ্ছ ব্যথা বেদনা ক্ষোভ সেখানকার নাগাল পায় না।' (ঐ) আর সে কারণেই মেনকা সেদিনই শশধরের হাত ধরে অজানার উদ্দেশ্য পাড়ি দিতে তার দ্বিধা হয় নি। জীবন রস রসিকতা ও মহত্বের প্রতি ভাবাবেগে শশধরের সেদিন এতে সায় ছিল। তাই সে বলেছিল তা মন্দ হয় না। লুকোবার পক্ষে শাড়ির আড়াল এখনো বেশ নিরাপদ।' (ঐ) এই জীবনীসক্তি এবং বিপ্লব আদর্শ তার জীবনীশক্তিরও উৎস ছিল। এরপরেই শুরু হবে তাদের অনিশ্চিত জীবনযাত্রা। মেনকা জানত চিরস্থায়ী কোন সংসার তারা পাততে যাচ্ছে না। এই উত্তেজনাও তাকে আবিষ্ট করেছিল—'কায়েমী করে সংসার পাতা থাকে বলে মেনকা তা কোনদিন পাততে চেষ্টা করেনি। কিজন্যে করবো কোনদিন কোন মুহূর্তে হঠাৎ এক কাপড়ে বেরিয়ে যেতে হবে কে জনে!' (পৃ. ঐ) এরই মাঝে যেন প্রতীকী হয়ে উঠেছিল পশ্চিমের জানলা দিয়ে দেখতে পাওয়া পাহাড়। প্রথম দিকে এই পাহাড় ছিল মেনকার বিলাস এবং ক্রমে সেটাই হয়ে উঠেছে তার ধ্যান জ্ঞান। এভাবেই উত্তেজনার আবেশক্রমে মেনকার চরিত্রের এবং মননের সঙ্গে অনুসৃত হয়ে গিয়েছে এবং মেনকার ক্রমে মনে হয়েছে—'ধূ ধূ করা প্রায় নিষ্পাদপ প্রান্তরের ওধারে ধূসর একটা নিঃসঙ্গ পাহাড়। তাদের নিরুদ্দেশ জীবনের সংকেত যেন তারমধ্যে মূর্ত হয়ে আছে।' (ঐ) এই আশাবাদ, এই স্বপ্নকে এক অর্থে বলা যেতে পারে মেনকার ক্রম উত্তরণ। এই অনুভূতি হয়েছে তার অজানা শহরে পাঁচ বছর থাকার পর। তখন শশধরের মধ্যে উত্তেজনা থিতিয়ে এসেছে কিন্তু মেনকার মধ্যে সে উত্তেজনা বেড়েছে —'রাত্রে সেই জ্বলন্ত পাহাড়টাই তার স্বপ্নের মধ্যে দেখা দিয়েছিল। পুলিশের ভয়ে শশধরের সঙ্গে সে যেন পাহাড়টায় আশ্রয় নিয়েছে। তারা যত প্রাণপণে ওপরে উঠেছে, লেলিহান একটা শিখার বেষ্টনী তত তাদের পিছু পিছু এগিয়ে গেছে। কিন্তু শশধর কিছুতে আর উঠতে রাজী হয় নি।' (ঐ)। স্বপ্নে শশধরের উঠতে রাজী না হওয়া ও একলাফে আবেষ্টনী পেরিয়ে যাওয়া শশধরের গা বাঁচানো মানসিকতার প্রতীক হয়ে উঠেছে। আর এগিয়ে যাওয়া মানসিকতায় মেনকা বিপ্লববাদকেই প্রশয় দিয়েছে। আর শশধরের অন্যমনস্কতা ক্রমে অন্যরকমের হয়ে উঠেছে। ক্রমে মেনকার

সন্দেহ সত্যে পরিণত হয়ে উঠেছে এবং প্রতিকায়িত জানালার পাল্লাটা ভেঙে গেছে—'উড়িয়ে নিয়ে যাবার মতো দমকা হাওয়ার ভয় কিন্তু একদিন, একেবারে কেটে গেল। পেরেক ঠোকা ভাঙা জানালার পাল্লাগুলো সে ঝড়ের ধাক্কা সামলাতে পারেনি?' (পৃ. ২৭৯, ঐ) অর্থাৎ উত্তেজনা কেটে গিয়ে ক্রমশ যেন শশধর - মেনকা সম্পর্ক সাধারণ মধ্যবিত্তের মত হচ্ছে এবং যখন জানা গেছে যে শশধর মুক্ত তখন সে বলেছে —'যা ছিল আমাদের ক্ষমাহীন অপরাধ, তাই এখন পরম কীর্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর আমাদের ভয় নেই।' (ঐ) এই আশ্বাস শশধরকে নিশ্চিন্ত করেছে, স্বস্তি দিয়েছে একমাত্র তখনই শশধরকে উত্তেজিতও দেখা গেছে। অথচ মেনকার ধরণটা কিছু আলাদা— 'উত্তেজনাটা সংক্রামকভাবে তার মধ্যেও যেন ছড়িয়ে গেল। সভয়ে অথচ উজ্জ্বল মুখে সে জিজ্ঞাসা করলে 'এখানে আর থাকা চলবে না বুঝি।' (ঐ) এখানেই উভয়ের পার্থক্য ধরা গেছে এবং দুজনের কাছে দুটি বিষয় খুবই তাৎপর্য হয়ে উঠেছে। শশধর বলেছে 'এবার পাল্লা দুটো নিজেরাই সারিয়ে ফেলব কী বল? আর তো যখন তখন যাবার ভয় নেই।' (ঐ) মহৎ আদর্শগত হয়ে গৃহী জীবনে নিশ্চিন্ত জীবনযাপনে আগ্রহী হয়েছে শশধর আবার মেনকা দেখেছে যে ঝড়বৃষ্টির পর পাহাড় ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তাদের ভবিষ্যতের মতই যেন সমস্ত ধূসরতা, অনিশ্চিতের ধোঁয়াশা কেটে গেছে পাহাড়টার। তাই তার মনে হয়েছে— 'পাহাড়টা স্পষ্ট কিন্তু, সেইজন্যেই কি কেমন একটু কুৎসিত।' (ঐ) গৃহী জীবনের স্বাভাবিক স্পষ্টতা সত্ত্বেও তাদের দাম্পত্যও হারিয়েছে যেন বৃহৎ আদর্শ। এখানেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে 'পাহাড়'-এর প্রতীকটিও। 'পাহাড়' নামে বিষয়টি ক্রমে এদের জীবনের সঙ্গে মিলে গেছে ক্রমেই—

প্রথমত, পাহাড় রোমান্টিক আদর্শের প্রতীক। তাই শশধর মেনকাকে বলেছে—'পাহাড়টা তোমার ধ্যান-জ্ঞান হয়ে উঠল যে।' (পৃ. ২৭৬, ঐ)

দ্বিতীয়ত, আবার, মহত্ত্বের - আদর্শের প্রতীক এটি। তাই 'নিষ্পাদপ প্রান্তরে ধূসর' নিঃসঙ্গ পাহাড়টিকে মেনকার দূরবর্তী হলেও মহত্ত্বর মনে হয়।

তৃতীয়ত, মেনকা নিজেই ভেবেছে যেন 'তাদের নিরুদ্দেশ জীবনের সংকেত' পাহাড়টিতে মূর্ত। তাই তাদের জীবনে পাহাড় ওতপ্রোত জড়িত।

চতুর্থত, একেবারে শেষে পাহাড়টা 'স্পষ্ট' এবং 'একটু কুৎসিত'। কেননা শশধর মেনকার

দাম্পত্য জীবন থিতু হচ্ছে, স্বাভাবিক হচ্ছে, কিন্তু তাদের আদর্শ হারিয়ে যাচ্ছে। বৃষ্টির পর পাহাড়টারও ধূসরতা কেটে গেছে। গল্পটিতে যে বিপ্লববাদের প্রসঙ্গ এসেছে তা স্মরণ করায় সশস্ত্র সংগ্রামী আন্দোলনকে। এখানে গল্পটি মানবিক ও সামাজিক আদর্শ চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।

১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'কুড়িয়ে ছড়িয়ে' গল্পগ্রন্থে স্থান পায় 'চিরদিনের ইতিহাস' গল্পটি। এটি আপাতভাবে একটি রূপক গল্প। এরই আড়ালে দেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ব্যাঘাত হয়েছে। সেইসঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে রাজনৈতিক চিত্র। যেমন—উপনিবেশিকতা, ধনতান্ত্রিক সভ্যতার বিকাশ প্রভৃতি। প্রতিটি প্রসঙ্গই অত্যন্ত সুনিপুণভাবে গ্রন্থিত হয়েছে। গল্প সূচনাতেই একটি বিভ্রান্তিকর অরাজক পরিস্থিতিকে রাখা হয়েছে যা অস্থির সময়কে ব্যাখ্যা করেছে। গল্পে সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেছে একটি হনুমান। গল্প নামে উল্লেখ আছে ইতিহাসের এবং ঔপনিবেশিকতার ইতিহাস, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্ব সময়কালের ঘটনা। আর ধনতান্ত্রিক সভ্যতার উত্থান ও বিস্তার দুই বিশ্বযুদ্ধ অন্তবর্তী সময়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সময়ের কথা উঠে এসেছে আলোচ্য গল্পটিতে। আবার অর্ন্তবর্তীর রাজনীতি, মধ্য সত্ত্বভোগীর উত্থান, অর্থনৈতিক সংকট—প্রভৃতি বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উত্তরকালে বাঙালি সমাজে তীব্র প্রভাব ফেলেছিল। এ বিষয়গুলি এসেছে আলোচ্য গল্পটিতে। অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়েরই রচনা এটি। আবার, রচনানামে উল্লেখিত আছে 'চিরদিনের' শব্দটি। তাই, সমকালের রাজনীতির পাশাপাশি গল্পটি মানবমনের অন্তর্নিহিত সত্ত্বাকে প্রকাশে চিরসত্যকে আশ্রয় করেছে। কিছু কিছু ঘটনা চিরকালীন।—সমকালের জন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তো বটেই, চিরন্তনও বটে। গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে বারশিঙার জঙ্গল। এই জঙ্গলে বাস হনু, হুতুম, চিতা, কেঁদো প্রভৃতির। এদের মধ্যে শিকারি হল চিতা ও কেঁদো। এরা শক্তিমানও বটে। নিরীহ প্রাণীদের হত্যা করে এরা শক্তির আধিপত্য বজায় রাখে এবং খাদ্যের রসদ জোগায় এদের দিয়েই। প্রতিমুহূর্তে এদের অত্যাচারে নিরীহ পশুরা অতিষ্ঠ। এই আবহটি যুদ্ধ পূর্ব সময়ের অর্ন্তবর্তী রাজনৈতিক পরিমণ্ডলটি স্মরণ করায় এবং এই পরিমণ্ডলটি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কেননা এখানেই দেশজ সম্পদ রক্ষা নিয়ে অর্ন্তবর্তী সংঘর্ষ প্রায় অনিবার্যই ছিল। এই পরিস্থিতিতে উন্নত বিশ্বের দেশগুলি বিশেষত ইংল্যান্ড কিভাবে কব্জা করেছিল এই দেশগুলি ও তার সম্পদের উপর তা আলোচ্য গল্পেরও বিষয় হয়েছে। গল্পে দেখা যাচ্ছে গল্পের পশুরাও কথা বলছে মানুষের ভাষায়।

এই ধরনটি লেখক নিয়েছেন ইংরেজি 'ফেবল্‌স'-এর অনুকরণে। আবার, বারশিঙা জঙ্গল শেষ পর্যন্ত দখল হচ্ছে ছ'পেয়েদের দ্বারা। এখানেই গল্পটির চিরন্তন আবেদন। মানুষের মধ্যেকার লোভ, হিংসার স্বরূপ এখানে মূর্ত হয়ে উঠেছে। তাই গল্পের শেষে হনু যে উক্তি করেছে তা যেন চিরকালীন বেদনা হয়ে উঠেছে—'কেঁদো আর চিতা তবু একটা দুটোর বেশি মারত না, এদের হাতে দলকে দল সাবাড়।' (পৃ. ১৭৩, চিরদিনের ইতিহাস, প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প, ২য় খণ্ড)।

আর পশুদের উপরেও আরোপিত হয়েছে মানবিক চরিত্র এবং বহুবর্ণিল অবয়বে সেগুলি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। যেমন, গেছো প্যাঁচার চরিত্রটি—'গেছো প্যাঁচা হুতুম নির্বিকার—ধ্যান গম্ভীর বুদ্ধমূর্তি যেন। আধবোজা চোখের তলা দিয়ে চিতার দিকে শান্তভাবে তাকিয়ে বললে, 'কাজটা কি ভাল হচ্ছিল বন্ধু—' (ঐ) আর চিতা বলেছে—'চুকলি খাবার পর গেছো প্যাঁচার এই ভণ্ডামি অসহ্য।' (ঐ) চরিত্রটি রাজনৈতিক বুদ্ধিদাতার কূটনৈতিক কুশলী চরিত্রটি প্রকাশ করেছে। আর তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে গল্প সূচনাতেই চিতা ও হুতোমের সংলাপ— 'চিতা নীচে থেকে ফ্যাঁস করে উঠল, দিনদুপুর বেলা মানে?' হুতুম গম্ভীরভাবে বললে, 'দিনরাতের বিচার আর নেই। অথচ তোমার ঠাকুরদা চাঁদনী রাতে পর্যন্ত রক্তপাত করত না।' (ঐ) এই যে পূর্বদিনের ইতিহাস 'ঠাকুরদা'র চরিত্র টেনে আনা তাও যেন নিবিড় সত্যকে পুনরাবিষ্কার। তাই, চিতা বলেছে—'শাস্তর মানবার জন্য উপোস করে মরতে হবে নাকি! ঠাকুরদা শাস্তর মানবে না কেন। তাদের তো আমার মতো সাত-সন্ধে নিরক্ত উপোস করতে হত না।' (ঐ) একথাও কিন্তু সময়ের প্রেক্ষিতে অনস্বীকার্য হয়ে উঠেছে। আর হনুর চরিত্রটি 'হনুর একটু বেশি কিচির-মিচির করা স্বভাব। সে বলেই চলল, এদিকে বুড়ো ময়াল যে কাচ্চাবাচ্চা সমেত ওইখানেই আড্ডা গেড়েছে সে খবর তো রাখেন না। জামগাছ থেকে সাবধান না করলে সেই রাতেই হয়ে গিয়েছিল আর কি।' (ঐ) বিবদমান পরিস্থিতিতে সকলেই বিপন্ন ও অস্থির, আর এই হনু সাধারণের দলে। প্রাণ বাঁচানোটাই তাদের দায়। তাই, কোনদিকেই যাবার জো নেই তার। হুতোম যদিও বলেছে—'থাবায় যারা নখ লুকায় তাদের আবার বিশ্বাস করে নাকি?' (পৃ. ১৭০, ঐ) বিশ্বাস ও কপটতা দুইই বিপরীত তাৎপর্যে এখানে উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু বিপদে এই হিংস্রদেরও রক্ষা না করে পারে নি তার স্বভাববশত। অথচ প্রাণ বাঁচাতে সেও মরিয়া। তাই হুতোমের পরামর্শে সে রাঙানুড়ির লোভ দেখিয়ে তরঙ্গিয়ার

বাইরে থেকে এনেছে দু'পেয়েদের। হনু এখানে বুদ্ধিহীন রাজনৈতিক আবর্তে জড়িয়ে পড়াদের দলে। আর, হতোমের একমাত্র দুর্বলতা সে দু'পেয়ে'। হুতোমের এই দুর্বলতাই তার সমাজের কাল ডেকে এনেছে। এখানে সেও পর অনুকরণকারী কুচক্রী। তাই সে বলেছে 'ওসব চারপেয়ের কম্ম নয়।' (ঐ) এখানে যেন তীব্র স্যাটায়ারকে স্পর্শ করেছেন লেখক। আর হনু বলেছে—'দু'পেয়ে বলেই না তোমার কাছে আমি পরামর্শের জন্য।' (ঐ) বুদ্ধির বিপরীত তাৎপর্য এখানে নিহিত রয়েছে। আবার হুতোমের দুর্বলতার সূত্র ধরেই তরঙ্গিয়া আর বারশিঙার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে উঠেছে। হুতোমের দুর্বলতা তার চারিত্রিক দৌর্বল্যকেই প্রকট করেছে। স্বজাতির প্রতি করুণা এবং পরজাতির সঙ্গে সাময়িক সুবিধার জন্য আপোস প্রভৃতিও গল্পের বিষয় হিসেবে এসেছে। এবং বিষয়টি বাস্তবোচিতও হয়েছে। অন্তর্দলীয় সংঘাতই তো ভারতবর্ষের বিদেশী শক্তির আমন্ত্রণে কূটৈষণা জুগিয়েছিল এবং তা বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনামাত্র নয়। আলোচ্য গল্পেও তাই পটভূমি হিসেবে ইঙ্গিত হয়ে এসেছে বিপন্ন সময়ের রাজনীতি—

'তরঙ্গিয়ার জঙ্গলে সত্যিই বড়ো গোলমাল। অবশ্য জঙ্গলে আর শান্তি কবে মেলে? জঙ্গলের বাসিন্দারাও সেকথা জানে না এমন নয়, তবু এত উপদ্রব তারা কখনো ভোগ করেনি। বনের ঘুপসি অন্ধকারে বসে শলা-পরামর্শ হয়। শোনা যায় হা-হুতাশ, কিন্তু সব চুপি চুপি।' (পৃ. ১৭০, ঐ) এ পরিস্থিতিতে সাধারণের অবস্থা, দারিদ্র্য, তুলিত হয়েছে তৎকালীন সময়ের সঙ্গে—'কালোয়ার গাউজের বউ ঢুলানির সঙ্গে হনুর দেখা। হাড্ডিসার চেহারা হয়েছে, গায়ের লোম গিয়েছে উঠে।' (পৃ. ১৭১, ঐ) এবং ঐ দুদর্শার তীব্রতা বোঝাতে ঢুলানির উক্তিই সার্বিক হয়ে উঠেছে—'আর চিতা হলেই বা কী! এখন চিতায় থাবা মারলেই হাড় জুড়োয়। এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না।' (ঐ) এই পরিস্থিতি অর্থনৈতিক দুরবস্থার চিত্রণও বটে। অন্যদিকে একটি প্রবচন—'পা নেই বুকে হাঁটে/ডিমের ছা মাকে কাটে।' (ঐ) ব্যবহার হয়েছে এখানে এবং এখানে এটি বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে — হিংস্রতা, বিরূপতা বোঝাতে। এই হিংস্রতা, চন্দ্রচূড় কিংবা কাল কেউটের নয়, বুড়ো ময়ালেরও বটে। এরা দুঃস্থকেই অত্যাচার করে, সবলদের বিরুদ্ধে নাড়তে চায় না—'ওই বারশিঙার জলার বুড়ো ময়াল একদিন কেঁদোর গায়ে পাক দিতে পারে না? তাতো দেবে না—তার বদলে হাড়-পাঁজরা ভাঙবে যত চিতল আর খাট্টা হরিণের।' (পৃ. ১৭১, ঐ) এর মধ্যে দিয়েও মানুষের আরেকটি চরিত্র ফুটে উঠেছে। এরই মাঝে পরিবর্তিত হয়েছে পরিস্থিতি—

'তারপর ক'বছর কেটে গিয়েছে। তরঙ্গিয়ার জঙ্গলের আর সে চেহারা নেই। জঙ্গল অনেক সাফ হয়ে গিয়েছে। কত গাছ যে কাটা পড়েছে তার ঠিক ঠিকানা নেই। হনু একই আছে, কিন্তু স্বজনবান্ধবহীন, তবু তার দেশ এই বন সে ছাড়তে পারেনি। 'তাই কোনোরকমে সে পড়ে আছে।' (পৃ. ১৭২, ঐ) আর হুতোম চোখে কম দেখে আজকাল—খুবই তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে। হুতোমেরও পরামর্শ দেওয়ার কিছু নেই, তাই সে বলেছে—'চোখ বুজে থাকতে শেখ, কিছু দেখতে হবে না।' (পৃ. ১৭৩, ঐ) যথার্থ সুবিধাবাদী রাজনীতিবিদের মত হুতোমের এই উক্তি সবকালেই প্রাসঙ্গিক আর হনুর অসহায়তায় নিষ্পেষিত সাধারণ মানুষের হাহাকার ধরা পড়েছে—এভাবেই গল্পটি নিজ তাৎপর্যে অসামান্য হয়ে উঠেছে।

'রবিনসন ক্রুশো মেয়ে ছিলেন?' গল্পটি 'সপ্তপদী' (১৯৫৫ খ্রিঃ) গল্পগ্রন্থে স্থান পেয়েছিল। আলোচ্য গল্পটি ঘনাদার গল্পের অন্তর্গত। গল্পটির মধ্যে হিউমারের একটি বিশেষ জায়গা রয়েছে। গল্পটিতে -এর মজাও রয়েছে। সাধারণত এ ধরনের মজলিসী গল্পে প্রেমেন্দ্র সবসময়ই একটি হালকা মেজাজ বজায় রেখেছেন। বিশেষত ঘনাদা সিরিজে ঘনাদারই আধিপত্য। প্রায়শই দেখা গেছে ঘনাদা যে কোন গল্প বিষয়কে তার নিজের মত করে ব্যবহার করেছে ঘনাদা। গল্পে এসেছে নানা মোড়, নানা তাৎপর্য—এভাবেই অভিনবত্ব সূচিত হয়েছে গল্পটিতে। আলোচ্য গল্পটিতেও আছে সেই অভিনবত্বের ছোঁয়া। গল্পে ঘনশ্যামবাবু রবিনসন ক্রুশোকে মেয়ে বলে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। রবিনসন ক্রুশোর অ্যাডভেঞ্চারকে তিনি স্বীকার করতে চাননি। আড্ডার মধ্যমণি ঘনশ্যামবাবু বাক্যজাল অযৌক্তিক হলেও তা সকলেই কার্যত মেনে নিতে বাধ্য হন—'ঘনশ্যামবাবুকে এ সভার প্রাণ বলা যেতে পারে, প্রাণান্তও অবশ্য তিনিই। এ আসর কবে থেকে যে তিনি অলংকৃত করেছেন ঠিক জানা নেই, তবে তাঁর আবির্ভাবের পর থেকে এ আসরের প্রকৃতি ও সুর একেবারে বদলে গেছে।' (পৃ. ২৪১, প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প, ২য় খণ্ড)।

আলোচ্য গল্পটির সূত্রপাত আড্ডাস্থলের অন্যতম 'মাথার কেশ যার কাশের মত শুভ্র' (ঐ)। সেই হরিসাধনবাবুর ছোট দৌহিত্রীটির সূত্রে। সে বলেছিল যে সে রবিনসন ক্রুশো হতে চায়। 'মস্তক যার মর্মরের মত মসৃণ' (ঐ) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক সেই শিবপদবাবু ড্যানিয়েল ডিফোর গল্পসূত্রের

প্রসঙ্গে বলেন 'যতদূর জনি আলেকজান্ডার সেলকার্ক বলে একজন নাবিকের জীবনের অভিজ্ঞতা শুনেই এ গল্প তিনি বানিয়েছিলেন।' (পৃ. ২৪২, ঐ) আর ঘনশ্যামবাবু একে সম্পূর্ণ উল্টো সূত্রে ব্যবহার করে বলেছেন যে গল্পটির লেখক রাস্টিসিয়ানো এবং কথক স্বয়ং মার্কোপোলো। পরে এ বিষয়ে কেউ কেউ সন্দেহ পোষণ করলে রহস্যময়ভাবে হেসে ঘনশ্যামবাবু বলেছেন—'তিনি সে গল্প সংগ্রহ করে এনেছিলেন মাত্র। সংগ্রহ করেছিলেন চীন থেকে? (পৃ. ২৪২, ঐ) এবং এখানে ইংল্যান্ড থেকে সে গল্পটি সরে গেছে চীনের দিকে। এখানে গল্পটি হয়ে উঠেছে রাজতন্ত্র বনাম ধনতন্ত্রবাদের বিবদমান চিত্র। চীনের ধনতান্ত্রিক সভ্যতার উত্থান যে গল্পটিতে বর্ণিত হয়েছে শুধু তাই নয়, ইতিহাস এবং রাজনীতিও অনুসৃত হয়ে গেছে গল্পটির সঙ্গে। এই ইতিহাস শুধুই পাশ্চাত্যতাত্ত্বিকদের বর্ণিত ইতিহাস নয়, এ ইতিহাসে বঞ্চিত সাধারণ ও উপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলির ইতিহাসও প্রকটতর হয়েছে। তাই ঘনশ্যামবাবুর মুখে করুণামিশ্রিত অবজ্ঞা ফুটে উঠল, 'আত্মম্ভরি ইংরেজ সাহিত্যিকরা আসল কথা চেপে গিয়ে যা লিখে গেছে তাই বিশ্বাস করেছেন।' (পৃ. ২৪২, ঐ) এখানে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের বিপরীত কথা বলেছেন ঘনশ্যামবাবু বলেছেন যে— জেনোয়ার কারাগারে যে সে কাহিনি বলেছিলেন মার্কোপোলো এবং সে কাহিনি লিখে রেখেছিলেন পিসার লোক রাস্টিসিয়ানো। ঘনশ্যামবাবুর ব্যাখ্যা—'মার্কোপোলোর অপূর্ব সব কাহিনী সেই ভাষায় তিনি ঢুকে রাখতেন। তাঁর সেই টুকে রাখা কাহিনীই সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছে তারপর। (পৃ. ২৪৩, ঐ) এভাবেই সম্পূর্ণ ভিন্ন তাৎপর্যে গল্পটি গড়ে তুলতে থাকেন ঘনশ্যামবাবু। কিন্তু, মূল গল্পটি বিবৃত হয় প্রশ্ন ওঠার পরে—কিন্তু রবিনসন ক্রুশো মেয়ে হলেন কী করে?' (ঐ) তখন ঘনশ্যামবাবু যে গল্পটি বলেন তা হল—সুং রাজবংশের রাজধানী কাইফেং শহরে বাস করতেন চুয়াং-উ নামে এক সদাগর। চুয়াং-উর কন্যা নান-সু ছিল অসাধারণ সুন্দরী। তার রূপের খ্যাতি সারা চীনে ছড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু, 'অসামান্য রূপ হয় নিজের, নয় সংসারের সর্বনাশ ডেকে আনে।' (পৃ. ২৪৩, ঐ) তাই-ই নান-সুর ক্ষেত্রেও ঘটল। উত্তরের কিতানরা তখন চীনে আধিপত্য বিস্তার করছিল। কিতান দলপতি চুয়ো-সান-এর কানে পৌঁছায় নান-সুর রূপ লাবণ্যের খবর। 'কাইফেং-এর নগর প্রাকারের ধারে তার দুরন্ত সৈন্যবাহিনীকে থামিয়ে চয়ো সান তার সন্ধির শর্ত সুং রাজসভায় জানিয়ে পাঠাল।' (ঐ) চীনের নয়নের মণি নান-সুকে সে প্রার্থনা করল। এই সংবাদে রাজা চিন্তিত হলেন, সমস্ত চীনে আলোড়ন উঠল। নান-

সুর পিতা চুয়াং-উ ভয় পেলেন। অন্যদিকে, নান-সু ভালোবাসত ভিনসাই নগরের তরুণ নৌ সেনাপতি সি-হুয়ানকে—'জাফরি কাটা জানালার বাইরে গজদন্তের পাখার ওপর দিয়ে ব্রীড়াবনতা নবযৌবনা নান-সু। তখন বাইরের পৃথিবীর যেটুকু পরিচয় পেয়েছে তার সমস্তই জুড়ে আছে একটিমাত্র মানুষের মুখ।' (পৃ. ২৪৪, ঐ)।

নান-সু, সিহুয়ান দু'জনেই চুয়ান-উর কাছে প্রার্থনা জানাল। কিন্তু নিরূপায় পিতা চুয়ান-উ জানালেন রাজাদেশ তিনি লঙ্ঘন করতে পারবেন না। তখন বর্বর কিতান দলপতিকে বরণ করার জন্য নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে সমুদ্রপথে রণতরীতে ভেসে চলল নান-সু। আর তাকে পৌঁছে দিয়ে আমার ভার পড়ল সি-হুয়ান এর উপর। সকলেই দুঃখিত হল নান-সুর দুর্ভাগ্যে। কিন্তু 'সি-হুয়ান এর আর নান-সুর মনে কোনো দুঃখ সেদিন নেই। ভাগ্য তাদের যদি পরিহাস করে থাকে ভাগ্যকেও তারা বঞ্চনা করবে—এই তাদের সংকল্প।' (ঐ)— সাতদিন সাতরাত তারা ভেসে চলল সমুদ্রে। সাতদিন সাতরাত্রি বাদে হঠাৎ একদল সৈনিক এসে তাকে বেঁধে ফেলল। রণতরী থেকে পালিয়ে গেল নান-সু। এভাবেই সমাপ্ত হল নান-সু আর সি-হুয়ানের প্রেমকাহিনি এবং জন্ম হল আরেক কাহিনি। এরপরেই গল্পের অন্যদিকে মোড় ফিরল—'জ্ঞান যখন হল নান-সুর, ভেলা তখন ছোট্ট এক পার্বত্য দ্বীপের সৈকতের ওপর পড়ে আছে।' (ঐ) আর সভয়ে নান-সু উঠে বসল।' আর সে দেখল দূরে সাগর পাখি ছাড়া কোন জনপ্রাণী নেই। বিক্ষুব্ধ সমুদ্রস্রোত আছড়ে পড়ছে তটে। এরপর দীর্ঘদিন একা নির্জন দ্বীপে কাটাল নান-সু। 'অনেক কিছু তার গেল, গেল না শুধু চোখের সেই উৎসুক দিগন্ত সন্ধানী সৃষ্টি আর মনের সেই অবিচলিত প্রতীক্ষা।' (পৃ. ২৪৫, ঐ) কিন্তু, তার প্রেম তার আকুতি সফল হল না। একদিন হঠাৎ তার সাথে দেখা হল সি-হুয়ানের। কিন্তু প্রকৃত সি-হুয়ান সে নয়। সি-হুয়ানের বংশধর সে। প্রেম নয় প্রেমহীন লালসাই তার একমাত্র বৈশিষ্ট্য। তাই সে বলেছে যে সে এসেছে নান-সু দ্বীপের খোঁজে যেখানে আছে 'শত সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য।' (ঐ)।

এভাবেই সৌন্দর্যের রূপরেখা বদলে গেল। সৌন্দর্য ঈর্ষা ও লোভের কাছে পরাভূত হল। আর সৌন্দর্যের তত্ত্ব যাইহোক স্থির, ধ্রুব হয়ে থাকল নান-সু। নবাগত বণিক বলেছে যে — শতাব্দী আগের সি-হুয়ান ও নান-সুর প্রেমের কথা এবং নান-সু দেখেছে 'নবাগত নাবিকের লুব্ধ দৃষ্টি।' (ঐ) আবিষ্কার

করেছে উন্মুক্ত পরিবেশে তার নগ্নতা।' (ঐ)। সেই নাবিকের লুব্ধতা তখন তাকে ধ্বংস করতে চেয়েছে, লুব্ধ হিংস্র দৃষ্টি থেকে রক্ষা করতে গিয়ে 'নান-সু পর্বত চূড়ার প্রান্তে এসে যখন সে আছড়ে পড়ল তখন শরীরে এতটুকু শক্তি আর তার অবশিষ্ট নেই।' (ঐ) অথচ নান-সু দেখতে পেয়েছে তার একাগ্র প্রতীক্ষা যা তার যৌবনকে ধরে রেখেছিল তা 'কুঁকড়ে যাচ্ছে', জরতী অবস্থাপ্রাপ্ত হতে হতে পৃথিবীর স্বরূপ যেন চিনতে পারে নান-সু। এভাবেই পৃথিবী ও তার সভ্যতার সাথে একীভূত হয়ে গেছে নান-সু। সৌন্দর্য গেছে হারিয়ে। আর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বণিক সভ্যতা। এবং এভাবেই এগিয়ে গেছে সভ্যতা—'যে পাহাড়ের চূড়া থেকে নান-সুর উৎসুক চোখ দু শতাব্দী ধরে দিকচক্রবাল সন্ধান করে ফিরেছে, সেদিন রাত্রে জীবন্ত মশালরূপে তারই শীর্ষ সে উজ্জ্বল করে তুললে।' (পৃ. ২৪৫, ঐ)। এভাবেই সার্থক সভ্যতার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। আলোচ্য গল্পটিতে একটি প্রশ্নচিহ্ন রয়ে গেছে যাতে গল্পটির বিশ্বাসযোগ্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন থেকে যায়। হরিসাধনবাবুর প্রশ্ন 'কিন্তু এ গল্পের, রবিনসন ক্রুশোর সঙ্গে এ গল্পের কোনো মিল তো নেই?' (পৃ. ৪৬, ঐ) বস্তুত, অমিল ও অত্যাশ্চর্য অযৌক্তিক বর্ণনাই এখানে প্রাসঙ্গিক হয়ে তৎকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক ভাব-চেতনাকে ব্যাখ্যা করে গেছে।

সামাজিক পটপরিবর্তনের গল্প —

সামাজিক পটপরিবর্তন বলতে একটি সময়ের পরিবর্তনশীলতাকে বোঝানো হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বের এই গল্পগুলিতে দুটি বিশ্বযুদ্ধ মধ্যবর্তী ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর পর্বের সময়কালীন চিত্রগুলি ধরা পড়েছে। এই পরিবর্তন যেমন সমাজের তেমনি মানবচরিত্রগুলিরও বটে। বস্তুত, প্রেমেন্দ্র দুটি বিশ্বযুদ্ধকেই প্রত্যক্ষ করেছেন বলে তার গল্পে পরিবর্তন চিহ্নগুলি সজ্জিত হয়েছে এবং সমাজের পরিবর্তনগুলিই এখানে বিষয়। এই পরিবর্তনের সন্ধিপর্বটিও খুবই নিপুণতার সঙ্গে বর্ণিত। এই বৈশিষ্ট্যগুলিই এ ধরনের গল্পকে নিজস্বতা দিয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়—'আয়না', 'পিস্তল', 'দর্পণ', 'ম্যাজিক', 'সখির দলের মেয়ে' প্রভৃতি গল্পের কথা।

'সপ্তপদী' (১৯৫৫ খ্রিঃ) গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'আয়না' গল্পটির বিষয় থিয়েটার ও অভিনব প্রয়োগ শিল্প সিনেমার জগতের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র বিধুধূষণ। বিধুভূষণের মধ্যে দিয়েই বিবদমান সময়ের ইতিহাস স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে। বিধুভূষণ থিয়েটারের চরিত্রাভিনেতা। অত্যন্ত আদর্শবান,

থিয়েটারে নিবেদিত প্রাণ, আদর্শবাদী মানুষ এবং তিনি আপোসহীন, লড়াকুও বটে। তার চোখেই প্রথম ধরা পড়ে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের মধ্যে পার্থক্য এবং তা ভবিষ্যতের ইঙ্গিতবহ হয়ে ওঠে। যেমন—

'থিয়েটারে আজকাল একমাত্র আলোচনার বস্তু তো সিনেমা। থিয়েটারে ছোটোবড়ো যে পার্টই যে করুক না কেন, সকলের মন সিনেমার রাজ্যেই পড়ে আছে। কানু ছাড়া গীত নাই—এর মতো সবারই মুখে শুধু ফিল্মে কে কী পার্ট পেয়েছে বা পারে তারই কথা।' (পৃ ২৪৮, আয়না, প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প, ২য় খণ্ড)। এভাবেই ধরা পড়েছে পরিবর্তন এবং সন্ধিপর্ব এবং গল্পের সূচনাতেই ধরা গেছে বিধুবাবুর মানসিকতা ও চরিত্রটি। একদিকে থিয়েটারের প্রতি অসীম আগ্রহ ও নিষ্ঠা, অন্যদিকে ন্যূনতম রোজগার— দুয়ের দ্বন্দ্বে বিধুবাবুর ভেতরের শিল্পীসত্ত্বাই উঁকি দিয়েছে যেন—'হালের ম্যানেজার রসময়বাবু অত্যন্ত কড়া লোক। দু-এক মিনিট দেরি হলেও কারুর খাতির রাখেন না। ট্রাম বন্ধ হয়ে যাওয়ার অজুহাত দেখালে তিনি উল্টেআরো দুটো কথা শুনিয়ে অপমান করতে দ্বিধা করবেন না।' (পৃ. ২৪৭, ঐ) এখানেই শিল্পীর কদর হারিয়ে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হয়ে গেছে বাংলা থিয়েটার। অর্থের তাগিদে আপোস করেছেন শিল্পীরা—এ পরিবর্তনটিও লক্ষ্য করার মতই। এই ভীতির পাশাপাশি আছে আত্মমর্যাদাবোধ এবং প্রতি নিয়ন্ত্রণ। অথচ তাগিদ তাকে বারবার দ্বন্দ্বময় করে তুলেছে—'বেশিরভাগই ছেলে-ছোকরা। তাদের কাছে মানসম্ভ্রম বজায় রাখবার জন্য একটু ভারিক্কী হয়ে থাকতেই হয়।' (ঐ) নগেনের মত অভিনেতাদের মত নীচু হয়ে সম্ভ্রম তিনি খোয়াবেন না। অথচ 'এদিকে গলাটা তাঁর শুকিয়ে আসছে' (ঐ) নেশা করার বিড়ির অভাবে— এও তাকে হতাশ করে। তবু নগেনের মত আত্মমর্যাদাহীন যেমন তিনি হতে পারেন নি, তেমনি করুণাভিক্ষা করতেও তার দ্বিধা হয়েছে। নিজের অবস্থা, নিজের দৈন্য তিনি জানাতেও চাননি। তাই 'ছোকরা চাকর রাখালটা' যে ফাইফরমাস খাটে বলে টাকাটা সিকিটা পায়। তাকে বললে সে এনে দিতে পারত। 'কিন্তু এই দু'মাস তাঁর (বিধুবাবুর) অবস্থা একেবারে তলা নিতে গিয়ে ঠেকেছে। তাই যেন ভুলে গিয়েছেন, এইভাবে রাখালকে তিনি এড়িয়ে গেছেন।' (ঐ) এভাবেই অর্ন্তমুখীনতা আশ্রয় করেছে বিধুভূষণ চরিত্রটিকে। নিজেকে তিনি প্রকাশ করতে পারেননি। আবার, ঐতিহ্য ভুলে যেতে পারেননি এবং স্রোতে গা ভাসাতেও পারেননি। তাই, তিনি নির্বান্ধব, একা।

অথচ তিনিই জানেন এ জগতের ইতিহাস। যেমন, থিয়েটারের ছোটবাবু সুরেশ্বর—'সুরেশ্বর এখন সেকথা মানতে চাইবে কিনা বলা যায় না, কিন্তু একদিন এই বিধুবাবুই তাকে থিয়েটারের দরজা দিয়ে প্রথম ঢুকিয়ে এনেছিলেন।' (পৃ. ২৪৯) আর বর্তমানে তার নাম পোস্টারে না থাকলে 'অতিটোরিয়াম খাঁ খাঁ করে'। (ঐ) তবে সুরেশ্বর যে একেবারে ভুলে যায় নি তাকে তার প্রমাণ 'গায়ের দামী শালটা একরকম লুটোতে লুটোতে অর্ধনিমীলিত চোখে একবার বিধুবাবুর দিকে তাকিয়ে মাথাটা একটু হেলিয়ে ঢুকে যায়।' (ঐ) এর প্রমাণ পরে আরও পাওয়া যাবে। কিন্তু, বিধুশেখর সেভাবে নিজেকে প্রমাণ করতে পারেন নি। তাই তিনি এখনও 'নগেনের মতো পঁচাত্তর টাকার দলে পড়ে আছেন।' (পৃ. ২৪৯, ঐ) আর সুরেশ্বর 'হাউই-এর মতো এক ঝটকায় উপরে উঠে গেছে।' (ঐ) এটা নিয়তি এবং তার সাথে মানিয়ে নেওয়া আপোসহীনতা, যা বিধুভূষণ পারেন নি। কিন্তু, এখানে আরও একটি ইতিহাস আছে। তা বিধুভূষণ ব্যক্তিগত ইতিহাস। এতেই বোঝা যায় 'উন্নতির আশা একদিন তারও ছিল। বাড়ির সকলের মতের বিরুদ্ধে নিজের জেদে প্রথম থিয়েটারে ঢুকেছিলেন। থিয়েটার ছিল তাঁর নেশা। প্রতিদিন রঙ্গ মঞ্চের ওপর পাদপ্রদীপের আলো যাদের মুখে পড়ে তাদের সঙ্গে একবার কথা কইতে পেলে ধন্য হয়ে যেতেন। (পৃ. ২৫০, ঐ)।

এরপর নাট্যব্যক্তিত্ব রাজীব চৌধুরীর সংস্পর্শে আসেন ও থিয়েটারে শক্ত মাটি পেয়ে যান বিধুভূষণ। নাট্যজগতের দুর্দিনে বিধুবাবুর মনে পড়ে রাজীব চৌধুরীর বিখ্যাত উক্তি —'থিয়েটারটা কি জানো ? সংসারের সমাজের আয়না। পারার মতো দারুণ বিষ নিজেদের গায়ে মেখে সংসার সমাজকে তাদের নিজের চেহারা আমাদের দেখাতে হয়, তাদেরই আত্মশুদ্ধির জন্য।' (পৃ. ২৫১) এই উক্তি যেন দর্শনের মত। এবং এই উক্তি বিধুবাবু যেন ক্রমশ নিজের জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছেন, গ্রহণ করেছেন। এই যেন তার অনুপ্রেরণা, পাথেয়। অথচ বিধুবাবু নিজেও যে কখনো সামান্য বিচ্যুত হননি এমন নয়। 'কুরুক্ষেত্র', 'সম্প্রদান' প্রভৃতি নাটক করে যখন নামডাক হয়েছে বিধুবাবুর তখন সুধা বলে মেয়েটাকে নিয়ে তিনি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিলেন—'থিয়েটারে হিংসুকের অভাব নেই। ছোটো কথা ক্রমে বড় হয়ে উঠল, থিয়েটার মালিকের সঙ্গে লাগল বিরোধ।' (পৃ. ২৫১, ঐ) এখানে রঙ্গমঞ্চের অর্ন্তদলীয় সংঘাত চিত্র, যা ইতিহাস বর্তমানে তাও উঠে এসেছে এবং এরপরেই দর নেমে গেছে বিধু শেখরের।

তবু, জীবনের ওঠাপড়াকে জেনে নিয়েছিলেন বিধুভূষণ। কিন্তু সিনেমার কথায় তার বিরক্তি লাগত, থিয়েটারকে তিনি ত্যাগ করতে পারেন নি। কিন্তু একটি বিশেষ ঘটনা তার আভিজাত্য, অহংকারকে টলিয়ে দিল— 'দারিদ্র্যের চাপে ভেঙে পড়েও মচকান না বলে তাঁর ওপর অনেকেই বিশেষ প্রসন্ন নয়। দাম্ভিক বলে তাঁর বদনাম আছে তিনি জানেন।' (পৃ. ২৫২, ঐ)। এহেন বিধুভূষণ গ্রীনরুমের কাছে গিয়ে 'থতমত খেয়ে গেলেন'। (ঐ) তার মনে হল সকলেই যেন তার অপেক্ষায়। ক্রমে তার মনে হতে লাগল সবটাই বিদ্রুপ কিংবা অভিনয় —' পর্দা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসে তিনি আরো অবাক হয়ে গেলেন' (ঐ) কারণ নাট্য কুশলী বা সকলে তাকে সম্বর্ধনা জানাল। আর বিধুবাবুর মনে হল বিড়ি কিনতে গিয়ে দেরী করে তিনি অপরাধ করেছেন বলেই তার সঙ্গে এই নাটক হচ্ছে। কিন্তু 'কুড়ুলমার্কা' ম্যানেজার রসময়বাবু তাকে অবাক করে 'পাঁচটি দশ টাকার নোট দিলেন'। (ঐ)। সবশেষে যেন নাটকের যবনিকা উঠল হরিশের উক্তিতে। যে হরিশকে 'ছোকরা', 'বকাটে' বলে মনে হত বিধুবাবুর, সেই বলেছে—'স্ত্রীর মৃত্যুর দিনেও আপনি কী করে থিয়েটারে অভিনয় করতে এলেন ভেবে অবাক হচ্ছি।' (পৃ. ২৫৩, ঐ)। চূড়ান্ত হিউমারের শেষে এও জেনেছেন বিধুভূষণ যে ছোটবাবু সুরেশ্বরই একথা সকলকে বলেছেন। তবে শেষপর্যন্ত স্নিগ্ধস্বরে বিধুবাবু যা বলেছেন তাই গল্পটিকে মানবিক করে তুলেছে—'আমার স্ত্রী আজ সত্যি মারা যায় নি। কারণ আমি বিয়েই করিনি জীবনে। আর কেউ না জানুক তোমাদের ছোটবাবু আর নগেন সে কথা জানে।' (পৃঃ ২৪৩, ঐ) বিধুবাবুর এই উক্তি তীব্র মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। আর শিল্পজনোচিত ভাবনায় যেন তারই সমব্যথী হয়ে উঠেছে ছোটবাবু সুরেশ্বর। অবস্থান্তর ঘটলেও মানবিক সম্পর্কগুলি গভীরতর থেকে যায় যে—এ গল্প যেন তার প্রমাণ। সেইসঙ্গে অনুভূতির স্পর্শে নাট্যজগৎ যেন বাস্তব, জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে।

'কুড়িয়ে ছড়িয়ে' এই গল্পগ্রন্থটি প্রকাশ পায় ঠিক স্বাধীনতার পূর্বে, ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে। এই গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'পিস্তল' গল্পের পটভূমিকায় আছে যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর বিধ্বস্ততা ও প্রখর দারিদ্র্যের ছবি। ঘটনাস্থল কোনো একটি ছোটো জংশন ষ্টেশন। এই ষ্টেশনে যুদ্ধগামী মিলিটারিদের যাওয়া ও ফেরত আসা, ষ্টেশনকে সরগরম করে রাখে। এখানেই উদবাস্তু এবং যাযাবর কিছু মানুষের বাস। এদের নিয়েই গল্পটির বিষয় আলোড়িত —' ছেলেগুলো এইখানেই ঘুরে বেড়ায়। ষ্টেশনই তাদের ঘরবাড়ি। আত্মীয়-

স্বজন হয়তো তাদেরও ছিল একদিন। কিন্তু সেসব তাদের মনে নেই। কোথাও কোনো সম্বন্ধের ধার তারা আর ধারে না।' (পৃ. ১৮৬, পিস্তল, প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প, ৩য় খণ্ড) এর পাশাপাশি আছে আরেকটি চিত্র—'যুদ্ধের বাজারে মিলিটারি কন্ট্রাকটরের মতো হঠাৎ ফেপে ফুলে একেবারে বদলে গেছে। প্ল্যাটফর্মে ট্রেন দাঁড়ালে, ষ্টেশনের পুবদিকে যে পাথুরে ঢিবিটা এতদিন দিগন্ত আড়াল করে থাকত।' (ঐ)। এখন হঠাৎ সেখানে তিন তিনটে সাইডিং, লুপ, গুদাম ঘর প্রভৃতি। এভাবেই সকালে হঠাৎ কোথা থেকে খবর এসেছিল লাইনের মাঝখানে একটা রেলগাড়ির বল্টু খুলে একটা কব্জা খানিকটাকে ফাঁক করেছে। সেখানে তারের খোঁচা দিলে চাল গড়িয়ে পড়ছে।' (ঐ)। উদ্বাস্তু মানুষ ছুটেছে সেখানে এইভাবে ক্রমশ মানবিক অনুভূতিগুলি যান্ত্রিক হয়ে এসেছে এবং চরিত্রগুলিও বিশ্লেষিত হয়ে এসেছে। যেমন—'তারা লোক বুঝে ভিক্ষে চায়, কিন্তু ভিখিরি তারা নয়। সুবিধে পেলেই তারা চুরি করে কিন্তু চোরও তাদের বলা যায় না।' (পৃ. ১৮৬, ঐ)। অথবা 'কাল যেমন সেই খোঁড়া পা বিনি বলে মেয়েটা কাটা পড়ল, লাইন পার হতে গিয়ে মালগাড়িতে।' (ঐ)। মৃত্যু এখানে বেদনার নয়। আর তারা 'খরগোশের মত সতর্ক—ইঁদুরের মত চালাক। তাদের ধরবে কে'? (ঐ)। এইভাবে মনুষ্যেতর প্রাণীর মত কোনরকমে দিনগুজরান করেছে হতদরিদ্র মানুষগুলি, আর তাদের গরীবীকে পণ্য করেছে আর এক শ্রেণীর মানুষ। মনুষ্যত্ব কোন পর্যায়ে নেমেছে তা বোঝানোর জন্য একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন লেখক—'শুধু খোঁড়া বিনি পারেনি। খানিকটা রক্তমাংসের ডেলা ছাড়া আর তার কোনো চিহ্ন তারপর তার পাওয়া যায়নি। কোঁচড়ের চালগুলো চারিধারে ছড়িয়ে পড়েছে। যেগুলো রক্তে মাখামাখি হয়নি সেগুলো অনেকে তারপর কুড়িয়ে নিয়েছে।' (পৃ. ১৮৭, ঐ)। এদের মধ্যে একমাত্র আপোসহীন নিধে, যার স্মৃতিতে ফিরে ফিরে এসেছে একটি মেয়ের কথা। শ্যামা ছিল তেমনই একটি মেয়ে—'মনে পড়ে শ্যামা বলে সেই রোগা কালো মেয়েটাকে হাড্ডি সার কাঠির মতো চেহারা। কিন্তু কারো কারো হাড়েরও একটা শ্রী থাকে। মেয়েটারও তাই ছিল।' (পৃ. ১৮৭, ঐ)। তার চেয়েও বড় কথা মেয়েটা একা একাই থাকত বেশি। শৌখিন ছিল বলেই তার কাপড়ের তালিগুলো চোখে পড়ত না। সবচেয়ে অদ্ভুত ছিল তার চোখ অর্থাৎ আর সবার থেকে তাদের দলের সে ছিল আলাদা। আর তার সাহস ছিল। তাই 'গাড়ির ছায়ার দিকটায় তাগড়া তাগড়া পাঁচ ছটা লালমুখো পল্টন বসে বিলিতি তাড়ি খাচ্ছে। শ্যামা

সেখানে গিয়েই একেবারে তাদের কাছে ঘেঁষে বসে বলত, 'খিদে পেয়েছে সাহেব, দেনা দুটো পয়সা মুড়ি কিনে খাব।' (ঐ) এই সাহস সমকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কিভাবে প্রতিস্পর্ধি হয়ে উঠেছে—গল্প বিষয় ক্রমে সেদিকে উন্মোচিত হয়েছে। লেখক জানিয়েছেন—'সাহেবরাও তাকে দুদিনেই চিনে গিয়েছিল। সে এলেই বলত—হিয়ার কামস্ দ্য ব্ল্যাক স্নেক' (ঐ), অর্থাৎ, ধরে নেওয়া যেতে পারে শ্যামার মধ্যেকার দুঃসাহসী স্ফুলিঙ্গ তারাও উপলব্ধি করেছে। এরই মাঝে এসেছে রেল-কন্ট্রাকটার ফতেচাঁদ সিন্ধির আড়কাঠি লালমোহন। এই কন্ট্রাকটারের উদ্দেশ্য অর্থলাভ ও ব্যবসা। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে তারা যেকোনভাবে পন্টলদের খুশি করতে চাইত। এ চিত্রও যুদ্ধ সময়কালীন অধঃপতনেরই চিহ্ন। এই উদ্দেশ্য নিয়েই দালাল শ্রেণির উদ্ভব। এদেরই প্রতিভূ লালমোহন। এই লালমোহনের সঙ্গে সরাসরি সংঘাত ছিল শ্যামাদের। আক্ষরিক অর্থেই শ্যামা সাপের মত হিংস্র হয়ে লালমোহনের কব্জিতে কামড় বসিয়েছিল, সেখানে হিংস্রতা তার সার্বিক হয়ে উঠেছিল। শ্যামার উক্তিতেও ধরা পড়েছে পরিবর্তনশীলতার ইঙ্গিত—'হিংস্রভাবে লালমোহনের দিকে তাকিয়ে সে বলত, সাপই তো বটে। সেদিন শুধু হাতটা কামড়ে দিয়েছি, এবার একদিন চোখ দুটো ছুবলে নেব কুত্তাটার।' (পৃ. ১৮৭-১৮৮, ঐ) শ্যামার এই হিংস্রতা, এই বিরূপতা যে পরিবেশ থেকেই সে অর্জন করেছে তাই নয়, এ যেন তার ভেতর থেকেই উঠে আসা জেহাদ। কিন্তু 'এই শ্যামাও একদিন হঠাৎ কোথায় হারিয়ে গেল।' (ঐ) নিধে এই আশঙ্কা করেছিল। কারণ শ্যামাকে প্রায়ই দেখা যেত রাত্রে দলছাড়া হয়ে থাকতে। কখনো ফাঁকা মালগাড়ির ভেতরে কখনো জলের ট্যাঙ্কের মাথায় দেখা গেছে তাকে। নিধে কতদিন তাকে বলেছে, 'একা শুস্ যেখানে—সেখানে, কোনদিন রাত্রে নিয়ে যাবে ধরে।' (পৃঃ ১৮৮, ঐ)।

নিধের আশঙ্কা সত্যি করে উধাও হয়েছে একদিন শ্যামা। কেউ বা চুপি চুপি জানিয়েছে 'লালমোহনের হাত আছে ব্যাপারটায়।' (ঐ)। এখানে তৈরি হয়ে উঠেছে তথাকথিত সভ্য সমাজের সমান্তরাল আরেকটি জগতের চিত্র। যেখানে লালমোহনরা উন্নতি করে মানুষকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করে। আর তাই দিনমজুরিতে লোক দেবার 'সরকার' হয়ে ওঠে সে। কিন্তু 'কে তা নিয়ে মাথা ঘামায়!' (ঐ) আর তাই শ্যামারা হারিয়ে যায়। এমনকি নিধেও ক্রমে ভুলে যেতে থাকে। আর তবু, তার মনে 'আক্রোশের আগুন' জ্বলে লালমোহনের বিরুদ্ধে। আর সে প্রতিজ্ঞা করতে থাকে 'লালমোহনকে জব্দ

করার সুবিধে পেলে সে ছাড়বে না।' (ঐ)। কিন্তু পেটের জ্বালা তাও ভুলিয়ে দেয়। ইতিমধ্যে সংকট তীব্রতর হয়—'আশেপাশের সমস্ত গাঁ ভেঙে মেয়ে-মদ্দা-বাচ্চা-বুড়ো এসে ষ্টেশনে ভিড় করেছে—কোথাও একদানা চাল নেই। তাদের হাহাকারে ষ্টেশনে কান পাতা যায় না।' (ঐ) উদ্বাস্তু সমস্যা, চালে রেশনিং প্রথা, চোরাবাজারীদের ফুলেফেঁপে ওঠা কারবার ইত্যাদি চিত্র দেখিয়েছেন লেখক শিল্পীসুলভ নিপুণ দক্ষতায়। আর 'ফন্দিবাজ' ব্যবসাদারেরা বুদ্ধি খাটিয়ে ভাগে ভাগ দেয় গরীবদের, বিনিময়ে নিজেদের কাজ করায় এদের দিয়ে। আর ঘৃণ্য, জঘন্য পরিস্থিতির মধ্যে মানুষের দল যেন পশুর চেয়ে অধম হয়ে যায়। তাদের বেঁচে থাকা হয়ে ওঠে শ্বাপদের মতই, যন্ত্রণাদায়ক—'কাতারে কাতারে লোক তাই ট্রেন ধরে ঝুলতে ঝুলতে চলছে, ট্রেনের তলায় পর্যন্ত রডের উপর শুয়ে শুয়ে যেতে তাদের আপত্তি নেই। রোজ অমন বিশ-পঁচিশটা পড়ছে, হাত-পা ভাঙছে, কাটা পড়ছে। ষ্টেশনে ষ্টেশনে কুকুর তাড়া খেয়ে দূরে সরে যাচ্ছে।' (ঐ) আর, এর মধ্যে চাল চুরি করে যারা, তাদের অন্যতম নিধেক্রমে তৎপর হয়ে উঠতে থাকে। গোরা পল্টনদের হালচাল তার সব জানা। কী করে তাদের কাছ থেকে কী বাগাতে হয় সে জানে। সুবিধে হলে চুরি চামারিও বাদ দেয় না।' (পৃ. ১৮৯, ঐ) আর লালমোহনের সঙ্গে তার বিবাদ স্পষ্ট হতে থাকে। লালমোহনের 'ঘুষে বখশিশে সমস্ত ষ্টেশন তার হাতের মুঠোয়।' (ঐ) আর সে বাজারের মাঝখানে অফিস ও গুদাম করেছে যেখানে, এ তল্লাটের 'হোমরা চোমরা'রা গিয়ে মাঝরাতে মজলিস জমায়। তাহলে নিধের মত একটা 'নোংরা ছুঁচোর' (ঐ) সঙ্গে তাদের বিবাদ কেন। আসলে টিকিটে চাল কিনতে যাওয়া মানুষকে সে লোভ দেখায়, তাদের ব্যবহার করে এবং তাদেরকেই টোপ হিসেবে গেথে আখের গুছায়, বিশেষত অল্পবয়স্ক মেয়েদের দলে টানে। তার দলের লোকেরা খবর আনে প্রায়ই 'মালগুদামের দেয়াল' ফুটো হয়েছে 'একবার গিয়ে পৌঁছতে পারলেই কোঁচভরতি চাল।' (পৃঃ ১৮৯, ঐ) ইত্যাদি। পেটের জ্বালায় যাদের মাথা ঠিক থাকে না, তারা যায় এবং তাদের সবাই ফেরে না। 'বাছাই করা দু'চারটে অন্ধকারে একেবারে গায়েব হয়ে যায়।' (ঐ) নিধের দল এদের ঠেকায়, বিরোধিতা করে। খুবই উপভোগ্য হয়ে উঠেছে নিধের দলের সঙ্গে লালমোহনের পাঠানো দলের সংঘাত। 'মাঝরাতে অমন ফিসফিসানি উঠলে কখনো তাদের গলা শোনা যায়, 'কে গো, থাকো মাসি না'? 'থাকো মাসি থতমত খেয়ে প্রথমটা চুপ করে যায়, তারপর গাল পেড়ে বলে, কে রে তুই,

মুখপোড়া ওলাউঠো'? জবাব আসে, 'তোমার বোনপো গো মাসি, চিনতে পারলে না। না চেন তো তোমার লালমোহনকে গিয়ে শুধিয়ো।' (পৃ. ১৮৯, ঐ) আর, এরপর সরে পড়তে বাধ্য হয় লালমোহনের চর। আসলে, এভাবেই ব্যক্তি নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে; ব্যক্তি দ্বারাই, শোষিত, নিষ্পেষিত হতে থাকে মানুষ। মনুষ্যত্ব হারিয়ে লালমোহনরাই হয়ে ওঠে সমাজের মাথা। কিন্তু তারাই সর্বতোভাবে সত্যি নয়। তাই ফিরে আসে শ্যামা তার পুরনো চত্বরে। আর তখন শ্যামার চোখ দুটো দেখে এবার মনে হয় যে, 'কালসাপ এখনো একেবারে মরে যায়নি। খোলস ছেড়ে এসে শুধু নেতিয়ে পড়েছে।' (পৃ. ১৯০, ঐ)। কিন্তু ফ্যাকাশে চেহারায়, পোড়া প্যাকাটির অবয়বে যেন সে অত্যাচারের মূর্ত প্রতীক এবং ক্রমে জানা যাচ্ছে শ্যামা 'বাচ্চা' বহন করেছে। এখানে যেন সে সর্বংসহা ধরিত্রীর সঙ্গে মিলে প্রতীকী হয়ে উঠতে থাকে। আর নিধের মনে 'চাপা বিদ্রোহ' গুমরে উঠতে থাকে। আর 'তখন তার চোখের সামনে ভাসতে থাকে লালমোহনের ঠোঁট বাঁকানো মুখটা'। (ঐ)। আর শ্যামার চোখ অন্ধকারে জ্বলে ওঠে। সে বলে 'মরব না, মরব না—দুশমনের চিতের আগুন না দেখে নয়।' (পৃ. ১৯১, ঐ)। এই 'জ্বালাময় আগুন' ঠিকরে বেরতে চেয়েছে নিধের ভেতর থেকেও। অন্যদিকে লালমোহন বিদ্রূপ করেছে শ্যামাকে, বলেছে 'ভাগ্যিস রাতের বেলা দেখিনি, ভিরমি খেতাম।' (ঐ) তাৎপর্যমণ্ডিত হয়েছে এই বিদ্রূপও। এরপর দু নম্বর সাইডিং-এ ছায়ার মত মিশে থাকা নিধের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে শ্যামা ব্যাকুল ভাবে খাবার চাইলে নিধে তার হাতে তুলে দিয়েছে পিস্তল। এরপর লালমোহনের গুদামে দলবলের সঙ্গে শ্যামা এগিয়ে গেছে। নিধে গিয়েছে অনেক পরে—'কী সে শুনতে চায়? কিছু না, শুধু একটা শব্দ হয়তো তার সঙ্গে একটা চিৎকার।' (পৃ. ১৯২, ঐ)। কিন্তু, পরদিন দেখা গেল একটি মেয়েকে মৃত, যাকে শ্যামা বলে মনে হলেও সে শ্যামা নয়—'একটা মেয়ে ধুলোর ওপর পড়ে আছে লুটিয়ে অজ্ঞান হয়েছে, না মারা গিয়েছে বলা যায় না।' (পৃ. ১৯৩, ঐ)। শ্যামা সফল হতে পারেনি তবু শ্যামা—'রাস্তার ধারে বসে পড়ে বুক চেপে ধরে কাশছে। কিন্তু, তার আঁচলের দুধারে দুটো পুঁটুলি বাঁধা, একদিকে খানিকটা চাল আর একদিকে নিধের দেওয়া সেই পিস্তল।' (পৃ. ১৯৩, ঐ)। এভাবেই খাদ্য ও বাঁচার আর্তিতে বিপ্লব অনিবার্য হয়ে ওঠে। সমাজ পরিবর্তনের ইঙ্গিতও এখানে সূচিত হয়।

'ক্বচিৎ কখনো' (১৯৬২ খ্রিঃ) গল্পগ্রন্থের অন্যতম 'ম্যাজিক' গল্পে বিষয়কেও সেই পরিবর্তন

সূচিত হয়। এই পরিবর্তন গ্রাম ও শহরভিত্তিক। গল্পের সূচনায় এসেছে একটি চরিত্র ভূষণ। ভূষণের পরিবর্তনেই সামাজিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত রয়েছে। ভূষণের পরিবর্তন যেমন মানসিক তেমনি অবস্থানগতও বটে। গ্রামের ভূষণের সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়েছিল শহরে এসে। গ্রামে সে ম্যাজিক দেখাত, আর তা দেখানোর পরে হঠাৎ তার সম্পূর্ণ ভাবান্তর ঘটেছে, জীবনের গভীরতম অনুভূতিকে উপলব্ধি করেই গ্রামত্যাগ করেছিল ভূষণ। অথচ, গ্রামের সবাই তাকে ভেবেছে মিথ্যেবাদী। আর সেখানেও কাজ করেছে অন্য এক অনুভূতি, যাকে ম্যাজিকের মতই মনে হয় ভূষণের। এরপর শহরে এসে ভূষণ অনুভব করে মানুষের অনুভূতিগুলিই লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, তাই সবটাই ম্যাজিক—'ওই দেখুন ম্যাজিকওয়ালার মিছিল, আর ওই দেখুন আকাশছোঁয়া বাড়ি টা, ওখানেও ম্যাজিক ওই ছুঁচালো চুড়োগুলো যার আকাশে বিঁধেছে সেই বাড়িটাতেও। দক্ষিণে যান ধূপ-ধুনো-ঘণ্টা বাজিয়ে কি দারুণ ম্যাজিক হচ্ছে দেখবেন।' (পৃ. ৯০, ম্যাজিক, প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প, ২য় খণ্ড)। এভাবেই সামাজিক পরিবর্তনশীলতা গল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে। গল্প সূচনায় আছে কোলকাতা শহর এবং বিক্রেতা লোকটির বকুনি যেটা মিথ্যাচার, নামান্তরে ম্যাজিকের মত শূন্যতার বুদবুদ ছাড়া কিছুই নয় — 'কাগজের তৈরি একটা সুতো বাঁধা কুমিরের চেহারার খেলনা। মাটিতে ছেড়ে দিলে খানিকটা বুকে হেঁটে হেলেদুলে চলে। সেটার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতেই শুনলাম, 'দেববাবু একটা জ্যান্ত কুমির? কামড়ায় না, শুধু ভয় দেখায়। খোকাখুকি খুশি হবে।' (পৃ. ৮৬, ঐ)। এখানেই লেখক আবিষ্কার করেন চেনা মানুষ ভূষণকে এবং বিস্মিত হয়ে লেখক জিজ্ঞেস করেছেন—'তুমি কাগজের কুমির বিক্রি করছ! ভানুমতীর সঙ্গে আড়ি নাকি?' (ঐ)। আর তখন জেনেছেন যে ম্যাজিক আর দেখায় না ভূষণ। কিন্তু, সেই ভূষণ ম্যাজিকের সঙ্গে যার যোগ ওতপ্রোত, তার এই পরিবর্তন লেখককে কৌতূহলী করে তুলেছে এবং এই সূত্রেই উঠে এসেছে মূল গল্পটি—'চাষীর ছেলে ভূষণ, ছেলেবেলায় পড়াশুনার বিশেষ সুযোগ পায় নি। কিন্তু সহজাত বুদ্ধির জোরে আর স্বভাবের গুণে গাঁয়ের দশজনের একজন হয়ে সকলের প্রিয় হয়ে উঠেছিল। ভূষণ ছেলেবেলা থেকেই সব কাজে চৌখশ, সব ব্যাপারে অগ্রণী।' (পৃ. ৮৭, ঐ)। এই ভূষণের পরোপকার সর্বজনবিদিত ছিল। তার কোন শত্রু ছিল না এবং তার উৎসাহ যে কোন লোকের কাছেই আকর্ষণীয় ছিল। এই ভূষণ নিরুদ্দেশ হয়ে গেল একদিন হঠাৎই এবং যখন ফিরে এল তখন সে আশ্চর্য বিদ্যা শিখে এসেছে —

'দরকার হলে বেশ গড়গড় করে ইংরিজিও বলে, বিশেষ করে শিখে এসেছে ম্যাজিক। পেড়াপীড়ি করলে ভূষণ তার মেডেল আঁকা জমকালো জাদুকরের পোশাকটা, দেশে বিদেশে ছবি, প্রশংসাপত্র, খবরের কাগজের বিবরণ ইত্যাদি দেখায়। আর নিজের খুশিতেই দেখায় ম্যাজিক। তার সময় অসময় নেই, সাধাসাধির দরকার হয় না।' (ঐ) ভূষণের এই সহজেই মিশতে পারা এবং ম্যাজিক তাকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছিল। এই ভূষণের খেলা জমে উঠতে থাকে যখন তখন কারণ সারল্য তার সম্পদ—'উপকরণ সরঞ্জাম নেই, নেই সাজানো মঞ্চের ভড়ং, ভূষণ যেখানে সেখানে যা কিছু পায় তাই দিয়েই ভানুমতীর খেল দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দিতে পারে। (পৃ. ৮৮, ঐ) এবং গ্রাম থেকে যাবার কথা সে ভাবেও না। আপনজন না থাকলেও গ্রামের প্রতি টান, তার গ্রামের মানুষের প্রতিও অথচ সেই ভূষণ একদিন গ্রাম ত্যাগ করে—'মানুষের মতিগতি কখন কী হয় বলা যায় না সত্যই তবু ভূষণের ওরকম পরিবর্তন মন যেন সহজে মানতে চায় না।' (পৃ. ৮৭, ঐ) গ্রামের মানুষ জানে অন্য কথা। তারা বলে 'ম্যাজিকে ছেঁড়া কাগজকে নোট বলে চালাতে গেছল কোনো দোকানে।' (ঐ)। তাই ধরা পড়ে ম্যাজিক ছেড়েছে ভূষণ। অথচ ক্রমে এই ধোঁয়াশা কেটে যায় ভূষণের বক্তব্য শুনে। ভূষণ পরিণত হয়েছে রাস্তার ফেরিওয়ালায় তাই বকুনিও তার তেমনই—'বই নেবেন বাবু, ভালো ছবির বই, জলের দরে রঙ।' (পৃ. ৮৮, ঐ)। বাক্যবিন্যাসেই স্পষ্ট যে গ্রাম্য সরলতা অন্তর্হিত হয়েছে ভূষণের। রাজীবাবুর গ্রামের সরল ভূষণ এইরকম ভাষণ জানত না। তার ম্যাজিক ছাড়ার কারণ সে যা বলেছে তা সংক্ষেপে এই—বলরাম দাসের রেশমের তাঁতের ব্যবসা ছিল। বলরাম দাস ভূষণের আত্মীয় নয়, তারই গ্রামের লোক। এই বলরাম দাস মহাজনের কাছে মোটা দাদন আর কয়েক দফা রেশমি সুতো নিয়েও 'মেয়ের চিকিৎসার খরচ জোগাতে সেই সুতোও সে বিক্রি করে দিয়েছিল। ইতিমধ্যে ভূষণ খবর পেয়ে বলরাম দাসের রুগ্ন মেয়ের চিকিৎসায় লেগে গিয়েছিল। আর মহাজনের লোকেরা রেশম সুতো বেচার খবর পেয়ে দেনার দায়ে ক্রোক করেছিল বলরাম দাসের শেষ সম্বল। অন্য সবকিছু ছাপিয়ে একটি বকনা বাছুর ছিল বলরাম দাসের অন্যতম অবলম্বন। বাছুরটি ছিল বলরামের মেয়ের প্রাণ, সেই তার নাম দিয়েছিল 'লালী'। বলরাম দাস আক্ষেপ করে ভূষণকে বলেছিল—'লালীর সঙ্গে ওর পেরমায়ুরও চলে গেছে।' (পৃঃ ৮৯, ঐ) আর বলেছিল—'এত ভেলকি জানো ভূষণ' ভানুমতীর দোয়া নিয়ে সেই লালীকে

একবার মেয়েটাকে দেখাতে পারো না ভূষণ।' (ঐ)। ভূষণ চেষ্টা করেছিল। অন্য একটি বাছুর এনে লালী বলে চালাতে, কিন্তু মৃত্যু পথযাত্রীর কাছে ধরা পড়ে গিয়েছিল মিথ্যাচার। ভূষণের মানবিক পরিবর্তনই তখনই ঘটেছে এবং সেজন্যই সে তার পরমপ্রিয় নেশাও ত্যাগ করেছে 'ম্যাজিক আমার ধরা পড়ে গেছে।' (পৃ. ৯০, ঐ)। ভূষণের পরিবর্তনে এবং উপলব্ধ দর্শনে সমাজের পরিবর্তনও লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে—'ম্যাজিক আমি দেখাই না রায়বাবু, শুধু দেখি।' (ঐ)। এই আর্তিতে যেন সামগ্রিক সমাজের মুখোশ ধরা পড়ে গেছে এবং সেখানেই ম্যাজিকের শেষ। আর তার উপলব্ধিতে ভোটের মিছিল ও এবং শুধু ম্যাজিকে সব হবে না একথা বলেছে ভূষণ। এও বলেছে যে, দেখিয়েছে মানবিক অনুভূতি গ্রামেই লভ্যং এবং তা হারিয়ে সে শহরে এসেছে এবং তা ভুলতে চেয়েছে। আপাতভাবে তাকে পাগল মনে হলেও তার কথার সারবত্তা ক্রমে উপলব্ধি করা যায় এবং তার অবস্থান্তর সামাজিক পটপরিবর্তনের সূচক হয়ে উঠেছে।

'দর্পণ' গল্পটির কেন্দ্রীয় চরিত্র দীপক। গল্পটি 'অষ্টপ্রহর' (১৯৭৩ খ্রিঃ) গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত । দীপক পেশায় ও অবস্থান দিক থেকে উচ্চবিত্ত। স্বভাবতই তার নীচের বলার মানুষগুলির সম্পর্কে সে ওয়াকিবহাল ছিল না, সংবেদনশীলতার তো প্রশ্নই ওঠে না। এক শ্রেণীর বানভাসি মানুষ আশ্রয় লাভ করেছিল ফুটপাথে—মেদিনীপুর, ওড়িশায় বন্যার পরে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী দুর্ভিক্ষের পীড়ন, গ্রাম থেকে উঠে আসা নিরন্ন দরিদ্রের মিছিল, বাস্তুচ্যুত মানুষের ভিড় এ গল্পেরও বিষয় হয়ে উঠেছে। তার চেয়েও বড় কথা গল্পটিও মানুষের উপলব্ধিজাত সত্যে এক মহত্তর আদর্শে উদ্বোধিত হয়েছে। শুধু উপলব্ধিও নয় বলা যেতে পারে এক ধরনের মানবিক মমত্ববোধ ও ঐক্যমত্যে গল্পটির সার্থক উত্তরণ। তাই গল্প সূচনায় দেখা যাচ্ছে উচ্চবর্গীয় দীপক আর অবস্থান ভুলে ফুটপাথে রাস্তার ধারে বসে পড়েছে—'খেয়াল না বলে একটা অদম্য খ্যাপামিই বলা উচিত। নইলে রাস্তার ধারে পাতা একটা খেলো মণিহারী দোকানে এই ভিড়ের মধ্যে দিন-দুপুরে এমন করে কেউ বসে? বিশেষ করে দীপকের মতো নিঁভাজ স্যুট পরা ফিটফাট ঝকঝকে একটা মানুষ!' (পৃ. ২৪৫, প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প, ৩য় খন্ড)। তার এই অদ্ভুত খ্যাপামিতে দোকানিও অবাক ও অপ্রস্তুত হয় আর সেই অস্বস্তি ধরা পড়ে রুক্ষ্মতায়। এখানে যেন ফুটপাথের দোকানির তাচ্ছিল্যকে প্রতিবাদ বলে গণ্য হয় —'রাস্তায় পাতা গরিবানী বেসাতি

বলে তাকে নিয়ে তামাশা সে বরদাস্ত করবে না।' (ঐ)। এ যেন শ্রেণী সংগ্রামের অন্য পিঠ। আর দীপক দেখেছে তোবড়ানো গাল, রুক্ষ্ম চুল, কালের দাঁতের রুক্ষ্ম মানুষটিকে যেন সময়ের জাদুঘর থেকে তাকে বার করে আনা হয়েছে। মানুষের মতই অথচ তার রুক্ষ্মতায় -শীর্ণতায় যেন লোকটি মানুষের প্রেতচ্ছায়া। দোকানির শাসানির উত্তরে দীপক দেখে সস্তা টিনে বাঁধানো আয়নাটি। এবং ন্যায্য দাম দিয়েই সে একটি সস্তার আয়না কেনে। কথা কাটাকাটিতে যায় নি বলে দোকানির অপরাধবোধ জন্মে যেন, এবং অপব্যয়ের সুরে সে বলে, 'ওইটেই নিলেন' ? (ঐ)। এভাবেই কিন্তু শ্রেণীগত বিভাজ্যতা, আক্রোশ ক্রমশ সরে যেতে থাকে। এখানেই জানা যায় দীপকের মানসিক অবস্থান। বিভ্রান্ত দীপকের ক্রমশ মনে হতে থাকে যেন এই অবান্তর প্রশ্নের মধ্যে 'প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ' (ঐ) আছে। এখানে যেন আত্মগ্লানিও অনুভব করে সে। বারবার লোকটাকে মনে হয় 'কোনো পুরনো কালের সুড়ঙ্গ রাজ্য থেকে বুঝি বেরিয়ে এসেছে?' (পৃ. ২৪৬, ঐ) আসলে আধুনিক সভ্যতায় দলাদলির উর্ধ্বে থাকতে চায় শহুরে উচ্চবর্গীয় মানুষ। ফুটপাথের মানুষদের অমার্জিত মনে হয়, ধৈর্য্য দিয়েও দু'দলের সংশোধন সম্মিলন কার্যত অসম্ভব। কিন্তু অনুভূতির ঐক্যে তা সম্ভব—দীপকের চরিত্রটির দ্বিধা -দ্বন্দ্ব অতিক্রমের মধ্যে দিয়ে যেন সেই বিপ্লব বার্তা পৌঁছে দিতে চেয়েছেন লেখক। কেন দীপক আয়না কিনেছে, সেখানেই গল্পের মূল চাবিকাঠি—'যা করতে চায়, সেই ইচ্ছাটাই পকেটের মধ্যে আয়নাটাকে একটা তীক্ষ্ম অস্বস্তি করে রেখেছে। পকেটে আয়নাটার টিনের ফ্রেমটায় হাত লাগাতে এক জায়গায় একটু ধারালো স্পর্শ সমস্ত শরীরে যেন সাই জন্যেই সঙ্কোচের শিহরণ ছড়িয়ে দিয়ে যায়।' (পৃ. ২৪৬, ঐ)। অথচ এতে সঙ্কোচের কারণ নেই। কারণ ইচ্ছেটা বিশ্রী নয়, তবে সেখানে স্বাভাবিকত্ব নেই, আছে গোপনীয়তা ও সাবধানতা—এই গোপনীয়তা তাকে সামাজিক অবস্থান ও পারিবারিক সাম্য বজায় রাখতে আশ্রয় করতে হয়। তাই, তার 'বাসা থেকে কিছু দূরে যে ভাড়া করা গ্যারেজে সে গাড়ি রাখে তারই ধারে নির্জন ফুটপাথে' (ঐ) । সে গোপনে রেখে আসতে চায় আয়নাটা। যাতে করে ফুটপাথ বাসিন্দাদের মনে হয় সেটা 'দৈবানুগ্রহ'। (পৃ. ২৪৭, ঐ)। এবং এভাবেই আগে তাদের সে দিয়ে এসেছে 'ছোট তেলের শিশি', 'ছুঁচ গাঁথা সুতোর কাঠিম' প্রভৃতি। এগুলি অপ্রত্যাশিত তবে শুধুমাত্র দয়ার নমুনা' নয় এবং তেমন দামীও নয়। এই অনুভূতির স্বরূপ দীপকের নিজের কাছেও অস্পষ্ট ; এমনকি, ফুটপাথবাসীদের সঙ্গে তার সম্পর্ক খুব

মধুর ছিল না প্রথম দিন থেকে, এবং বিরক্তিও দীপক গোপন করেনি। অথচ ক্রমে তাদের প্রতি দুর্বল হয়েছে সে। কারা এই ফুটপাথবাসীরা ? — 'অনেক কিছুই বলেছিল পুরুষটা। তারা নাকি উদ্বাস্তু কিন্তু দূরের কোথাওকার নয়। এই দক্ষিণ কোলকাতার কাছাকাছি দক্ষিণ অঞ্চল থেকেই বানভাসিতে সব খুইয়ে কোলকাতায় এসেছে শুধু পেটের জ্বালায়।' (পৃ. ২৪৭, ঐ) এদের সংসার, জীবনযাপন ফুটপাথে। দেয়ালের ধারে ছেঁড়া কাঁথা কাপড়, ভাঙা চেঙারি, তোবড়ানো কড়াই—সর্বোপরি হতশ্রী দাম্পত্য ও হৃষ্টপুষ্ট 'কালিঝুলি শিক্‌নি মাখা' উলঙ্গ ছেলে—দীপকের ভাবনাকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। তবু, দীপকের বিরক্তি গোপন ছিল না প্রাথমিক অবস্থায়। সে উপদেশ দিয়েছিল 'ভিক্ষে না করে খেটে খেতে।' (ঐ) আর লোকটি হতাশভাবে বলেছিল 'কাজ যে কেউ দেয় না।' (ঐ) ধমক দিয়ে দীপক বলেছিল 'অন্য কোথাও আস্তানা দেখ।' (ঐ) আর তখনই সে দেখেছিল ফুটপাথের মেয়েটির 'অদ্ভুত দৃষ্টি' (ঐ) যার মধ্যে তাচ্ছিল্য মেশানো ছিল। আর এদের তাচ্ছিল্য, দৃঢ়তা, আপাত উদাসীনতা দীপককে যেন নাড়িয়ে দিয়েছে। ফুটপাথে গাড়ি রাখতে এসে এদের অরক্ষিত সংসার বিস্মিত হয়, সে বেঁচে থাকার এই উত্তেজনা দীপককে কৌতুহলী করে। এদের বিষয়ে খোঁজ নিয়ে মেয়েটির কাছে ধরা পড়ে যায় দীপক— 'মেয়েটা কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে সে টের পায় নি। মেয়েটার সংসার ফেলে যাওয়ার কারণটা তার হাতের জ্বলন্ত লম্বা কাঠিতেই বোঝা গিয়েছিল।' (পৃ. ২৪৮, ঐ)। আর মেয়েটি উপদেশ দেয় 'এখানে দাঁড়িও না। ধোঁয়া লাগবে।' (ঐ) দীপক অনুভব করে মেয়েটির এতেও নির্বিকারত্ব আর তাচ্ছিল্য। মেয়েটির গিঁট দেওয়া জীর্ণ শাড়ি দীপকের চোখের উপর ভাসতে থাকে, দোকান থেকে সে কেনে 'ছুঁচ ও কাঠিম'। আর বিলাস-ব্যসনে অভ্যস্ত আপন স্ত্রী লতাকে ভাবতে থাকে মাথায় সাতজন্মে তেল না লাগা পাঁশুটে পাটের আশের মত শুকনো একরাশ চুল থাকলে কিরকম লাগত কিংবা ময়লা শতচ্ছিন্ন একটা গিঁট দেওয়া শাড়িতে। এই অনুভূতিতেই সে যেন ঐ দরিদ্র দম্পতি অসংগতিগুলি মেটাতে চেয়েছে। অথচ নিজের সঙ্গে 'লুকোচুরি' করেছে, মিথ্যাও বলেছে লতাকে। কিন্তু কোথাও এসব তার অন্যায় মনে হয়নি। বরং মনে হয়েছে—'সে তো সত্যিই নতুন একটা পদ্ধতি পরীক্ষা করছে। সাহায্যই করছে, কিন্তু দৈবানুগ্রহের চেহারা দিয়ে তাকে দয়ার দানের গ্লানি থেকে শোধন করে।' (পৃ. ২৪৯, ঐ) । এই শোধন আসলে আধুনিক সমাজের সভ্য মানুষের এবং উচ্চবিত্ত দীপকেরও। আর এই পদ্ধতিতে

সে আয়নাটা দেখতে গিয়ে আবিষ্কার করে নিজেকে—'কিন্তু এ কি? মুহূর্তের জন্য আবার শিউরে ওঠে দীপক... এই কি তার চেহারা! না, এ তো সেই—সেই ছেলে-কোলে করা বানভাসিতে সব খুইয়ে আসা মানুষটার।' (পৃ. ২৪৯, ঐ)। এভাবেই দীপক আত্মবিম্ব দেখতে পায় এবং অস্থির সময়ে অনুভূতির ঐক্যে মিলে যায় তাদের সর্বহারাদের সঙ্গে। এখানে আয়না হয়ে উঠেছে সমাজ ও সময়ের দর্পণ। সর্বোপরি, দীপকের অনুভূতি যেকোন আধুনিক সংবেদনশীল মানুষেরই প্রতীক হয়ে সামাজিক পরিবর্তনশীলতার ইঙ্গিত দিয়েছে।

অর্থনৈতিক সংকট ও সামাজিক মূল্যবোধহীনতার গল্প—

দুটি বিশ্বযুদ্ধোত্তর পটভূমিতে দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক সংকট একটি স্বাভাবিক ঘটনা। এরই হাত ধরে এসেছে অশালীন, গর্হিত কাজকর্ম, মিথ্যাচার, সর্বোপরি মানবিক মূল্যবোধহীনতা। সামাজিকভাবে অবনমন, অপমান ব্যক্তিজীবনে বিদ্বেষের রূপ পরিগ্রহ করে মনুষ্যত্ব-বর্জিত বিবেকহীন অসংখ্য মানুষের সৃষ্টি করল। তৈরি হল স্বার্থান্ধ চোরাবাজারী দল এবং প্রভূত সংখ্যক নিরন্ন মানুষ। এদের শ্রেণী বিভাজনের প্রত্যক্ষতা আমরা দেখেছি প্রেমেন্দ্রর নানা গল্পে। বর্তমানে আলোচ্য গল্পগুলিতে আমরা বিশ্লেষণ করতে চাইব মধ্যবিত্তের অবনমন, মধ্যবিত্তের আপোস, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সর্বোপরি আত্মিক সংকট প্রভৃতি যা তাকে মূল্যবোধহীন, অমানবিক, নীতিহীন আদর্শভ্রষ্ট করে তুলেছে।

'কুড়িয়ে ছড়িয়ে' (১৯৪৬ খ্রিঃ) গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'জ্বর' গল্পটি শুরুই হয়েছে রুগ্নতা ও অসুস্থতা দিয়ে। গল্পটির কথকের নাম নেই এখানে। সূচনায় আছে অসুস্থতার বিবরণ—'লেপ কাঁথা যেখানে যা ছিল চাপা দিয়েও সে কাঁপুনি থামানো যায় না। একটা প্রচণ্ড আলোড়ন শুধু যেন শরীর নয়, সমগ্র সত্তার অন্তস্থল থেকে উদ্দাম হিমশীতল তরঙ্গের পর তরঙ্গ সমস্ত চেতনা ক্ষণে ক্ষণে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত প্লাবিত করে দিয়ে যাচ্ছে।' (পৃ. ১৬৪, জ্বর, প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প, ২য় খন্ড)। এই অসুস্থতা ক্রমে মানসিক চেতনাকে গ্রাস করছে, শারীরিকঅসুস্থতা ছাপিয়ে অসুস্থ হয়ে উঠছে মন। পরিবেশ তাকে আরও ভারাক্রান্ত করে দিচ্ছে। তাই জীবনের 'নিটোল চমৎকার' দিন ক্রমশ ভেঙে, ছড়িয়ে এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। আর 'শেড দেওয়া আলোয় প্রায়ান্ধকার একটি ঘর ক্রমশ যেন সংকীর্ণ হয়ে আসছে।' (ঐ)। এভাবেই অর্ধচেতনায় কথক কখনো অনুভব করছেন ভারগ্রস্ত কপালে স্ত্রী নমিতার

'ঠাণ্ডা হাত', কখনো দেয়ালে দেখছেন অদ্ভুত সব ছায়ার নকশা কখনো বা 'মেঘের মতো একটা মশারির চাল' নেমে আসছে মুখের ওপর। (ঐ) ইত্যাদি। এরই মাঝে লোকজনের অস্পষ্ট সংলাপ সমকালের অবস্থানকে জানিয়ে দিচ্ছে—'যা কিছু ছুঁতে যাও সব আগুন' কিংবা 'সুস্থ লোকের খাবার নেই তো রোগীর ওষুধ।' (ঐ)। বোঝা যাচ্ছে নিম্ন মধ্যবিত্তের অবস্থান। আর ইতিমধ্যে জাহাজযাত্রায় ভিড়ে জনসমুদ্রে যেখানে তিলধারণের জায়গা নেই সেখানে রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষা করে কথকের কানে পৌঁছায় বহুদিনের পরিচিত কণ্ঠস্বর। দেখেন পূর্ব পরিচিত প্রেমিকাকে। এখানেই পূর্ব প্রেমিকার সঙ্গে তার অবস্থানগত পার্থক্য ঘটে যায়। কারণ 'তার সঙ্গের মালপত্র', 'দাসীর কোলের ঘুমন্ত শিশু', 'উর্দিপরা চাপরাসী' এবং নিজের 'সুটকেসটা কোনরকমে পেতে বসবার ফাঁক খোঁজবার' জন্য হতাশ চেষ্টা (পৃ. ১৬৫, ঐ) এ সবই উচ্চবিত্তীয় অবস্থানের, যা দুজনের অবস্থানগত ফারাক করে দিয়েছে। আর জনতার সংলাপে উঠে আসে অর্থলোলুপ, মূল্যবোধহীন জীবনযাত্রার পরিচয়—'মানুষ হলে কেউ স্কুল মাস্টারি করে আজকের দিনে? তার চেয়ে রিক্‌শা টানলেও অনেক বেশি লাভ।' (পৃ. ১৬৫, ঐ) এভাবেই ঘটে যাচ্ছে মানুষের বোধহীন, স্বার্থান্ধতা যেখানে আদর্শ যাচ্ছে হারিয়ে। আর, কথক পূর্বের অভিজ্ঞতা ভুলে গিয়ে অর্ধসচেতন অবস্থায় শুনছেন—'পাশের বাড়ির ট্যাঙ্ক ছাপিয়ে জল পড়ছে বোধ হয় শুধু এই জলের নিরবচ্ছিন্ন স্নিগ্ধ শব্দটি যদি শুনতে পেতাম।' (পৃ. ১৬৫, ঐ)। এই অনুভূতি হার্দিক এবং শুশ্রূষার মত জল নিমগ্নতার উদাহরণও বটে। বস্তুত, গল্পটি দুটি পর্বে লেখা। একটি পর্বে এসেছে কথকের পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং অন্য পর্বে বর্তমানে কথকের অসুস্থতা। অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে ষ্টিমারে দেখা হয়েছে পূর্ব প্রেমিকা শর্মিষ্ঠার সঙ্গে কথকের। এবং কথক জানাচ্ছেন — 'শর্মিষ্ঠার স্বামী বেশ বড়োদরের একজন সরকারি কর্মচারী, সম্প্রতি বদলি হয়ে যেখানে গিয়েছেন, শর্মিষ্ঠা পিত্রালয় থেকে শিশু-কন্যাকে নিয়ে সেখানেই রওনা হয়েছে।' (পৃ. ১৬৬, ঐ)। আর কথকের নিজের সামাজিক অবস্থান সামান্য 'স্কুল মাস্টার'। তাই, শর্মিষ্ঠা ও কথকের জীবনের গল্প আলাদা হয়ে গেছে ক্রমে তাদের সামাজিক অবস্থানের কারণেই। বিশেষত, 'শর্মিষ্ঠার দিকে আর একবার সবিস্ময়ে তাকালাম। তার পোশাক প্রসাধনের পরিচ্ছন্ন বিশেষত্বে, তার সহজ আত্মস্থ ভঙ্গিতে বোধ হয় প্রশান্তিরই পরিচয়। (ঐ) । আর কথককে দেখে শর্মিষ্ঠার মনে হয়েছে 'চেহারা দেখে চেনাই যায় না।' (পৃ. ১৬৫, ঐ)। অর্থাৎ

অবস্থান্তর বারবার মনে করিয়ে দিয়েছেন লেখক। এরপরেই ফিরে এসেছে বর্তমানে কথকের অসুস্থতা। কথকের শ্বশুরমশাই এর অনুশোচনা শোনা যাচ্ছে—'আড়াই টাকা সের বয়ফ, দশ-বিশ সের কিনতে কত টাকা লাগে হিসেব আছে'? (ঐ)। এই সঙ্গে আক্ষেপ 'এমন কাজের খোঁজে তাড়াতাড়ি যাবার দরকার কী ছিল! বরাতে তো সেই—স্কুল মাস্টারি।' (ঐ)। অর্থ ও আদর্শ একেবারেই প্রতিস্পর্ধি হয়ে উঠেছে এখানে। আর কথকের উক্তি 'কোটের ভেতরের পকেট'—এ টাকা আছে যেন আদর্শ-ভ্রষ্টতার ইঙ্গিত দিয়েছে। এই অবস্থান কিভাবে অনুভূতির মূল্যকে হারিয়ে দেয় কথকের স্মৃতিচারণে তা উঠে এসেছে—'যেখানে আমাদের পরিচয় হয়েছিল, সেখান থেকে আমি অনেক ধাপ নেমে এসেছি, তুমি গেছ উঠে। আমি দরিদ্র স্কুল-মাস্টার, ব্রতবড়ো, নিষ্ঠা নেই। যুদ্ধের বাজারে আগুন যেখানেই লাগুক, ছাই হল আমাদের সংসার সবার আগে। তাই আজকের দিনে আলাদীনের প্রদীপ যাদের হাতে তাদের একজনের দরজায় লোভে দুরাশায় ধন্না দিতে গিয়েছিলাম। কিন্তু, তাও ভাগ্যে সইল না। জ্বরে পড়ে রুগ্ন দেহ নিয়ে পুনঃমুষিক হয়ে ঘরে ফিরছি। তুমি কবে আমার জীবনে কী ছিলে, তা মনে রাখবার উৎসাহটুকু আমার নেই।' (পৃ. ১৬৭, ঐ)। এভাবেই হারিয়ে গেছে অনুভূতিগুলি এবং পারস্পরিকতার দায় গিয়েছে হারিয়ে। আদর্শবান মাস্টারমশাই দুরাচারী, লোভী, স্বার্থান্ধ মানুষের দরজায় দরজায় ঠোক্কর খেয়ে ফেরেন। আর তাদের গায়ে তকমা জোটে অসফলতার। তাই, ফেরার পথে শর্মিষ্ঠা যখন গাঢ় স্বরে বলেছিল 'আমার কাছে কত বড়ো পাওনা তোমার ছিল, তার কীই-বা দিতে পারলাম।' (পৃ. ১৬৭-১৬৮, ঐ)। এই আকৃতি যেন চিরকালীন প্রেমিকের আর্তি হয়ে উঠতে চেয়েছে। কথক সে মুহূর্তে কিছু বলেন নি অথচ তাকে যেন সম্পূর্ণ ধিক্কৃত করে ষ্টিমার থেকে বিদায় নেবার সময় শর্মিষ্ঠাকে তাড়াতাড়ি তার মানিব্যাগটা বের করে ছুঁড়ে দিয়েছেন কথক—শর্মিষ্ঠার শ্লেষ—'শেষকালে শুধু কি ওইটুকুই মনে পড়ল।' (পৃ. ১৬৮, ঐ)। উত্তরে হেসেছেন কথক, এবং নিজের মনে মনে জেনেছেন—'শর্মিষ্ঠা কখন ব্যাগ খুলবে জানি না, খুললে আমার চিঠির টুকরোটুকু পাবে নিশ্চয়। লিখেছি—'তোমার কাছে অনেক বড়ো পাওনা আমার ছিল, তার সামান্য কিছু শোধ নিলাম।' (পৃ. ১৬৮, ঐ)। কিন্তু, ঋণশোধ আরও আপ্লুত করে পাঠককে এবং প্রেমিকার অর্থ চুরিতে প্রেমিকের প্রবল আর্থিক দৈন্য ধরা পড়ে। অথচ, শর্মিষ্ঠা ষ্টিমার ছাড়ার আগের মুহূর্তেও প্রখর অনুভূতিতে যেন বেদনাদায়ক

আর্তি নিয়ে বলেছিল 'আর যেন দেখা না হয়।' (ঐ)। কথক ভাবেননি সে সব কোন কথাই। তার অনুভূতি ছাপিয়ে বড় হয়েছে আর্থিক দুরবস্থা। শর্মিষ্ঠার বেদনার্তিকে নয়, অনুভূতিপ্রবণ মানুষেরই ভাবনা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা এবং ইচ্ছেকৃতই যেন আত্মধিক্কৃত হওয়া। আর পরিবেশ এই ধিক্কার বর্ধিত করেছে। ফিরে আসার পর শ্বশুর মশায়ের গলার স্বরটা অন্যরকম শোনায়—'এতো একশ টাকার নোট ভাঙাব কোথায়?' (পৃ. ১৬৯) কিংবা 'এতক্ষণে বুঝেছি, কিছু কাজ সেখানে নির্ঘাত বাগিয়েছে'। (ঐ)। সমাজের মুখ যেখানে বর্ণনা করেছেন অর্থই সে সমাজে প্রধান। আর্থিক প্রতিষ্ঠাই সামাজিক প্রতিষ্ঠা। এইভাবে টাকার নিরিখে আদর্শ অনুভূতি হারিয়ে যায়। ভেঙে যায় বিশ্বাসও। কারণ শর্মিষ্ঠাই 'ইতস্তত করার অবসর পর্যন্ত না দিয়ে মানিব্যাগটা বার করে আমার হাতে তুলে দিলে।' (পৃ. ১৬৭, ঐ) এবং জানাল 'সবকিছুর দাম কষা যায় না।' (পৃ. ১৬৭, ঐ) আমাদের মনে হয়েছে গল্পটিকে সম্পূর্ণ বিপরীত দর্শনে এখানে দেখানো হচ্ছে। খুবই তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে তাই শেষের ঘটনাটি। তাই, প্রেম থেকে প্রেমহীনতা, শর্মিষ্ঠার প্রশান্তি, কথকের বিভ্রান্তি, কথকের স্ত্রী নমিতার অসহায়তা প্রভৃতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এভাবেই আদর্শহীন, মূল্যবোধহীন জীবনের পটভূমি রচিত হতে থাকে।

'চুরি' গল্পটিও 'কুড়িয়ে ছড়িয়ে' (১৯৪৫ খ্রিঃ) গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত। 'চুরি' গল্পের কেন্দ্রে রয়েছেন মাস্টারমশাই প্যারীমোহনবাবু। প্যারীমোহনবাবুর বয়স হয়েছে। তার গল্পের সূচনায় দেখা যাচ্ছে—'সকাল থেকে হাঁটাহাঁটি বড়ো বেশি হয়েছে, কোমরের ব্যথাটাও বেড়েছে।' (পৃ. ১৮০, চুরি, প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প, ২য় খণ্ড)। আর পাশাপাশি জানা যাচ্ছে প্যারীমোহনবাবুর অভাবের টানাটানির সংসার—'টিউশনি ও মাস্টারির আগে কোনরকমে লজ্জা নিবারণ করে শাক-ভাতের সংস্থান হত।' (পৃ. ১৮১, ঐ)। অথচ যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে প্যারীমোহনবাবুর 'দুর্দশা চরমসীমায় গিয়ে পৌঁছেছে।' (ঐ) । কিন্তু, গল্প সূচনাতেই প্রবল আত্মভিমানী, আদর্শবাদী ও নীতিবান এক শিক্ষকের সাক্ষাৎ পাচ্ছি আমরা। যিনি, পানের দোকানিকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন অতিরিক্ত অর্থ — 'জলকাদার ভিতর এতখানি রাস্তা আবার ফিরে যেতে অত্যন্ত কষ্টই হবে, তবু না গিয়ে তাঁর উপায় নেই। একবার অবশ্য মনে হয়েছিল পয়সা দুটো রাস্তার কোনো গরিব ভিখারীকে দিয়ে দিলেই হাঙ্গামা চুকে যায়। কিন্তু বিবেকের দংশন তাতে শান্ত হয় না।' (পৃ. ১৮০, ঐ)। তাই দোকানে অর্থ ফেরত দিতে যান তিনি। আর

আশ্চর্যজনকভাবে দোকানি ভাবছে দু'ঘণ্টা বাদে দু'পয়সা ফেরৎ চাইতে এসেছে তার ক্রেতা—'অত্যন্ত অপমানিত বোধ করলেও প্যারীমোহনবাবুকে এবার ধৈর্য্য ধরে বুঝিয়ে দিতে হল যে, তিনি দোকানদারের কাছে কিছু দাবি করতে আসেন নি ...।' (ঐ) অথচ প্যারীমোহনবাবু বাড়ি ফিরতে ফিরতে দোকানির 'করুণামিশ্রিত অবজ্ঞার' কথা ভাবতে ভাবতে চললেন কারণ —'আহত না হবার মত অসাড় এখনো তিনি হননি, কিন্তু তবু এ ধরনের অবজ্ঞা অনেকটা এখন সরে গিয়েছে। সাধারণত মানুষের কাছে অবজ্ঞাই এখন তিনি পেয়ে থাকেন, সে অবজ্ঞা করুণা বা সদয় সহানুভূতির আবরণে বরং আরো তিক্তই লাগে।' (ঐ) কিন্তু 'সহানুভূতি' বা করুণার কারণ কি? এর একমাত্র কারণ তার আর্থিক দৈন্য। এরপরেই মূল গল্পের শুরু— প্যারীমোহনবাবু চিরকাল অত্যন্ত সিধে কড়া মাস্টার বলে পরিচিত। ছেলেদের পড়াবার জন্যে তিনি চিরদিন প্রাণপাত করে এসেছেন। কিন্তু তাঁর কাছে কোনো ফাঁকি মিথ্যার এতটুকু প্রশয় নেই। অন্যায় দেখলে তিনি বজ্রের মত কঠিন।' (পৃ. ১৮১, ঐ)। আর তার প্রাক্তন ছাত্র রাখাল দফাদার যে ছাত্র হিসেবে মোটেই ভাল ছিল না, তার উপর 'শয়তানী বুদ্ধিতে ছিল পাকা।' (ঐ)। অর্থাৎ প্যারীমোহনবাবুর কাছে সে মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়, ছাত্র বলেও নয়, ব্যক্তিমানুষ হিসেবেও নয়— অথচ আজ সেই রাখাল বুদ্ধের বাজারে ব্যবসায়ে ফুলে ফেঁপে উঠেছে আর তার কাছে প্রার্থী তারই মাস্টারমশাই প্যারীমোহনবাবু। 'রাখালের প্যারীমোহনবাবুর প্রতি অনুরাগ বা শ্রদ্ধা না থাক, কৃতজ্ঞতাটুকু ছিল।' (পৃ. ১৮১, ঐ)। আর তাই রাখাল তার ছেলেকে পড়ানোর দায়িত্ব দিয়েছিল প্যারীমোহনবাবুর উপর। আর সেই কাজটা পেয়ে বেঁচে গিয়েছিলেন প্যারীমোহনবাবু। তবে, তার দৈন্যদশার অবশ্য আরও কারণ আছে—'পাড়ায় শৌখিন নতুন স্কুলটি হওয়ার দরুণ তাদের স্কুলের অবস্থা অত্যন্ত কাহিল। স্কুল উঠে যাবার সম্ভাবনা দেখিয়ে' (ঐ) মাইনে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে শিক্ষকদের। তাই, অবশেষে প্যারীমোহনবাবু রাখালের গদিতে পুনরায় যখন আবির্ভূত হচ্ছেন যখন, তখন 'মিলিটারি কনট্রাক্টের' দৌলতে ইঁট সুড়কির রমরমা ব্যবসার অধিকারী রাখালের সময় হচ্ছে না দেখা করার। অবশেষে খবর পেয়ে সে যেভাবে দেখা করছে তাতে 'আর কেউ হলে গর্ববোধ করত' (ঐ)। কিন্তু প্যারীমোহন জানেন সেটা তার ছদ্মবেশ। এরপরেই সেটা ধরা পড়ে। দামী কার্পেট মোড়া অফিস ঘরে নিজেকে বেমানান মনে হয়েছে প্যারীমোহনবাবু, তিনি সংকোচ বোধ করেছেন। আর রাখাল সগর্বে

বেশ একটু অনুকম্পা মিশ্রিত সম্মানের সঙ্গে ঘরের অপর ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বলেছেন — 'আমার মাস্টারমশাই ছেলেবলায় আমায় পড়িয়েছেন—মানে গাধা পিটে মানুষ করেছেন আর কী! (পৃ. ১৮২, ঐ)। আর কেতাদুরস্তভাবে জ্যামিতিক সরলরেখায় অপর পক্ষ ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ার ছেড়ে একটু উঠবার ভঙ্গি করে থাকলেও এতে অপমানিত প্যারীমোহনবাবু অস্বস্তিবোধ করে কোনরকমে নিজের দরকারী কথা সেরে নিতে চেয়েছেন। কিন্তু রাখাল ছাড়তে চায়নি—'নেহাত কবে কোন যুগে ছেলেবেলায় পড়িয়েছেন বলে জীবন যুদ্ধের এমন পরাস্ত লবেজান সৈনিককে মনে রেখে খাতির দেখানোর মধ্যে যে কতখানি উদারতা ও মহত্ত্ব আছে, তা বোঝবার এমন সুযোগ সে ছাড়তে পারে।' (পৃ. ১৮২, ঐ)। তাই, প্যারীমোহনবাবুকে আর তার অবস্থাকে সে যেন দয়া দেখিয়ে অপমান করেছে—'সবায়ের আঙুল ফুলে কলাগাছ এ শুধু বেচারা মাস্টারদের কপাল পুড়ে ছাই হয়েছে'। (পৃ. ১৮২, ঐ)। ক্রমশ মাত্রা চড়েছে অনুকম্পার। রাখাল হঠাৎ ' জিজ্ঞাসা করেছে 'আচ্ছা স্কুলে এখন কত মাইনে পান মাস্টারমশাই।' (পৃ. ১৮৩, ঐ)। আর প্যারীমোহনবাবুর অস্বস্তি ক্রমে পরিণত হচ্ছে বেদনায় — 'পিন ফোটানো পোকাকে যেন অনুবীক্ষণ কাচের তলায় ধরা হয়েছে। তবু, বাধ্য হয়ে বলেছেন, ষাট টাকা পাই।' (পৃ. ১৮৩, ঐ)। ক্রমে রাখালের আলোচনায় যেন ভদ্রতা নয়, লৌকিকতা নয়, অহংকারকেই ধরা গেছে। নিজের ন্যূনতম যোগ্যতা না থাকার দৈন্য সে টাকার গর্বে যেন তুচ্ছ বলে প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছে। 'একশো টাকায় একটা মানুষের আজকাল চলে না, একটা গোটা সংসার। একটা রিকশাওয়ালা দিনে আজকাল কত রোজগার করে জান তো?' (পৃ. ১৮৩, ঐ)। এমনকি নিজের গুরুকে সে উপদেশও দিয়েছে ও বলেছে — আমি বলি কী মাস্টারমশাই এলাই নটাই ছেড়ে দিতে পারেন না? সারাজীবন মাস্টারি করে তো দেখলেন, জাতও গেল পেটও ভরল না।' (ঐ)। আর প্যারীমোহনবাবু যখন রাখালের ছেলেকে অঙ্কের টিউশনি দেবার জন্য বলেছেন রাখাল বলেছে—যে কলেজে ঢোকা ছেলেরা স্কুলের মাস্টারদের মনে করে 'ওল্ড ফসিল্‌স'। অবস্থা ও সময়ের নিরিখে প্যারীমোহনবাবুরা তাদের নিজস্বতা ও আদর্শের বৃত্তে যেন এ সময়ের থেকে বহুদূরে অবস্থান করেন। অবশেষে রাখাল নিজে থেকেই বলেছে— 'শয়তানের রাজ্যে টিকে থাকতে হলে শয়তানি না করে উপায় নেই, এই সহজ কথাটা আপনারা কিছুতেই বুঝছেন না।' (ঐ)। এখানে একজন রাখাল যেন অসংখ্য স্বার্থান্বেষী সামাজিক

মানুষের প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছে। আদর্শভ্রষ্ট, লোভী, অসৎ—এই মানুষদের মাঝখানে ব্যতিক্রমী হয়ে উঠেছেন মাস্টারমশাই প্যারীমোহন। অথচ তাঁর এই আদর্শনিষ্ঠা তিনি তার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে বপন করতে পারেন নি। তাঁর পরিবার কিংবা সন্তানরাও সময়ের সঙ্গে তাল মেলাতে আদর্শভ্রষ্ট হয়েছে। এর কারণও আর্থিক সংকট—'দুবেলা উনুন ধরাবার দরকারই থাকে না, অনেকদিন রাঁধবার জিনিসের অভাবে। অভাব যেদিন থাকে না, সেদিনও প্যারীমোহনবাবুর স্ত্রী হেমলতা একবেলার বেশি আগুন জ্বালেন না। দুবেলা রান্না করবার মতো অবস্থা তাদের অনেকদিন ঘুচে গেছে।' (পৃ. ১৮৪, ঐ)। আর তাদের বাসস্থানটিও করুণতর করে তোলে পরিবেশকে— 'গলির মধ্যে একটি অত্যন্ত পুরনো জীর্ণ দোতলা বাড়ির নিচের দিকে দুটি অন্ধকার স্যাঁতস্যাঁতে ঘর প্যারীমোহনবাবু আজ বিশ বছর ধরে ভাড়া করে আছেন। বিশ বছরের মধ্যে কোনোদিন সে বাড়ির সংস্কার হয়েছে কিনা সন্দেহ।' (পৃ. ১৮৪, ঐ) এরমধ্যে থেকেও প্যারীমোহনবাবুর আদর্শনিষ্ঠা যেন মানবিকতার প্রতিমূর্তি হয়ে ওঠে। নির্বিকার, অথচ উদাসীন নন তিনি। তাই লক্ষ্য করেন মেয়ে উমা 'নতুন একটা শাড়ি পড়েছে'। (পৃ. ১৮৪, ঐ)। এবং প্রশ্ন করেন 'শাড়ি এল কোথা থেকে।' (ঐ)। ক্রমে জানতে পারেন, শাড়িটি পুলিনবাবুর দেওয়া। অথচ প্যারীমোহনবাবুর স্ত্রীই একদিন বলেছিলেন 'পুলিনবাবু লোকটির ধরনধারন আমার ভালো লাগছে না কিন্তু।' (ঐ)। অথচ সময়ের ফেরে অন্যেরা আপোস করলেও সরল, সত্যাশ্রয়ী প্যারীমোহনবাবু তা পারেন না। তাই, শুধু এতদিন তাঁর দৃষ্টি নিজের দুশ্চিন্তার মধ্যে মগ্ন হয়েছিল— 'এ ঘনিষ্ঠতার আসল চেহারা আজ এই শাড়িটির সাহায্যে তার সমস্ত জঘন্যতা নিয়ে তাঁর কাছে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে'। (পৃ. ১৮৫, ঐ)। নীতিবাদী মানুষটি যেন তার সংসারের পরিণাম উপলব্ধি করেন। অথচ প্রতিবাদ করতেও গিয়েও স্তব্ধ হয়ে যান তিনি। নিজের ছেলে নেপু চুরি করে আনে প্রতিবেশীর ঘর থেকে। নেপুকে শাসন করতে গিয়ে হাত তুলেও খানিকক্ষণ কেমন অদ্ভুতভাবে নেপুর দিকে তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে পাখাটা তিনি নামিয়ে নেন। তারপর 'পাখাটা সেইখানে ফেলে দিয়ে দেওয়ালে ঠেস রাখা ছাতাটা নিয়ে বোধহয় চলে যান তিনি'। (ঐ)। এভাবেই দুটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে মূল্যবোধহীন, অসুস্থ - অসততা প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প - বিষয়ে যুক্ত হয়েছে। মানবিকতার বিধ্বস্ত পরাজিত চিত্র উঠে এসেছে গল্পে।

'মেয়েটি' — এই গল্পটি 'শ্রাবণে ফাল্গুনে' (১৯৬৫ খ্রিঃ) গল্পগ্রন্থের একটি অন্যতম গল্প। এই

গল্পে আবার অবমূল্যায়ন ঘটেছে অন্যভাবে। গল্পটিতে একটি ট্রেনযাত্রার অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখিত হয়েছে। অভিজ্ঞতাটি মর্মান্তিক ও বেদনাদায়ক। এবং মাত্র ঘন্টা দু'য়েকের অভিজ্ঞতা সেটি। কারণ, গল্প সূচনায় আছে — 'ট্রেন ডোঙ্গারগড় থেকে ছাড়ল, আর ঘণ্টা আড়াই বাদে গোন্ডিয়া পৌঁছবে। মেলে লাগত ঘণ্টা দেড়েক।' (পৃ. ১৫০, মেয়েটি, প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প, ৩য় খণ্ড)। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র অরুণাভের অভিজ্ঞতাই এখানে গল্পটির বিষয়। এই অভিজ্ঞতাটি অরুণাভের কাছে বেশ পুরনো। ঘটনাটি এই—নাগপুর ও রায়পুরে কার্যত কর্মসূত্রে 'মাকুর মতোই' ছুটোছুটি করা অরুণাভ দারেকাশা বলে একটি ষ্টেশনে অদ্ভুত ঘটনার সম্মুখীন হয়। দারেকাশা নগণ্য অখ্যাত একটি ষ্টেশন— 'মেল কি এক্সপ্রেস তো নয়ই এমনকি সব প্যাসেঞ্জারই দাঁড়ায় না। কেমন একটু উদাম ছন্নছাড়া বলে মনে হয়। ছোটো বড়ো কম বেশি জমকালো সব ষ্টেশনের মিছিলে তার অনাথ অসহায় চেহারায় কেমন যেন মায়া লাগে।' (ঐ)। এই মিছিলে একা হয়ে মানুষের আর্তি, আকূতি, গল্পটিতে অরুণাভের অভিজ্ঞতাকে করুণতর করে তুলছে কারণ। এখানেই মনের মধ্যে ছাপ রেখে গেছে অদ্ভুত ঘটনা — 'মেল ট্রেনের এখানে থামবার কথা নয়। লাইন ক্লীয়ার না পেয়েই নিশ্চয় থামতে হয়েছিল। ট্রেনটার এ দুর্ভোগ সেদিন ওইখানেই শুরু হয়নি। ভুমোয়ালের পর কি একটা গোলমালে নাগপুরেই এসেছিল দেরি করে, তখনও অরুণাভ এপথে যাতায়াতে অভ্যস্ত হয়নি। (পৃ. ১৫১, ঐ)। অপ্রত্যাশিতভাবে ট্রেন থেমে যাওয়ায় অল্পবয়স্ক অরুণাভের 'এক হিসেবে ভালোই লেগেছিল। তার সহযাত্রী মিঃ রাকেশ বিরক্ত হয়েছিলেন, কথাবার্তায় তার সে বিরক্তি গোপন থাকেনি। এ অবস্থায় অরুণাভ উল্টোদিকের দরজাটা খুলে দাঁড়িয়েছিল। সেখানে সে দেখেছিল পরপর 'দুসার মালগাড়ি সামনে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে।' (ঐ)। আর তখন সে এও ভেবেছিল 'তেমন ষ্টেশন হলে দু-চারজন উৎসাহী ফেরিওয়ালাকে মেলের যাত্রীদের এটা সেটা বেচবার আশায় লাইনের ধারে ঘোরাফেরা করতে দেখা যেত'। (ঐ)। ঠিক তখনি সে দেখেছিল দূরে ইঞ্জিনের দিকে কটা হাঘরে ছেলেমেয়েকে দেখা যাচ্ছে। কেউ নিচে দাঁড়িয়ে কেউ বা পাদান বেয়ে ওপরে উঠে ভিক্ষের চেষ্টাই করছে বোধহয়। আর পেছনের দিকে তাকিয়ে সে মুগ্ধ হয়েছিল—তাদের ট্রেন ও মালগাড়ির ফাঁক দিয়ে দূরের একটা ছোটো পাহাড় দেখা যাচ্ছে। 'পাহাড়ের ওপর এতদূর থেকে দেখতে চিনির মঠের মতো একটা মন্দিরের চূড়োই বুঝি পড়ন্ত আলোয় জ্বলছে।

তার নিচে যেসব রঙে ফোঁটা নড়াচড়া করছে সেগুলো মানুষই নিশ্চয়।' (পৃ. ১৫২, ঐ)। এই আনন্দদায়ক দৃশ্যের পরে হঠাৎ 'ট্রাউজারে মৃদু একটা টান পড়ায়' (ঐ) চমকে উঠেছিল অরুণাভ এবং দেখেছিল 'অত্যন্ত ময়লা নোংরা ছেঁড়া ফ্রকের অংশমাত্র গায়ে কোনমতে ঝোলানো সেই হাঘরেদের দলের ছ-সাত বছরের একটা মেয়ে ফুটবোর্ড বেয়ে উঠে তার পা ধরে ভিক্ষে চাইছে।' (ঐ)। সে শুনেছিল 'অত্যন্ত মিহি মিষ্টি কণ্ঠে' — 'কুছমিলে সাব' (ঐ) এর মত অনুনয়। কেয়েটির ঈষৎ ফাটা শুকনো মুখে বড়ো বড়ো চোখ দুটি শুধু অদ্ভুতভাবে উজ্জ্বল। কেমন একটা করুণ সরলতার সঙ্গে 'নির্দোষ দুষ্টুমি যেন সেখানে মেশানো।' (পৃ. ১৫২, ঐ) অরুণাভের নিশ্চয়ই ভালো লেগেছিল তা নাহলে সে ধমক দিত। কিন্তু ধমকে গলাটা যতদূর সম্ভব ভারী করে বলেছে, 'কিছু মিলবে না, যাঃ।' (ঐ)। প্রশ্রয় ও সহানুভূতিই এখানে প্রতিফলিত। কিন্তু মেয়েটা অত সহজে হার মানে নি, 'সে তার বাঁধাবুলি আউড়ে গেছে— 'সাহেবের সে গোড় লাগে। সাহেব তার মা বাপ' (ঐ) ইত্যাদি। অরুণাভ ভালো লেগেছিল 'মিষ্টি মিহি কচি গলায় বাঁকা দেহাতী ভাষা' (ঐ) শুনতে। এরপরেই মেয়েটা উঠে এসে তার পা ধরে ফেলেছিল, অরুণাভ চেয়েছিল মেয়েটিকে 'যা হোক কিছু দিয়ে বিদেয় করতে' (ঐ) কিন্তু ইতিমধ্যেই ট্রেন ছেড়ে দিয়েছিল। ব্যস্ত হয়ে অরুণাভ তাকে নামাতে গিয়েছিল এবং 'মেয়েটা একধাপ নেমেও হাত বাড়িয়েছিল পয়সার জন্য। প্রায় হাতের মুঠোয় পাওয়া ভাগ্য এমনভাবে ফস্কে যেতে দিতে সে রাজি নয়।' (ঐ)। ধমক দিয়েও তাকে নামাতে না পেরে ব্যাগ থেকে পয়সা বের করতে যেতেই ট্রেনটা হঠাৎ চলতে শুরু করে, তবুও অরুণাভ মেয়েটাকে নামাতে যায় এবং উদ্বিগ্ন অরুণাভ 'পয়সা ছুঁড়ে দেব' বলেও 'কিন্তু মেয়েটা ভীতকাতর মুখে নামবার চেষ্টা করতে নিজেই হাত বাড়িয়ে তাকে ধরে ফেলেছিল।' (ঐ) কারণ ট্রেন তখন দ্রুতগতিতে চলতে শুরু করেছিল। এখানে অরুণাভের সংবেদনশীলতা, হৃদয়বত্তারই পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। অথচ মেয়েটা ট্রেনের কামরায় উঠে ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল, তারপরে ডুকরে কেঁদে ফিরে যেতে চেয়েছিল। এমনকী দরজা দিয়ে খেপার মত প্রায় লাফিয়েও পড়তে গিয়েছিল। এ অবস্থায় অরুণাভের সহযাত্রী মিঃ রাকেশের উক্তি যেন সমাজের আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতা ব্যক্ত করে গিয়েছে—'দরদ অত অকারণে খরচ করবেন না মশাই। দুনিয়ার বেশি ভালো করতে গেলে হিতে বিপরীত হয়।' (পৃ. ১৫৩, ঐ) বিমূঢ় অরুণাভ যখন ঠিক করতে পারেনি কি করবে তখন সহযাত্রীর এই

অযাচিত উপদেশ এক বিশেষ শ্রেণীর গা বাঁচানো মানসিকতা স্পষ্ট করে দিয়েছে। আরও বিভ্রান্ত হয়েছিল অরুণাভ, মেয়েটা তখন কাঁদতে কাঁদতে করুণ মিনতি করে চলেছিল 'ও সাহেব তোর পায়ে তুই আমায় নামিয়ে দে।' (ঐ) ওদিকে মি: রাকেশ ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছিলেন 'এত যখন দরদ চেন টেনে তখন নামিয়ে দেননি কেন?' (ঐ) অরুণাভ সে মুহূর্তে অসহায়, আর 'মেয়েটা অসহায় কাতর চোখে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে মাঝে মাঝে ফুঁপিয়ে উঠছিল রুদ্ধ কান্নার বেগে।' (ঐ)। আর অরুণাভর পা জড়িয়ে নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিল সে। মি: রাকেশের ভয়ে হয়ত চুপ করেছিল সে। হয়ত নিজের ভাগ্যকে সঁপে দিয়েছিল। সে বুঝেছিল তার অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, শিশু হলেও সে সহসা পরিণত হয়ে উঠেছিল। এদিকে ট্রেন ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পৌঁছেছিল শেষে ষ্টেশন ডোঙ্গারগড়ে।— 'ট্রেন অত্যন্ত লেট হওয়ার দরুণ ডোঙ্গারগড় যখন পৌঁছেছিল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। বড়ো ষ্টেশন প্ল্যাটফর্ম গিজগিজ করছে ঠেলাঠেলি করা যাত্রীদের ভিড়ে।' (ঐ) অরুণাভ মেয়েটাকে নিয়ে যখন প্ল্যাটফর্মে নেমেছে তখন মি: রাকেশ উপদেশ দিয়েছিল—'ওকে নামিয়ে দিলেই হয়।' (ঐ) এই দায়সারা প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে সহৃদয় অরুণাভ চেয়েছিল—'মেয়েটাকে কারুর জিম্মায় তার নিজের জায়গায়' (ঐ) পাঠাতে। কিন্তু কোথাও কাউকে সে পায়নি—'ষ্টেশনের কোন বিভাগে গিয়ে বলা যে বৃথা তা সে একটা নমুনা থেকেই বুঝেছে। তাদের দায় তো নয়ই, শোনবার ধৈর্য্যেরও অভাব।' (ঐ) এইভাবে অরুণাভ ক্রমশ যেন বিধ্বস্ত, হতাশাগ্রস্ত হয়েছে। তার এই অনুভূতি, পরার্থপরতা কিভাবে সমাজের কাছে অর্থহীন হয়ে গেছে তা বোঝবার জন্যই যেন অরুণাভকে তৈরি করেছেন লেখক। অরুণাভ তখন'সঙ্গে নিয়ে ছোটাছুটি করার বদলে মেয়েটাকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে রেখে' (ঐ) খোঁজখবর করতে চেয়েছিল। এজন্য মেয়েটার হাতে সে টাকা গুঁজে দিয়ে দেখতে যেতে চেয়েছিল। মেয়েটা কিন্তু অরুণাভকে ছাড়েনি 'আরেক হাতে শক্ত করে অরুণাভের জানার প্রান্ত ধরে রেখেছিল। এই অজানা ভয়াবহ জগতে তার একটিমাত্র নির্ভরের মানুষকে সে ছাড়তে রাজি নয়।' (পৃ. ১৫৪, ঐ)। এইভাবে নিরাপত্তাহীনতাও এখানে যেন তাৎপর্য পেয়েছে। মেয়েটা 'ল্যাংবোটের মতো' (ঐ) অরুণাভের সঙ্গে থেকে গেছে।

শেষ মুহূর্তে অরুণাভ ভেবেছিল—'ষ্টেশনের কুলি খালাসী গোছের কাউকে বললে হয়তো কাজ

হতে পারে। তাদের কাছে তবু এ ব্যাপারে মায়াদয়া সম্ভব।' (পৃ. ১৫৪, ঐ) এখানে লক্ষণীয় বিশ্বস্ততা, নির্ভরতা ক্রমশ মধ্যবিত্তের থেকে সরে যাচ্ছে। অরুণাভ নিজে মধ্যবিত্ত হয়েও সে নিজের শ্রেণীকে চিনে গেছে যেন। ইতিমধ্যে ট্রেনের হুইসেল বেজে উঠেছে। এতক্ষণে বিভ্রান্ত অরুণাভ অজানা ষ্টেশনে ভয় পেয়েছে—'নিরুপায় যন্ত্রণায় জোর করে মেয়েটার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটতে ছুটতে সে গিয়ে ট্রেনে লাফিয়ে উঠেছিল।' (ঐ) সাধ ও সাধ্যের ব্যবধান বেড়ে উঠেছে এখানে। আর 'কেঁদে উঠে মেয়েটাও ছুটতে চেষ্টা করেছিল পিছু পিছু কিন্তু হোঁচট খেয়ে সজোরে প্ল্যাটফর্মের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে গেছল।' (ঐ)। এই বেদনাদায়ক চিত্র সহসা যেন রুদ্ধশ্বাস নাটক হয়ে ওঠে। আর 'তবু দাঁতে দাঁত চেপে অরুণাভকে জোর করে মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিতে হয়েছিল।' (ঐ) উপায়হীন, ব্যর্থ অরুণাভকে মিঃ রাকেশের বিদ্রূপ যেন কষাঘাত করেছে 'খুব একটা মহানুভবতা দেখিয়ে এলেন তাহলে?' (ঐ) অরুণাভ এই বেদনায়, ব্যর্থতায় ক্রমাগত বিদ্ধ হয়ে বাড়ি ফিরে এসেছিল। কোলকাতায় ফিরে নিজের ঘরে নিজের মেয়েকে দেখতে না পেয়ে স্ত্রীকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেছিল মেয়ের কথা। স্ত্রী ঠাট্টা করেছিল 'মিনুকে তো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।' (ঐ) অরুণাভ যেন নিজের ব্যর্থতার সাথে একে তুলনীয় মনে হয়েছিল, তাই ঠাট্টা সে না বুঝে চিৎকার করে উঠেছিল। আর 'সোফার পেছন থেকে পাঁচবছরের মিনুর মিষ্টি মিহি গলা শোনা গেছল।' (পৃঃ ১৫৪, ঐ) নিজের মেয়েকে কোলে নিয়ে অরুণাভ দেখেছে—'এ মেয়ের মাথার চুল আজন্ম তেল না পড়া শুকনো লালচে পাঁশুটে নয়। তার গায়ে চিমটি কাটলে ময়লা ওঠে না'। (ঐ)। অরুণাভ একাধারে বেদনার্ত এবং আশ্বস্ত হয়ে উঠেছিল নিরাপত্তায়। কিন্তু, বেদনার কাঁটা রয়েই গেছিল অরুণাভের মনে। এভাবেই বাঙালি সমাজ থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেছে ক্রমে ক্রমে সহানুভূতি, সংবেদনশীলতা, প্রেম, মানবিকতা। অরুণাভ চেষ্টা করেও বিফল হয়েছে—তার এই ব্যর্থতা তাই সার্বিক ও সর্বতোভাবে সমাজ-বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে।

'ক্বচিৎ কখনো' (১৯৬২ খ্রিঃ) গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'হারানো মেয়ে' গল্পটিতেও বেজেছে সেই একই সুর—মূল্যবোধহীনতার বিষয়ই এটি। তবে এখানে তা আরও তীব্র ও চমকপ্রদ। কারণ, এ গল্পে শৈশবও পণ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং যে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে সামান্য আশা-ভরসা প্রত্যাশা থাকে তাও যেন ক্রমশ অন্তর্হিত হয়ে যাবে— এই আশঙ্কায় গল্পটি পাঠককে এক গভীর সঙ্কটের কাছাকাছি

নিয়ে যায়। গল্পের সূচনায় যে অন্ধকার গলিপথের বিবরণ আছে তা যেন মনের অন্ধকার ও অবচেতনকে স্মরণ করায়। আর শৈশবের এই ভ্রষ্টতা যেন আমাদের তীব্র আঘাত দিয়ে সচেতন করে দিয়েছে। এ গল্পটিও উঠে এসেছে গল্প কথকের অভিজ্ঞতায়। ঘটনাটি সংক্ষেপে এরকম—কাজ সেরে রাতে বাড়ি ফেরেন গল্পকথক—'গলিটা দিয়ে গেলে একটু সুবিধে হয়। বড়ো রাস্তায় ঘুরে না গিয়ে তাই সাধারণত এই পথেই রোজ রাত্রে ফিরি।' (পৃ. ৪৭, হারানো মেয়ে, প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প, ৩য় খণ্ড)। আর গলিটা কেমন?—'একটু নোংরা, অন্ধকারও বটে।' (ঐ) তবু এই পথটাই কথকের পরিচিত, এমনকী—'বৃষ্টির দিনে কোথায় পোলে কোথায় খোদলে জল জমে থাকে তাও প্রায় মুখস্থ।' (ঐ) এইরকম পরিচিত পথে যাতায়াত করতে করতেই অদ্ভুত একটি ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন কথক—'গলিটা যেখানে বাঁক নিয়েছে সেখানকার মিটমিটে গ্যাসের আলোটাও' পৌঁছায় না ক্রমে বড় রাস্তা থেকে দূরবর্তী হলে এমন জায়গায় এসে পৌঁছেছেন লেখক এবং অন্ধকারেই অনুভব করেছেন 'ফ্রক পরা বছর দশেকের একটি মেয়ের পা-টাই আর একটু হলে মাড়িয়ে দিচ্ছিলাম।' (ঐ) সেই অন্ধকারেই কথক অবাক হয়েছেন, কারণ সেই রাতের অন্ধকারে একটি শিশুর এভাবে থাকার কথা নয়। তাই দেশলাই জ্বেলে তিনি দেখতে পান— মেয়েটির 'শীর্ণ কাতর চেহারা'য় অসহায়তা। তখনই মেয়েটির অবস্থান ও অসহায়তার কারণ জানা যায়—'মেয়েটিকে চিনি। এই গলিতে তাদের বাসা, মামার বাড়িতে থাকে। অত্যন্ত অভাবের সংসার। মামা কোথায় একটা কাপড়ের দোকানে কাজ করে। তাতে তার নিজের একপাল আন্ডাবাচ্চারই মুখের আধার জোটে না। বাপ-মা মরা অনাথ ভাগনীটা তাই গলগ্রহ হিসাবে বিনা মাইনের ঝি চাকরের মতোই থাকে।' (ঐ)।

কিন্তু, শিশু বলেই হয়ত মেয়েটা এতে কখনও ভ্রূক্ষেপ করে না এবং শিশু বলেই অন্যের কাছে ব্যবহৃত হতে থাকাটাও তার কাছে বোধগম্য নয়। 'ঝি চাকরের কাজ করাটা তার কাছে এখনো কোন শাস্তি নয়—একরকম খেলা।' (ঐ)। এই খেলাই তার শৈশবকে প্রাণবন্ত করে রেখেছে, তাই সারাদিনের পরিশ্রম, অন্যের হাতে একরকম প্রায় নির্যাতিত হয়েও তার মিষ্টি স্বভাব কিন্তু 'নেহাত বাচ্চা হলেও মেয়েটা বেশ চালাকচতুর।' (ঐ) তবে তার বুদ্ধিবৃত্তি সাধারণ ও স্বাভাবিক নিয়মেই চলে। তাই 'সেদিন মুদির দোকানে কি মশলা কিনে আমাদের রামু মুদির কাছে বাকি রেজগি নিয়ে হেসেই খুন।' এ তুমি

কত ফেরত দিয়েছ রামুদা। তুমি কিছুই হিসেব জানো না নতুন পয়সার'। (ঐ)। রামু মুদি এতে ক্ষুণ্ণ হয়। কারণ, 'তার দোকানে জিনিসের দর চড়া হতে পারে, কিন্তু ওজনে কি হিসেবে সে ঠকায় না কখনো'। (পৃ. ৪৮, ঐ)। কিন্তু, মেয়েটা তবু হাসতে হাসতে বলেছিল, 'তুমি তো আমায় এগার আনা ফেরৎ দেবে। একাত্তর নয়া পয়সা দিয়েছ কেন? এই নাও দু-নয়া পয়সা।' (পৃ. ৪৮, ঐ) এবং শৈশবের সততায় সে সবাইকে হতভম্ব করে চলে যায়। রামু আক্ষেপ করে বলে—'এ মেয়ের যদি অমন কপাল না হত।' (ঐ) ঐ উক্তি যেন সকলেরই কথা হয়ে ওঠে। প্রত্যেকেরই এ অনুভূতি হয় মেয়েটিকে দেখে। কিন্তু দুনিয়ার সংগ্রাম এখন বড়ো কঠিন। করুণায় মনটা একটু ভিজে না উঠতেই শুকিয়ে যায়।' (ঐ) এভাবেই সমকালের কাঠিন্য বিবৃত হয়। মানুষের মানবিকতা প্রকাশিত হয় না, আর এভাবেই দারিদ্র্য ও অসহায়তা সমান্তরালে নেমে আসে। এবং সামাজিক দৈন্যও পরিস্ফুট হয়। অথচ, সেই বিশেষ দিনটিতে মেয়েটির মুখে করুণ হতাশা লক্ষ্য করে কথকের বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে। মেয়েটার কাছ থেকে জানা যায় 'সিকিটা হাত থেকে পড়ে গিয়েছে।' (ঐ) দুর্দিনে, সংকটে এই সামান্য অর্থও খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কথক বুঝতে পেরেছেন এই দুর্দিনে হয়ত সিকি হারিয়ে যাওয়া শোকাবহ ব্যাপার। তবে তা দুর্ঘটনাও হয়ে উঠতে পারে সেটাও কথককে ভাবিয়েছে। কথক বুঝেছেন—'মেয়েটি মুখে না বললেও বোঝা গেল সিকি হারাবার জন্য তাকে বেশ কিছু শাস্তি পেতে হবে এবং সে শাস্তিকে ভয় করে। মেয়েটি হাসিখুশি থাকে নেহাত নিজের স্বভাবে, নইলে তার পরিবেশের তাতে কোনো সাহায্য নেই।' (পৃ. ৪৮, ঐ) আর মেয়েটি জানিয়েছে যে তার মামীর অম্বলের অসুখের জন্য রাত্রে তাকে পাঠানো হয়েছিল সোডা কিনতে। সেজন্য হাতে দেওয়া হয়েছিল একটি সিকি। এবং বলা হয়েছিল মোড়ের পানের দোকান থেকে তাড়াতাড়ি এক বোতল সোডা আনতে হবে। গলির মুখে একটা ছুঁচোর আওয়াজ পেয়ে সিকিটা পড়ে গেছে। শেষপর্যন্ত সিকিটা পাওয়া যায় নি। কথকের আর্তিতে পরিস্থিতি ব্যাখ্যাত হয়—'বাপ-মা খোয়ানো ঝি বৃত্তি করা মেয়ের হারানো সিকি অত সহজে কি পাওয়া যায়। (পৃ. ৪৮, ঐ) ইতিমধ্যে মেয়েটার মামা স্বয়ং এসে হাজির হয় এবং 'সিকি হারাবার কথা শুনে তো রাস্তার উপরই প্রায় এই মারেন তো সেই মারেন। নেহাত আমি উপস্থিত থাকাতেই তা মুখেই শেষ হল।' (ঐ) আর যাবার সময় মামা হুমকি দিয়ে গেলেন, 'ও সিকি যদি না পাস তো বাড়ির দরজা বন্ধ জানবি।' (ঐ)

ইতিমধ্যে দেশলাই-এর কাঠি ফুরিয়ে আসায় মেয়েটার মুখ আর দেখা যায় না, পরিবর্তে টর্চের জোরালো আলো মুখে এসে পড়ে তাদের। অর্থবান দুলাল হাজরা সেখানে দেখা দেয় এবং জানা যায় 'গত কবছরের লোহা লক্কড়ের কারবারে ফেঁপে উঠে এ গলি ছাড়িয়ে সে প্রায় চৌরঙ্গিতে পৌঁছে গেছে বলা যায়।' (ঐ) আর সে তার পেল্লায় মোটরটা গলিতে ঢোকাতে পারে না বলে বেশ রাতে টলতে টলতে ফেরে। এবং এ গলির তাতেই কৃতার্থ হওয়া উচিত। এখানে ধরা পড়ে চরিত্রগত অবস্থান্তর। একদিকে সিকি হারানো মেয়েটি ও কথক, অন্যদিকে দুলাল হাজরার মত অর্থবান ব্যক্তি—জটিল সময়গত কারণেই যে এই তারতম্য তাও বোঝা যাচ্ছে। হাজরার কাছে এই সিকিটা সামান্য ও তুচ্ছ, তাই সে প্রায় ভিক্ষে দেওয়ার মত কারুণ্যে উপুড় করেছে হাত। 'পকেট থেকে একটা গোটা টাকাই বার করে সে মেয়েটার হাতে গুঁজে দিলে।' (ঐ) এবং কথক আপত্তি করলে তাতে আরো চটে উঠে একটা পাঁচ টাকার নোটই এবার মেয়েটাকে সে জোর করে নিইয়ে ছাড়লে।' (ঐ) মেয়েটা বিস্মিত, কথক বেদনার্ত এবং অনুভব করেন যেন দুলাল হাজরা তাকে ঘৃণা ভরে বিদ্রূপ করছে। নিজের দৈন্যও কথক অনুভব করেন, সিকিটা যদি তিনি মেয়েটাকে নিজে থেকে দিতে পারতেন তাহলে নিজের আত্মতৃপ্তির অবকাশ থাকত; কিন্তু আর্থিক দৈন্য থাকায় তা সম্ভব হয়নি। অথচ দুলাল হাজরা মেয়েটিকে দান করেছে পাঁচ টাকা। তাই দুলাল হাজরার 'বাদশাহী বদান্যতা' (পৃ. ৪৯, ঐ)। কথককে হতবাক শুধু নয় বেদনার্তও করে তুলেছে। এই ঘটনার পর কয়েকমাস অতিবাহিত হয়েছে— সেদিন বড় রাস্তা ধরে বাড়ি ফিরছেন কথক, এসময় লক্ষ্য করেছেন ভিড়। কৌতূহলী হয়ে একটু উঁকি দিতে (ঐ) দেখেছেন—'সেই অনাথ মেয়েটিকে ঘিরেই ভিড়। সেই চেহারা সেই পোশাক। শুধু আজ মেয়েটার চোখের জল ঝরার আর বিরাম নেই।' (পৃ. ৪৯, ঐ)।

লক্ষ্য করার বিষয়, মেয়েটিকে এর আগে কথক কাঁদতে দেখেননি। এবং সিকিটা হারানোর দিনে মেয়েটির মুখে ছিল 'করুণ হতাশা'। অথচ সেদিন তার কান্নার কারণ মেয়েটি একটা টাকা নাকি হারিয়ে ফেলেছে। 'হাত থেকে পড়ে টাকাটা রাস্তার ড্রেনের ঝাঝরি দিয়ে গলে পড়েছে বোধহয়। (ঐ) এরপরেই জনৈক পথচারীর বক্তব্যে ধরা পড়েছে মূল সত্যটি—'আমি সেদিন এই মেয়েটিকেই আর এক রাস্তায় পয়সা হারিয়েছে বলে এমনি মায়া কান্না কাঁদতে দেখেছি। কিচ্ছু ওর হারায় নি।' (ঐ)।

এভাবেই শৈশব পণ্য হয়েছে, মেয়েটির পবিত্রতা গেছে বিকিয়ে। সে অভিনয়ে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। কথকের শেষ উক্তি তাই খুবই গ্রহণযোগ্য ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে—'ওরা যাই বলুক আমি জানি, মেয়েটা আজ সত্যি সব হারিয়েছে। সে নিজেই হারিয়ে গেছে আমাদের এই দয়ার দুনিয়ায়।' (পৃ. ৪৯, ঐ)। শৈশবেই মেয়েটি ভ্রষ্ট হয়েছে মিথ্যাচারে, অভ্যস্ত হয়েছে ভিক্ষায়। এভাবেই হারিয়ে গেছে শৈশব। নিষ্পাপ পবিত্রতা কলুষতায় পুড়িয়ে বিষিয়ে গেছে। নতুন প্রজন্মকে যেন তার পরিবেশ ক্রমশ এগিয়ে দিচ্ছে অসততার দিকে। বর্তমান তো বটেই অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে এইভাবে এগিয়ে যাওয়া নিছক আত্মপীড়ন ছাড়া যে কিছু নয় এবং তা বুঝিয়ে দেওয়ার লোকও নেই। দুলাল হাজরার বদান্যতাই মেয়েটিকে লোভী করেছে, তাই সে তার কান্নাকে শৈশবকে পণ্য করেছে। গল্প বিষয়টি এভাবেই চমৎকৃত করে পাঠককে।

১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে 'ক্বচিৎ কখনো' গল্পগ্রন্থের সমনামের গল্প 'ক্বচিৎ কখনো'। এ গল্পটির পটভূমিতে আছে একটি ছোট মফস্বল ষ্টেশন এবং অর্ধ উন্মাদ গোপীনাথবাবু। এ গল্পটিও একজন কথকের অভিজ্ঞতামাত্র। আর অভিজ্ঞতাতেই ধরা পড়েছে জীবনের গভীরতম ট্র্যাজেডি। ঘটনাটির সূত্রপাত গোপীনাথবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ মুহূর্ত থেকে—

'লোকটা ঘুমোচ্ছে না। আমি কাছে এসে দাঁড়াতে বিরক্তির সঙ্গে আমার দিকে একবার চেয়ে ঘাড়টা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিলে। আমায় জায়গা দেবার তার কোনো বাসনাই নেই বুঝলাম।' (পৃ. ৯১, ক্বচিৎ কখনো, প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প, ৩য় খণ্ড)। আর পটভূমিতে আছে একটি ষ্টেশন—'নেহাত নগণ্য ষ্টেশন। একটিমাত্র নিচু প্ল্যাটফর্ম। টিনের চালের একটিমাত্র ঘর ইত্যাদি। অথচ বসবার জায়গায় 'নোংরা পাজামা ও শার্ট পরা এক মুখ দাঁড়িগোঁফওয়ালা একটি আধাপাগল গোছের লোক তাতে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে।' (ঐ)। তাই কথক চলে যাওয়ার উপক্রম করতেই ষ্টেশন মাস্টারমশাই তার ঘুপচি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ধমক দেন লোকটিকে; কিন্তু, 'ষ্টেশন মাস্টারের ধমকে গুপী নামক লোকটির কোন ভ্রুক্ষেপও দেখা গেল না।' (ঐ) লোকটি তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞা ভরে বসে রইল। অর্থাৎ লোকটির সব বোধ একেবারে লুপ্ত হয়নি বোঝা যাচ্ছে। তখন ষ্টেশন মাস্টার যেভাবে তার প্রতিপত্তি দেখাতে চেয়েছেন তাতে অমানবিকতার স্বরূপই উঠে এসেছে—'বলি ভালোয় ভালোয় উঠবে কিনা? ঘাড়

ধরেই ওঠাতে হবে তাহলে কেমন? ডাকি তাহলে ভৈরবকে?' (ঐ)।

অথচ ভৈরব এসে তাকে অপমান করেনি। ভৈরবের চেহারা ও অবস্থান সত্ত্বেও সে মানবিকতার পরিচয় দিয়েছে। দৈত্যাকার ভৈরব অত্যাশিতভাবে বেশ সশ্রদ্ধ ভাবে বললে, 'কি গোপীনাথবাবু আজ যে প্ল্যাটফর্ম টিকিট কেনেন নি?' (পৃ. ৯২, ঐ) এবং ভৈরবের শ্রদ্ধায় তুষার গলল — গোপীনাথবাবু বেঞ্চ থেকে পা নামিয়ে বসলেন এবং ছেঁড়া শার্টের পকেট থেকে টিকিট বের করলেন। এরপরে ভৈরবের অনুরোধে সরে গিয়ে বেঞ্চির একপাশে জায়গা করে দিয়ে গম্ভীর ভারী গলায় গোপীনাথবাবু প্রশ্ন করেছেন—'আপনি কোলকাতায় থাকেন?'(ঐ) এবং তারপরেই প্রশ্ন করেছেন 'দেবীপদকে চেনেন, দেবীপদ গুহ।' (ঐ) কথকের মনে হয়েছে গোপীনাথ বাবুর গলা ক্লান্ত ও করুণ। তখনই জানা গেছে গোপীনাথবাবুর ট্র্যাজেডি। এই ট্র্যাজেডিকে বলা যেতে পারে এই শতাব্দীরই বিশ্বাসহীনতার কাহিনি। এই ট্র্যাজেডি যেন মানুষের অনুভূতিকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। গল্পটি গোপীনাথবাবুকে কেন্দ্র করেই। এ গল্পটি বলেছে ভৈরব। মর্মার্থ এই—গোপীনাথবাবু ছিলেন এ অঞ্চলের মাইনর স্কুলের মাস্টার। ভৈরবের কথামত 'এসব চাষ-আবাদ, মাছের ভেড়ির দেশ বাবু, এখানে পড়াশুনোর কেউ ধারত না। উনিই উদ্যোগী হয়ে নিজে ওই ইস্কুল করেছিলেন। (পৃ. ৯৪, ঐ)। বন্ধুর সাথে সৎ উদ্যোগে এই গোপীনাথবাবুই নিজে হাতে তৈরি করেছিলেন দেশী-কোম্পানী। স্কুলও চলে নি। ব্যবসাও উঠে গেল। অথচ ভিটেটুকু রেখে জমিজমা যা ছিল তা বিক্রি করে বন্ধুকে' (ঐ) বাঁচিয়ে কোম্পানী করেছিলেন তিনি। বন্ধুটি কোলকাতায় থাকত এবং প্রতি শনি-রবিবারে আসত। তারপর 'একদিন তলে তলে সব বেচেটেচে একেবারে হাওয়া হয়ে গেল।' (ঐ)। আর গোপীনাথবাবুর স্ত্রীকেও পরের দিন থেকে আর পাওয়া যায়নি। তীক্ষ্ম হয়ে উঠেছে বেদনাদায়ক এই কাহিনি। যখন গোপীনাথবাবু সোৎসাহে বলেছেন—'ওটা আমাদেরই কোম্পানি আমার আর দেবীর এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট বুঝেছেন? বছর বছর উন্নতি করে এখন একেবারে দেশের সেরা কারবার হয়েছে।' (পৃ. ৯২, ঐ) তিনি আরো জানিয়েছেন—'দেবী এই গাড়িতেই আসছে। ষ্টেশনে আমায় না দেখলে ভয়ানক রাগ করবে'। (পৃ. ৯৩, ঐ) তাঁর স্বপ্ন-ইতিহাস জানে বলেই ভৈরব তাকে সম্মান করে। আর ষ্টেশন মাস্টার নতুনের প্রতিনিধি বলে তাকে অসম্মানিত, তাচ্ছিল্য করে—'বেটা উঠেছে তাহলে! জ্বালাতন করে মারছে রোজ!' (পৃ. ৯৩, ঐ) । এ জাতীয় বাক্য

ব্যবহার শুধু যে গোপীনাথবাবুর মত ব্যক্তিকে অপমান তা নয়, এ যেন মানবিকতারও অসম্মান। অথচ ভৈরব বলেছে—'মাস্টারবাবু মিছিমিছি মেজাজ দেখিয়ে দূরদূর করেন বলে ওইরকম বেয়াড়া হন মাঝে মাঝে। আর উনি তো ফাঁকি দিয়ে ষ্টেশনে ঢোকেন না। দস্তুরমত প্ল্যাটফর্ম টিকিট কিনে তবে আসেন।' (ঐ) কথক জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'একেবারে পাগল না?' (ঐ)। ভৈরবের উক্তি যেন এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে। গোপীনাথবাবু টিকিট কেটে প্ল্যাটফর্মে আসেন—তাই আদর্শভ্রষ্ট হননি গোপীনাথবাবু। সমাজ তাকে প্রতারিত প্রবঞ্চিত করেছে। কথকের সঙ্গে পাঠকের বিস্ময় জাগে 'সত্যি সত্যি প্ল্যাটফর্ম টিকিট কেনেন রোজ।' (ঐ) আর ভৈরব বলেছে 'এ ষ্টেশনে প্ল্যাটফর্ম টিকিট কে কিনছে, আর না কিনলে ধরছে বাবু। (ঐ) এখানে গোপীনাথবাবুর সততা ও আত্মসম্মানবোধ ধরা পড়েছে আর গোপীনাথবাবু কিন্তু প্রতারিত হয়েও বিশ্বাস হারাননি। তাই তিনি ষ্টেশনে অপেক্ষারত থাকেন। ভৈরব বলেছে—'কতজন বলেছে পুলিশে খবর দিয়ে হুলিয়া বার করতে। কিন্তু গোপীনাথবাবু তাতে শুধু হেসেছেন। (পৃ. ৯৪, ঐ)। 'আর নিজের ভিটে? সেখানেও বাড়িব সদরের দুটো ভাঙাঘর মেরামত করে হীরুমুদি দোকান খুলে একটা ঘানি বসিয়েছে। সে যা হাতে তুলে দেয় তাতেই কোনরকমে চলে যায়'। (পৃ. ৯৪, ঐ)। ভৈরব আক্ষেপ করেছে— 'পুরনো কালের লোকজন যারা জানে তাদের দেখে দুঃখ হয়, মায়া হয়, হালের যারা জানে না, তারা হাসি-ঠাট্টা করে খেপায় আমাদের মাস্টারবাবুর মত চোখ রাঙিয়ে হেনস্তা করে।' (ঐ) এইভাবে দুই প্রজন্মের মানসিকতার প্রভেদ ধরা যায়। এই প্রত্যয়, বিশ্বাস যেন গোপীনাথবাবুর মত অতীতচারীদের সম্বল। আর বর্তমান কালের সূর্য অস্ত যাবার পথে পশ্চিমে হেলেছে। এবং 'সমস্ত আকাশে থাকে আগুনের আভা আর সেই অগ্নিবর্ণ আকাশের পশ্চাদপটে মনে হল গোপীনাথবাবু নয়, যেন এ যুগের মানুষেরই লাঞ্ছিত বিপন্ন আত্মমর্যাদাবোধ আর বিশ্বাস, করুণ উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে উদয় দিগন্তের দিকে চেয়ে আছে'। (পৃ. ৯৪, ঐ)। দিগন্তে নতুন সূর্যোদয় হলেও তা যুগান্তে কোন বিশ্বাস প্রত্যয় নিয়ে আসতে পারছে না। তাই, এই যুগ করুণ, বিভ্রান্ত। গোপীনাথবাবুর এই অপেক্ষা তাই প্রতীকী। এই শতাব্দী যতই বিভ্রান্তিকর হোক, যতই হোক মূল্যবোধহীন, তবু বিশ্বাস চির অস্তে যেতে পারে না। তাই কথকের বর্ণনায় সেই অগ্নিবর্ণ আকাশের পটে উদয় দিগন্তের দিকে চেয়ে থাকা গোপীনাথবাবু প্রতীকী হয়ে ওঠেন। কথক গল্প সূচনায় বলেছিলেন—

গল্প বলতে বসিনি। আর ক্বচিৎ কখনো কিছুক্ষণের দেখায় মনে যারা দাগ রেখে গেছে তাদেরই একজনের কথা বলবার চেষ্টা করেছি। (পৃ. ৯১, ঐ) অর্থাৎ গোপীনাথবাবুরা গল্প নয়, বাস্তব। তাদের মনের বেদনা এভাবেই অপরের মনেও বেদনা সঞ্চার করে। তাই মূল্যবোধহীনতা, সামাজিক, মানবিক অবনমন সত্ত্বেও জেগে ওঠে গোপীনাথবাবুর আত্মপ্রত্যয় ও বিশ্বাস।

রোমান্টিক গল্প—

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও বিশ্বযুদ্ধ উত্তর পর্বে প্রেমেন্দ্র মিত্রের রোমান্টিক গল্পগুলি অপেক্ষাকৃত জটিল। বলা উচিত মানবমনের সূক্ষ্ম জটিল অনুভূতিগুলি বিশেষত ভালবাসার অনুভূতিগুলিকেই এধরনের গল্পে প্রেমেন্দ্র অবলম্বন করেছেন। তবে মানবমনের জটিল ধারায় এই অনুভূতিগুলির রূপায়ন সবসময় সরলরৈখিক হয়নি। বিশেষত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উত্তর পর্বের এই ধারায় যুদ্ধ বিধ্বস্ত মানুষের প্রেমজীবনে যেমন এসেছে অল্পস্থায়ী আকৃতি, এসেছে যৌন আর্তি, তেমনি এসেছে প্রণয়াকাঙ্ক্ষীকে হারিয়ে বিষাদ আকুলতা। প্রথম পর্বে অর্থাৎ প্রাক্ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সময়কালে এই আকুলতায় স্বপ্নময় রোমান্টিকতা ছিল অনেক বেশি, কিন্তু উত্তর পর্বে বিধ্বস্ত সময়ের চূড়ান্ত আর্তি ও আত্মপীড়িত জীবনযাত্রা প্রতিফলিত হয়েছে অনেক বেশি। দুটি পর্বের গল্পগুলি বিশ্লেষণ ও তুলনা করলে তা বোঝা যায়।

'ক্বচিৎ কখনো' (১৯৬২ খ্রিঃ) গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'অলভ্যা' গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে অপ্রাপনীয়ার প্রতি দুর্নিবার প্রেম। অথচ প্রেমিকা এখানে অধরা। এ কাহিনির মূল চরিত্র অভিরাম বলেছে—'কি করে তাকে প্রথম চিনেছিলাম তা আপনাদের বলব না, বলবার দরকার নেই। এইটুকু শুধু জেনে রাখুন যে, অলভ্যা জেনেই তাকে ভালোবেসেছিলাম। আমার সংসারের সংকীর্ণ সীমায় তাকে বন্দিনী করবার কথা কোনদিন কল্পনা করিনি। একে অপরিণত মনের ভাবালুতা বলতে পারেন। আপত্তি করব না।' (পৃ. ৭৩, অলভ্যা, প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প, ৩য় খণ্ড)। গল্পের পটভূমিতে আছে নতুন হাওড়ার পোল তৈরি হওয়ার কথা এবং গল্পকথক স্পষ্টই বলেছেন গত মহাযুদ্ধের আগের সময়েই এই গল্পটির মূল প্রেক্ষাপট এবং তিনি আরও বলেছেন 'সমস্ত যুদ্ধের বছরগুলো দুই তীরের দুই প্রসারিত বাহু এমনি বিচ্ছিন্ন হয়েই ছিল। মিলন আর তাদের হয়নি।' (ঐ)। এই দূরত্ব যেমন প্রকৃতিগত তেমনি মানসিকভাবেও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এখানে দুটি বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। প্রথমত, গল্পটির সময়কাল— কারণ,

গল্পটির সময় লেখা হয়েছে প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে এবং ধরে নেওয়া যেতে পারে গল্পটি বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালেই লেখা। বিশ্বযুদ্ধ সময়েই এই গল্পের পটভূমি। অস্থিরতা তাই এই গল্পে মুদ্রিত। দ্বিতীয়ত এর বিষয় 'দুদিক থেকে দুটো বিরাট বলিষ্ঠ লৌহবাহু নদীর ওপর দিয়ে প্রসারিত। কিন্তু তারা মিলতে পারছে না। মাঝখানে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান।' (ঐ)। এই ব্যবধান, দূরত্ব গল্পের বিষয়কে প্রভাবিত করেছে। অপ্রাপ্তিজনিত বেদনা এই বিষয়টি গল্পের মূল কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। আর আকাশ, নদী ও সেতু মিলে দুর্বোধ্য স্বপ্নময় প্রতিকায়িত করে তুলেছে তাকে কথক বলেছেন যেখানে 'মিলন আর তাদের হয়নি'। (ঐ) সেখানে বিচ্ছেদ শুধু প্রতীকী নয়, সর্বব্যাপ্ত হয়ে উঠেছে।

বিষয় ও সময়কাল একে অপরের পরিপূরক হয়ে উঠেছে। এ গল্পটিও কথকের একটি অভিজ্ঞতা। অভিরাম নামে একটি চরিত্রের ব্যর্থ প্রণয়কাহিনি বর্ণিত হয়েছে এখানে। কথক এবং তার বন্ধু মলয় এসেছিলেন কোন একদিন অসময়ে এই পথে বেড়াতে। 'তখন প্রায় মধ্যরাত্রি। পোল খোলা হয়েছে আধঘণ্টাটাক আগে। খেয়া নৌকায় ছাড়া পার হবার উপায় নেই। (পৃ. ৭০, ঐ) আর 'আকাশের কোণে পুঞ্জিত মেঘের আভাসে।' (ঐ) অন্ধকারে হাওয়ার ঝাপটায় সেই ভীষণতার হুমকি।' (ঐ) এই ভয়ংকর পরিবেশে দুই তীরের ওই দুই ব্যাকুল প্রসারিত লৌহবাহুর প্রতি অন্য একটা আকর্ষণ অনুভব করেছেন কথক ব্যাকুলতা, যা দুর্বোধ্য রহস্যময় অথচ আকর্ষণীয়। তখনই তারা 'সাবধানে সেতুর সেই লৌহ কঙ্কালের ওপর দিয়ে একটু একটু করে এদিকের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত এগিয়ে গেছি।' (পৃ. ৭১, ঐ)। এবং হঠাৎ দেখেছেন 'কুয়াশার তরল অন্ধকারে একটা আবছা মূর্তি সেতুর একেবারে শেষ কিনারায় মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে।' (ঐ) প্রাথমিকভাবে আধিভৌতিক মনে হলেও, ক্রমে তাদের মনে প্রশ্ন জেগেছে—লোকটি কি আত্মহত্যা করতে এখানে এসেছে।' (ঐ) এবং তৈরি হয়েছে যুক্তিও—'আত্মহত্যা যদি উদ্দেশ্য না হয়, তাহলে লোকটি উন্মাদ নাকি? (পৃ. ৭১, ঐ)। সেই মুহূর্তে লোকটি এগিয়ে এসে বলেছে—'না, আপনারা যা ভাবছেন তা নয়। (পৃ. ৭২) লোকটির পোশাক দেখে বোঝা গেছে তিনি উচ্চবংশজাত অভিজাত এবং চেহারায় আসন্ন প্রৌঢ়ত্বের কোনো ছাপ অন্তত আবছা আলোয় ধরা পড়ে না। অর্থাৎ অর্থ, চেহারা সবই তার আছে। এছাড়াও লক্ষ্য করার মত ভদ্রলোকের 'সহজ স্বাভাবিক কর্তৃত্বের ভঙ্গি।' (ঐ), যা দেখে কথক ও তার বন্ধুর মনে হয়েছে তিনি অর্থবান। কারণ, এই ভঙ্গি

আর্থিক সাফল্যের দ্বারাই লাভ করা সম্ভব। এরপরেই ভদ্রলোক তার কাহিনি বলেছেন এবং নিজের নাম বলেছেন অভিরাম। কিন্তু কথকদের মনে খটকা ছিল। তবে 'এ অসাধারণ নামটা সেদিন সেই আসরে অস্বাভাবিক লাগে নি। যেমন লাগেনি তার দীর্ঘ আত্মকাহিনী।' (পৃ. ৭২, ঐ)।

কাহিনিটি অভিনব নয়, বরং একে বলা যেতে পারে প্রচলিত ছকে বাঁধা 'মামুলি ইতিহাস।' (ঐ) তবে 'আবেশের তীব্রতায়' ও 'বলার বিশিষ্টভঙ্গিতে' (ঐ) তা সকলেরই কাছেই গ্রহণযোগ্য হয়েছে। রহস্যময় প্রকৃতি, ভয়পূর্ণ পরিবেশ অভিরামের গল্পটিকে সমর্থন করেছে। অবিশ্বাস্য পরিবেশে গল্পটি অসাধারারণ হয়েছে। অভিরাম বলেছেন—'এমন এক ব্যর্থতা আছে যা সব সুলভ সার্থকতার উর্দ্ধে। সে ব্যর্থতায় হৃদয়ের বিলাপ নেই, আছে বেদনার এমন এক নির্যাস, যা যে কোনো আনন্দের চেয়ে গভীর নিবিড়ভাবে সমস্ত দেহ-মন চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রাখে।' (ঐ) এই দার্শনিক উক্তির পর সমস্ত গল্পটি বিষাদময় হয়ে উঠেছে এবং গল্পটির নামকরণেও সেই ইঙ্গিত রেখেছেন লেখক। এই অপ্রাপ্তির সীমায় দাঁড়িয়ে নতুনভাবে জীবনকে উপলব্ধি করা যায়। যেমন করেছে অভিরাম—'মনে করুন তাকে প্রতিদিন দেখবার সুযোগ আমার ছিল, সুযোগ ছিল ঘনিষ্ঠ হবার। নিজের হৃদয়ের কথা তাকে নিবেদন করবার।' (পৃ. ৭৩, ঐ) এরপর এভাবেই আকর্ষণ ও দূরত্ব প্রতিস্পর্ধ হয়ে উঠেছে। ঘটনাচক্রে তাদের যখন দেখা হল তখনও অস্থির হয়ে উঠল অভিরাম—'আজই আবার তার দেখা আমি পেয়েছি। তার কাছ থেকেই এসে ভাবুন রাত্রের শহর টহল দিয়ে বেড়িয়েছি অস্থিরভাবে তারপর গভীর রাত্রে এই অসমাপ্ত সেতুর ওপর এসে দাঁড়িয়েছি কিসের দুর্বার আকর্ষণে তা নিজেই জানি না।' (পৃ. ৭৩, ঐ)।

জীবনের বেদনা এবং আকর্ষণ রহস্যময় সেতুর উপরে উঠে আসা, বিচরণ সব মিলিয়ে অভিরাম নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে যেন। সেদিনই সে জেনেছে তার প্রার্থিত রমণি তারই কোন এক কর্মচারীর স্ত্রী। এবং স্ত্রীর অনুরোধেই কর্মচারীটি তাকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছে। সেখানে পূর্ব প্রনীয়িণীকে দেখেছে অভিরাম এবং দেখেও প্রথমে চিনতে পারেননি কারণ, 'হৃদয়ের ছবি বাইরের চেহারার আদল খোঁজে না। এ পরিবর্তন আর কিছুর।' (পৃ. ৭৪, ঐ) দারিদ্র্য ও দারিদ্র্যের সংগ্রামে চেহারার পরিবর্তন হয়েছে মেয়েটির, কিন্তু, বারবার আলাপের মধ্যে দিয়ে সে 'অতীতের স্মৃতি' উসকে দেবার চেষ্টা করেছে। অভিরামের একে মনে হয়েছে নিজের 'অপ্রত্যাশিত সাফল্য'। (ঐ) আর, মেয়েটি অভিরামের হাত তুলে নিজের

হাতে নিয়ে বলেছে 'তুমি হয়তো ভুলে গেছ, কিন্তু আমি শুধু তোমারই আছি।' (ঐ)। এই দুর্লভ মুহূর্তে কিছু করার নেই জেনে অভিভূত অভিরাম বেরিয়ে এসেছে। হেঁটে গাড়ি ছেড়ে দিয়ে চলেছে অনেক রাস্তা। তার মনে হয়েছে 'এই রাতের কলকাতা যেন অজানা এক শহর'। (ঐ) তারপর সে এসেছে অনাবিকৃত জীবন খুঁজতে এই সেতুতে। এরপরেই ট্যাক্সিতে যেতে যেতে কথকের বন্ধু মলয়ের প্রশ্ন ছিল—'ভদ্রলোক কি নেশাটেশা করেছিলেন মনে হয়।' (ঐ) এবং সে আত্মহত্যা করতে পারে আবেগের বশে এ সন্দেহ তাদের ছিল। কিন্তু পরের দিনের কাগজে তেমন কোন খবর ছিল না। আর কথক বলেছিলেন—'নেশাই করুন আর প্রকৃতিস্থই হন, ওই বেজোড় সেতুর গল্পে গল্পটা মিলিয়েছেন বোধহয় ভালোই।' (পৃ. ৭৪, ঐ) কিন্তু গল্প হলেও উত্তেজনা ও আবেশের মুহূর্তগুলি অভিরামের ক্ষেত্রে অন্তত একেবারে অবিশ্বাস্য মনে হয় না। অসমাপ্ত সেতু ও জীবনের ট্র্যাজেডি বস্তুত, এভাবেই মিলে গেছে। চিরবিরহই যেন গল্পটিতে একমাত্র সত্যি হয়ে আছে, এখানেই গল্পটির অন্যতম তাৎপর্য, এবং রোমান্টিক গল্প হিসেবে এখানেই তার সার্থকতা।

'মৃদুলা' গল্পটিও ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'ক্বচিৎ কখনো' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত। 'মৃদুলা' গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে এক রহস্যময়ী নারী চরিত্র। চরিত্র নামেই গল্প নাম নির্মিত হয়েছে। গল্পের কথকই এখানে গল্পটির অন্যতম চরিত্র— চিত্রকর ললিত মুস্তাফি। মুস্তাফির অভিজ্ঞতাই এখানে বিবৃত। ঘটনাটির সূচনা মুস্তাফির গভীর বেদনার অনুসন্ধান করে—

'কামরাটা মনে হল এক মুহূর্তে সমস্ত ট্রেনটা থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে মানুষের পাতা লাইন ছেড়ে বেরিয়ে সমস্ত সময়ের স্রোতেরও বাইরে চলে গেছে। নীহারিকা লোকের তারা মথিত শূন্যতাই বুঝি বয়ে যাচ্ছে সমস্ত দেহ-মন চেতনার ভেতর দিয়ে।' (পৃ. ৪২, মৃদুলা, প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প, ৩য় খণ্ড)। কখন ঘটেছে এই বেদনা? একে প্রথম ও শেষে খণ্ড করে বিবৃত করা হয়েছে। সূচনায় আছে — 'ওপাশের বার্থে যে দুজন বসেছিলেন তাঁরা সেই আগের ষ্টেশনে নেমে যাবার পর অন্যকিছুর খেয়াল তার ছিল না।' (ঐ) এবং শেষে আছে দেশেবিদেশে জালপাতা একটা বিরাট দল লুকিয়ে চোরাচালান করত এবং তাদের ফন্দি-ফিকির ও ভোল পাল্টানোর ধরন প্রভৃতি। শেষে তাদের ধরা পড়ার কথাও জানা যাচ্ছে। আর কথকের দুই সহযাত্রী পুলিশের চাকুরে একটি সূত্র দিয়ে গেছে, যা থেকে মূল গল্পটির

সূত্রপাত—'রহস্যের অনেক সূত্র যার কাছে পাওয়া যেতে পারত সেই একটি বহুরূপী অত্যন্ত ধূর্ত অসামান্য মেয়ে তো একেবারে নিরুদ্দেশ।' (পৃ. ৪৬, ঐ)। আর 'এও উল্লেখ করা হয়েছে এই আলাপচারিতার সূত্রে যে, পশ্চিমঘাটের এক অতল খাদের তলায় একটি মেয়ের মৃতদেহ পাওয়া গেছে ; প্রশ্ন হল দুটি মেয়ে একই কিনা। এই ঘটনার সূত্রেই এসেছে মুস্তাফির কল্পনা ও প্রেম। একটি রেলস্টেশন যার নাম 'ভিলে পার্লে', একদিন সেখানে নাটকীয়ভাবে একটি মেয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে মুস্তাফির—'আর আজ ওভার ব্রীজে উঠবার সিঁড়িতেই টিকিট চেকার দাঁড়িয়ে। তার সামনে একটি মেয়ে টিকিট খুঁজতে গিয়ে হাতের ব্যাগটা ওলটপালট করে হারান। পেছনের সারবন্দি অন্য যাত্রীদেরও আটকে রেখেছে।' (পৃ. ৪২, ঐ)। মুস্তাফি রূঢ়ভাবে মেয়েটিকে বিদ্রূপ করে বলেছিল পাশে সরে দাঁড়াতে। কিন্তু মেয়েটি সে বিদ্রূপ গায়ে মাখে নি। এরপর বাইরে দাঁড়িয়ে ব্যস্ত মুস্তাফি দেখেছিল—'যা ভয় করেছিল তাই। প্রথম বাস ছেড়ে যাচ্ছে।' (পৃ. ৪৩, ঐ)। ব্যস্ত চিত্রকর মুস্তাফি বিরক্ত হয়েছিল কারণ সে জানে 'বোম্বাই শহর অন্য ধাতুতে গড়া। এখানে শিল্পীররাশ চাঁদির শিকলে টানা।' (পৃ. ৪৩, ঐ) তখনই মেয়েটি তার সঙ্গে পরিচয় করে জানিয়েছিল তার একিজবিশনে যাওয়ার কথা। বলেছিল ছবি দেখে মুগ্ধতার কথা এবং সবশেষে অনুমতি চেয়েছিল—'একদিন আপনার স্টুডিওতে যেতে পারি?' (পৃ. ৪৩, ঐ) আর মুস্তাফির মনে হয়েছিল—'সুন্দরের সাধনা যে কখনো হেলাভরেও করেছে, এ মেয়ে তার কাছে মূর্ত এক স্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়।' (ঐ) মেয়েটির গলার স্বরের স্নিগ্ধতা ও দৈহিক সৌন্দর্য তাকে অসামান্যা করে তুলেছে।

মুস্তাফির চোখে পড়েছিল যে মেয়েটির গুর্জর দেশের ধরনে শাড়ি পড়া। কিন্তু তারপরেও তার শিল্পদৃষ্টিতে ধরা পড়ে —মেয়েটি সর্বকালের অথচ সব দেশকালের বাইরে—'কোনো আশ্চর্য কবির একটি অজানা গানের কলি যেন শরীরিণী হয়ে ক্ষণিকের জন্যে দেখা দিয়েছে।' (ঐ) কিন্তু, মেয়েটির কথাবার্তা, হাবভাব, দামি গাড়িতে চড়ে বসা সব মিলিয়ে সে সৌন্দর্যের মুগ্ধ বাতুলতায় ভেসে যেতে চেয়েছে আর, মুস্তাফি অভিভূত হয়ে গেছে। সে ভেবেছে নিজের কাজ তার বড় কথা। ক্যালেন্ডারের শাঁসালো বায়না ফসকে যাবে, কিন্তু কিছুতেই কিছু আসে যায় না।' (ঐ) এই ভাবনা তার পক্ষে অস্বাভাবিক, অথচ সে ভাবাবেগে ভেসে যাওয়ার লোক নয়—ছবি আঁকাই তার কাজ হলেও ভাবালু স্বপ্নের জগতে

সে বিচরণ করে না। আঁকার পাকা হাতের সঙ্গে পাকা সাংসারিক বুদ্ধির জোরেই সে খ্যাতির নগদ মূল্যও সংসার থেকে আদায় করতে পেরেছে এই বয়সেই।' (পৃ. ৪৪, ঐ)।

কিন্তু এই সাথেই সে অনুভব করেছিল মেয়েটির 'কোনো অদৃশ্য দুর্জ্ঞেয় প্রভাব' (ঐ); অথচ এই প্রভাব সে অস্বীকার করতেও পারে নি, আর তাই 'সদ্য সাবালক হওয়া ছেলের মত প্রথম কবিতা পড়া স্বপ্নালুতাই যেন তাকে নিজের অজ্ঞাতে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।' (পৃ. ৪৪, ঐ)। এই স্বপ্নময়তাই তাকে আবিষ্ট করেছে আর মেয়েটিও রহস্যময় ও অদ্ভুত; সর্বোপরি সে জেনেছে মেয়েটি সুস্থ ও স্বাভাবিক নয়, আর সে ছবিও আঁকে। তাই, মুস্তাফিও বেশি করে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ক্রমিক এই আকর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আকর্ষণের স্বরূপ না বুঝেই যেন মুস্তাফি তাতে নিমগ্ন হয়েছে। মেয়েটির আঁকা ছবি দেখে মুস্তাফি বিস্মিতও হয়েছে। কারণ—'যে কটি ছবি এনেছিল তার প্রত্যেকটির বিষয় মৃত্যু। দুঃখের, ভয়ের, মৃত্যু নয়, তার স্বপ্নাবিষ্টের রহস্য। —মৃত্যুই যেন সেই পরম রহস্যময় প্রেমিক।' (ঐ) ক্রমে মৃদুলা নামে মেয়েটির কথাতেও একটা 'অলৌকিক জগতের অবাস্তব সুর' (ঐ) শোনা গেছে। সে কম কথা বলে, অথচ তার উচ্চারিত শব্দগুলি হৃদয়ের গভীরে এসে প্রবেশ করে। এখানেই সে রহস্য ছাড়িয়ে মাধুর্যময়ী হয়ে উঠেছে। অন্য কারো মুখে সেকথা অপ্রকৃতিস্থ শোনাত, মৃদুলার মুখেই তা মানিয়েছে। আর তার হাসি, হাসি না দীর্ঘশ্বাস বোঝা যায় নি, তার উক্তি অকৃত্রিম, অথচ অদ্ভুত, তা স্বাভাবিক নয়। যেমন —'মনে হয় এই যা কিছু দেখছি মুগ্ধ হয়ে এ যেন আঙুল দিয়ে ঘষলেই মুছে যায়।' (ঐ) এই উক্তিতে সে অসামান্য ও শিল্পীজনোচিত। আর এরপরই একদিন তারা বেড়াতে গেছে পশ্চিমঘাট পাহাড়ে। সেখানে দুর্গম পাহাড়ের বাঁকেও একই কথা বলেছে সে। সেদিন 'সামনে অতল অন্ধকার খাড়াই চারদিকে কুয়াশার স্বপ্নময় বিস্তার দূরে সমতলের রেল লাইনেরই কটা অস্পষ্ট আলোর বিন্দু যেন আকাশের নক্ষত্রলোক থেকেই ছিটোনো। তারা দুজনে যেন অন্ধকার শূন্যতার মাঝখানেই দুলছে।' (ঐ) এই বর্ণনা যেন চিত্রশিল্পীর রোমান্টিক বিষাদময় ছবির তুল্য হয়ে উঠেছে। এই কুয়াশার রাত্রে মৃদুলার অনুরোধ বলা যেতে পারে প্রথম ও শেষ অনুরোধের কারণে মুস্তাফি ও মৃদুলা যাত্রা করেছে পুণার পথে। ইতিমধ্যে অন্ধকার অতলতায় তার একটা চড়াইয়ের বাঁকে এসে দাঁড়িয়েছে। মুস্তাফি ভয় পেয়েছে, আর কুয়াশার সঙ্গে মিশে গেছে মৃদুলার হাসি। আর শিল্পীর মতই ট্র্যাজিক হয়ে

উঠেছে মৃদুলার অসামান্য উক্তি—'শুধু কুয়াশার পরদা আমার চারিধারে ঘিরে আসবে, কুয়াশার কোমল ঢেউ আমায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবে ওই যেখানে মৌমাছির মতো নক্ষত্রের ঝাঁক গুঞ্জন করছে সেই আশ্চর্য আকাশে।' (পৃ. ৪৫, ঐ)। আর এরপরেই মুস্তাফিকে কোট আনতে বলে অন্তর্হিত হয়েছে সে — 'সত্যিই কুয়াশার ঢেউয়ে যেন ভেসে চলে গেছে।' (ঐ) আর তার আগে স্বপ্নতনু রহস্যময় দুর্জ্ঞেয় মেয়েটিকে স্পর্শ করেছে মুস্তাফি — 'সচেতনভাবে এই প্রথম। এর আগে কোনোদিন তাকে স্পর্শও করেনি।' (পৃ. ৪৫, ঐ)। আর দেখেছিল মৃদুলা কাঁপছে। কারণ জানতে চাইলে — 'অস্ফুট মর্মরের মত মৃদুলা বলেছিল 'ঠাণ্ডায় বোধহয়।' (ঐ) মৃদুলার কোট আনতে গিয়ে ফিরে এসে তাকে দেখতে না পেয়ে বিভ্রান্ত মুস্তাফি উন্মাদের মত তাকে খুঁজতে থাকে। এরপর উদ্‌ভ্রান্তভাবে খান্ডালা থানায় যায় খবর দিতে। আর মৃদুলার বর্ণনা শুনে চমকে ওঠেন পুলিশ অফিসারেরা। 'একজন অফিসারের মুখে বাঁকা হাসিও' (পৃঃ ১৪৫, ঐ) দেখা যায়। তাদের সঙ্গে নিয়ে খোঁজ করেও বিস্তর, মৃদুলাকে পাওয়া যায়নি। এরপর বোম্বাই ছেড়ে এসেছে মুস্তাফি। আর 'মৃদুলা একটা নাম। কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে যাওয়া একটা নাম শুধু।' (ঐ) আর কোন পরিচয় ঠিকানা নেই। আর মুস্তাফি নিজেই যেন এই রহস্য সমাধান করতে চায়নি। তাই, 'মনের মধ্যে সংশয়ের রক্তাক্ত কাঁটাটাই শুধু বিঁধে থেকেছে।' (ঐ) অথচ হঠাৎই কোন এক যাত্রাপথে যেন সেই রহস্য উন্মোচিত হতে চেয়েছে। কারণ, পশ্চিমঘাটের অতল খাদের যে মেয়েটির মৃতদেহ পাওয়া গেছে তার অ্যাটাচি কেসে পাওয়া গেছে 'কটা অদ্ভুত ছবি'। পুলিশের যাকে দরকার তার কাছে ওরকম ছবি থাকার কথা ছিল না। এভাবেই মৃদুলা রহস্যময় হয়ে উঠেছে যে 'ভুল করে ভেসে আসা একটা সুরের ঝলক।' (ঐ)। এভাবেই গল্পটির রোমান্টিক আবেদন, রহস্যে বিষাদে ব্যাকুলতায় প্রশ্নমানতা অসামান্য আবেদন রেখে শেষ হয়েছে। গল্পটি অন্য একটি মাত্রাও এনে দিয়েছে প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পের ধারনায়।

'ছেদ' গল্পটি 'ক্বচিৎ কখনো' (১৯৬২ খ্রিঃ) গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'ছেদ' গল্পের কেন্দ্রে আছে প্রবীর ও লতার সম্পর্ক। এই সম্পর্কের মাঝখানে আছে অমলা, যে গেছে দুমাস হল শৈলবিহারে—সে প্রবীরের স্ত্রী এবং গল্পের কেন্দ্রে প্রবীরের এই মানসিক দ্বন্দ্ব পাঠক মনকে ছুঁয়ে যায়—'অমলারা দুমাস হল গেছে শৈলবিহারে। তাদের ফেরবার সময় হল। অমলা ফিরে এলে কি করে তার কাছে সমস্ত কথা

জানাবে, বা সব কথা গোপনই করবে কিনা সে সমস্যারই যে মীমাংসা খুঁজে পায় না।' (পৃ. ৯৫, ছেদ, প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প, ৩য় খণ্ড) তবে গল্প সূচনায় আছে অন্য ইঙ্গিত, এখানে লেখক জানিয়ে দিচ্ছেন লতার সঙ্গে সম্পর্ক আগেই ছিল তবে 'ছেদ পড়েছিল অনেক আগে। নতুন আরম্ভ এক জীর্ণ রোগশয্যার ধারে।' (পৃ. ৯৫, ঐ) এবং এই আরম্ভের পর সম্পর্ক প্রায় অভ্যাসে পরিণত হয়েছে—'এ বাড়িতে তার আসা-যাওয়া আবার সহজ হয়ে আসছে। ভাঙা পরিচয় জোড়া দেওয়ার প্রথম আড়ষ্টতা যাচ্ছে কেটে। লতার মাও সহজভাবে তাকে গ্রহণ করেছেন, অতীতের ওপর নিজের অজ্ঞাতেই হয়ত বিস্মৃতির পরদা টেনে। (ঐ)। প্রেম এখানে শুধুমাত্র অভ্যেস হয়ে থাকেনি, এর আকুলতাও যে যথেষ্ট তা ধরা পড়েছে লতার সংলাপে তাই রোগাক্রান্ত লতা আকুল উদ্বেগে প্রবীরকে বারণ করেছে তার রোগশয্যায় বসতে। কখনো বা ব্যর্থ হয়ে বলেছে—'তুমি সামনে বসলে মুখ দেখতে পাই না যে।' (ঐ) এবং এই বিড়ম্বিত মুহূর্তে প্রবীর বিভ্রান্ত হয়ে উঠেছে আর প্রবীর আত্মধিক্কৃত হতে হতে জেনেছে মৃত্যুপথ যাত্রীর শয্যাপার্শ্বে নিষ্ঠুরতম প্রহসনের অভিনয় চলেছে। সে তার অনিচ্ছুক নায়ক।' (ঐ) প্রবীর ক্লান্ত ও ভগ্ন। কিন্তু উপায়হীনভাবে তারা প্রহসনে অভিনয় করে চলেছে। পুরনোকে তারা মনে রাখতে চায়নি। প্রবীর ভেবেছে 'চেষ্টা করে এই বিদায় পথিকের শেষ মুহূর্তগুলি মিথ্যা অভিনয় দিয়ে মধুর হয়তো করা যায়। চেষ্টা সে একটু করেছেও কিন্তু সে চেষ্টায় প্রাণহীন কৃত্রিমতা তার নিজের কাছেই অসহ্য হয়ে উঠেছে।' (ঐ) ।

অর্থাৎ লতার সঙ্গে এই অভিনয় এবং দাম্পত্য জীবনে গোপনীয়তা দুইই প্রবীরকে বেদনায় দীর্ণ করেছে; তাই তার কাছে বর্তমান দিনগুলি শুধু বেদনা ও বিক্ষোভেই ভরে ওঠে না, গ্লানিও আছে এই 'নিস্ফল কৃত্রিম সম্বন্ধের।' (পৃ. ৯৬)। অথচ পূর্বে এই সম্বন্ধে ছিল গভীরতা, আর বর্তমানে তা প্রহসন। এই গ্লানি, নিত্য অভ্যাসের অনুশোচনার মাঝে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে লতা ও লতার মায়ের সংলাপ। গ্লানি, অনুশোচনার বেদনা তাই শুধুমাত্র প্রবীরের নয় লতার ক্ষেত্রেও সত্যি। লতার মার যে অবস্থান বাধ্য করেছে তাকে প্রবীরের সাহায্য নিতে; সাহায্য নিয়ে বেঁচে থাকতে। অথচ লতা তার মাকে বলেছে—'সাহায্য নেওয়া নয় মা একে ভিক্ষা বলে। আমি বাঁচব না কিছুতেই, শুধু এই গ্লানিটুকু উপরি নিয়ে যেতে হবে।' (ঐ) তার এই গ্লানি কিন্তু মাকে স্পর্শও করেনি। তিনি বলেছেন —'তোমার সমস্ত ভার

যদি ওর ওপর থাকত, তাহলে কি হত?' (ঐ) লতা প্রত্যুক্তি করলে তিনি এই সম্পর্ক ছেদ করাকে প্রবীরের অপরাধ বলে গণ্য করেন। প্রবীর লক্ষ্য করে 'লতার মুখে বেদনা ও বিরক্তি কিন্তু স্পষ্ট।' (ঐ) এরপরে লতা তাকে প্রতিদিন আসতে বারণ করে, বলে সে ভালো হয়ে উঠেছে। আর প্রবীর লতার 'শীর্ণ মুখে কি অসীম অসহায় হতাশা' দেখে। (ঐ) লতা তাকে চিকিৎসা নিয়ে এত খরচ করতে নিষেধ করে। প্রবীর অন্য ডাক্তার দেখায়। লতা অনুযোগ করলে বলে, 'আমি তো ডাক্তারি ভুলে গেছি।' (ঐ) আর প্রবীর যেন লতার চোখের দৃষ্টি পড়তে পারে, সে চোখ যেন বলে 'ভুলে তুমি সব কিছুই গেছ, সমস্ত অতীত।' (ঐ) কিন্তু মুখে লতা স্পষ্ট করে বলে ' যেটুকু এখনো ভোলনি তাতেই চলবে। আর কাউকে তুমি ডেকো না।' (ঐ) এভাবেই প্রাত্যহিক অভিনয় চলতে থাকে। তাদের নিঃশব্দে কেটে যায় দীর্ঘসময়। একসময় 'নিঃশব্দতা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে চায়—'তাদের সম্বন্ধের সমস্ত ধূসর ব্যর্থতা এই নিঃশব্দতা যেন নির্মমভাবে উদ্‌ঘাটিত করে দেয় কিছু আর আড়াল থাকে না। সেদিনের উদ্দাম আকর্ষণের যেখানে সমাধি হয়েছিল, এ স্তব্ধতা সেইখানেই তাদের পৌঁছে দেয়।' (ঐ)। মৃত্যুপথযাত্রী ক্লান্ত লতা এবং বিধ্বস্ত প্রবীর, এ দু'জনকে নিয়ে এভাবেই প্রেমময় আকুলতা, অথচ সম্বন্ধহীন গ্রন্থি রচিত হতে থাকে। ইতিমধ্যে প্রবীর পায় অমলাদের ফিরে আসার চিঠি—'তারা কাল সকালেই আসছে, প্রবীর যেন দমদমেই তার সঙ্গে দেখা করে।' (ঐ) । প্রবীর গাড়ি বার করে তৈরি হয় তাদের আনতে যেতে। 'কিন্তু গাড়িটা যেন নিজের ইচ্ছেতেই ঠিক রাস্তাটা ধরতে চায় না।' (ঐ) এবং 'সংকীর্ণ একটি রাস্তার জীর্ণ একটা বাড়ির কাছে থামে।' (ঐ) এরপরে প্রবীরকে আবার দেখা যায় লতার রোগশয্যার পাশে। লতা অবাক হয়। জানতে চায় ' তোমার কল-টল নেই তো।' (ঐ) প্রবীর হাসে। লতার মা এসে কোন দরকারী প্রসঙ্গ উপস্থাপিত করতে এসে লতার তীক্ষ্ম স্বরে থেমে যায়। অবশেষে বাধ্য হয়ে বলে —'এ বাড়িটা কি রুগীটুগীর পক্ষে ভালো? (পৃ. ৯৭)। এভাবে তীব্র বিতর্কের পর লতা রোগাক্রান্ত শরীরে উঠে বসে। নিষ্ঠুরভাবে মাকে জানায়—'তুমি যা বলতে চাও তা বুঝতে কারুর বাকি নেই।' (পৃ. ঐ) বিভ্রান্ত বিহ্বল প্রবীর তাড়াতাড়ি বলে, 'দেখুন কাল আমি আরেকটা বাড়ি দেখে এসেছি। আপনাদের বলা হয়নি। এতদিন নাড়াচাড়া করা উচিত ছিল না বলেই এ বাড়িতে রাখতে হয়েছে।' (ঐ) অথচ লতা এ দান নিতে অস্বীকৃত হয়। সে বলে—'মার লজ্জা সংকোচ নেই, তিনি বদলে যেতে পারেন, তোমার শক্তি আছে

তুমি অপব্যয় করতে পার, কিন্তু এ বাড়ির বদলে আর বাড়িতে মরায় তফাত কিছু আছে কি?' (ঐ) এবং দৃঢ়স্বরে সে জানায় সে বাঁচতে চায় না। লতার দৃষ্টি যেন প্রবীরের অন্তস্থল বিদ্ধ করে। ক্রমে লতার কণ্ঠস্বর যেন আর্তনাদের মত তীক্ষ্মতা পায় এবং প্রবীরের অনুভূতি যেন বাঙময় হয়ে ওঠে। তাই সে অনুভব করতে পারে, সবটাই অভিনয় নয়। সে উপলব্ধি করতে পারে 'আজ এই মুহূর্তে অমলা যখন দমদমে নেমে তার জন্যে চারিদিকে ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে, তখন এই শীর্ণ মৃত্যু পথযাত্রিনীর শয্যাপার্শ্বে বসে একথা সে সত্যি মনের গভীর বিশ্বাস থেকেই বলছে।' (পৃ. ৯৭, ঐ)।

অর্থাৎ অমলার চেয়ে, প্রয়োজনীয় অন্যকিছুর চেয়েও মহত্ত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে প্রবীরের কাছে তার ফেলে আসা প্রেম। প্রেমহীনতা থেকে প্রেমময় জীবনে যেন রূপান্তরিত হয় সে। লাভ থাকুক না থাকুক তাই প্রবীর অক্লেশে বলতে পেরেছে—'কিছুই তো বলা যায় না। জীবনের রঙ কতবার তো বদলায়।' (ঐ) বস্তুত ঘাতপ্রতিঘাতেই জীবনে আত্মস্বরূপ উন্মোচিত হয় আর এভাবেই তৈরি হয়েছে সম্পর্কের খতিয়ান। জীবন যেমন সত্যি, তেমনই প্রেম। আবার জীবন সবসময় সরলরেখায় চলে না। কর্তব্য, মহানুভবতা এসব উপলব্ধির পাশাপাশি সত্যি হয়ে ওঠে প্রেমও। সবসময় তা প্রকাশিত, রূপায়িত হয় না বটে, তবে তা অস্বীকারের থাকে না। প্রেম উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তা জীবনে রূপান্তর সাধন করে। প্রবীরের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। গল্পটিতে পরিষ্কার বলা নেই কি কারণে প্রবীরের সঙ্গে লতার সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছিল। তবে যে কারণেই হোক তা স্বীকার করেই, প্রেমকে গ্রহণ করেই যেন প্রবীর পুনরুজ্জীবিত হয়েছে।

১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'সালাঙ্কারা' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'রোদ' গল্পেও এসেছে এক ধরনের দ্বন্দ্ব। গল্পটি শুভার দিক থেকেই লেখা, তার দ্বন্দ্বই গল্পটির বিষয়। গল্পটির নামকরণে যে রৌদ্রদীপ্ত প্রখরতা, প্রচণ্ডতা, তা যেন তীব্র অর্ন্তদ্বন্দ্বের প্রতীক হয়ে উঠেছে। গল্প সূচনায় এসেছে শুভার একটি যাত্রার বর্ণনা—'এখন আর ফেরা যায় না। সামনেও যতখানি, ফিরে গেলেও পিছনে ততখানি পথ।' (পৃ. ১২২, রোদ, প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প, ৩য় খণ্ড)। ফেরার প্রতি আর্তি এখানে আত্যন্তিক, কিন্তু মাঝপথে তার ফেরার উপায় আর নেই। বস্তুত সে একটি আশ্রয় বা নির্ভরতা চেয়েছিল, চেয়েছিল মানসিক নৈকট্য। এই নৈকট্য তার গড়ে উঠেছিল অফিসের সহকর্মী বিজয়ের সঙ্গে। কিন্তু শুভার

পারিবারিক অবস্থান এবং আর্থিক সংকট এই সম্পর্কের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরই মাঝে অফিস বসের বিদ্রূপ তাদের নৈকট্যের অন্যতম অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বসের আক্ষরিক অর্থে কোন প্রয়োজন এতে সিদ্ধ না হলেও ব্যবসায়িক প্রয়োজনে তিনি মানবিক অনুভূতিগুলিকে দমিয়ে দিতে চেয়েছিলেন বলেই মনে হয়। তাই গল্পের শেষে অপেক্ষারত শুভার সামনে কাঙ্ক্ষিত বিজয় আসেনি, এসেছে অফিস বসের গাড়ি। এবং শুভা তার উপলব্ধিতে বাকিটা যেন বুঝে নিতে চেয়েছে। বুঝেছে 'তেল নিয়ে ও গাড়ি তার পাশ দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে হয়ত হঠাৎ থামবে। যিনি চালাচ্ছেন তিনিই হয়ত জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলবেন ...আসুন পৌঁছে দিই।' (পৃ. ১২৬, ঐ) এক্ষেত্রে সমাজ নির্দেশের কাছে মান্যতা স্বীকার করেছে শুভার প্রেম-আকুলতা। অথচ অর্ন্তদ্বন্দ্ব থেকেও সে প্রথমাবধি বেরিয়ে আসতে পারছিল না সেকারণে। তাই রাস্তায় বেরিয়ে 'মাথাটা রীতিমত ঝিমঝিম করেছে' (পৃঃ ১২২, ঐ) শুভার মনে হয়েছে এতটুকু ছায়া পেলে বেঁচে যেত। এ শুধু তার দৈহিক কৃচ্ছতা নয়, যেন মানসিক বেদনারও স্বরূপ। অথচ অর্ন্তবেদনায় সে এই দ্বন্দ্ব অতিক্রম করতে চেয়েছিল এবং অনেকটাই পেরেওছিল। আর তাই বাড়ি থেকে তীব্র রোদ মাথায় নিয়ে বেরিয়েছিল—'বাড়ি থেকে না বার হলেই অবশ্য পারত। বেরুনটাই ভুল হয়েছিল। রোদের তেজ যে কি তা তো দরজাটা খুলতেই টের পেয়েছিল। চোখমুখ ঝলসে গেছল আগুনের ঝাপটায়।' (পৃ. ১২২, ঐ) অথচ, বারবার তার মনে হয়েছে বিজয়কে এই দ্বন্দ্বের কথা তার জানানো উচিত। বিজয়ের কথা চিন্তা করেই সে বেরিয়েছে। শুভার আকুলতা আত্মকেন্দ্রিক নয়, সাময়িক উত্তেজনাও নয়, বরং তা গভীর চিন্তাপ্রসূত। তাইই ধরা পড়েছে তার চিন্তাসূত্রে—

'কি করবে বিজয়? অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবে। হতাশ হয়ে পায়চারি করবে এদিক-ওদিক। বাড়ি পর্যন্ত তো আসতে পারবে না, নতুন ঠিকানা তাকে জানানো হয়নি ...।' (ঐ) এই চিন্তাসূত্রটি শুভার আকুলতা ও বিজয়ের প্রতি তার অনুভূতি ও নির্ভরতাকে ব্যক্ত করেছে যেন। অথচ নিজের অবস্থান জেনে বুঝে সে কখনো এও ভেবেছে যে যাবে না বিজয়ের সঙ্গে দেখা করতে—'ক্ষুব্ধ অপমানিত বোধ করে, তাতেই যদি সম্পর্ক চুকিয়ে দেয় বিজয়, তাহলেই তো সব সমস্যা সহজে মিটে যায়।' (ঐ) অথচ শুভা এও জানে বিজয় দুর্বল ও মুখচোরা, কিন্তু বিজয়ের অনুভূতিও আকস্মিক নয়। তাই শুভা নিশ্চিত—'বিজয় অভিযোগ অনুযোগ কিছুই করবে না পরের দিন অফিসে দেখা হবার পর

টিফিনের সময় সুযোগ পেলে শুধু সেই শান্ত গাঢ় চোখ তার দিকে তুলে একটু হেসে বলবে 'কাল অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম।' (ঐ) এভাবেই এক দোলাচলবৃত্তিতে থেকে গেছে শুভা। অবশেষে ভেবেছে যে তাকেই একটা কিছু বলতে হবে, বিজয়ের আঘাত লাগলেও। তাই সে বেরিয়েছিল। বিজয়ের সঙ্গে সম্পর্কটার ইতি করে দেবে বলেও শুভা ভেবেছিল অথচ নিজের অনুভূতিকে গোপন রাখতে পারে নি। শুভার মধ্যে যে সৌন্দর্য শালীন অনুভূতি প্রখর তাও ধরা গেছে — 'ছাতিটা খুঁজে পেয়েও কিন্তু নিতে পারে নি। হাতলটা চিড় খেয়ে কাপড়ের রঙ জ্বলে গিয়ে যা চেহারা হয়েছে, ওটা নিয়ে অন্তত সিনেমা হলে ঢোকা যায় না।' (পৃ. ১২৩, ঐ) অর্থাৎ যেকোন আশ্রয় শুভা নিতে আগ্রহী নয়। বিজয়ের সৌন্দর্য বোধ, অনুভূতি আছে বলেই শুভা তাকে বেছে নিয়েছে। তাই ছাতাহীন শুভা শেষপর্যন্ত বেরিয়ে পড়েছে এবং এও তার মনে হয়েছে 'শহরতলিতে যাদের এমন বাসা নিতে হয়, যে ক্রোশখানেক না হাঁটলে সভ্যভব্য পাড়ার নাগাল পাওয়া যায় না, ছাতার চেহারা বিচার করে ব্যবহার করার শৌখিনতা তাদের সাজে না।' (পৃ. ১২৩, ঐ) অর্থাৎ অবস্থা ও অনুভূতি দুয়ের মধ্যেই তারতম্য এখানে ধরা গেছে। এবং শুভার অর্ন্তজ্বালাও এখানে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত হয়েছে—'আকাশ যেন বিরাট একটা জ্বলন্ত ইস্পাতের পাত, তা থেকে অদৃশ্য তরল আগুন ঝরে পড়ছে। মাথা থেকে শুরু করে সর্বাঙ্গে একটা জ্বালা।' (ঐ) অথচ কিভাবে তৈরি হয়েছে বিজয়ের সঙ্গেই তার এই সম্পর্ক তৈরী হয়েছে। অফিসেই তাদের পরিচয়। সামান্য দু-চারটে কথা। অন্যদের কৌতূহল জাগানোর সুযোগ না দিয়ে কখনো চোখে চোখে, কখনো ফাইল চালাচালির মধ্যে 'কখনো একটা চিরকুটে বিজয়ের সংক্ষিপ্ত একটু চিঠি'—(ঐ) এভাবেই এগিয়েছে সম্পর্ক। এরপর ক্রমশ চিঠির পরিবর্তে 'দুটো টিকিট থাকে ফাইলের ভেতরে লুকনো।' (পৃ. ১২৩, ঐ) এভাবেই সম্পর্কটি ক্রমশ এগিয়ে যায়। চৌরঙ্গির সিনেমা হলে সিনেমা দেখা। একটু হাতধরা, পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকা নিরুত্তর। কিংবা স্বল্পবাক দুজনের চা খেতে খেতে সামান্য আলাপ। এভাবেই বিজয় ও শুভার সম্পর্ক উষ্ণতা পেয়েছে। তারা যেটুকু কথা বলেছে তা 'গাঢ় গভীর কোনো কথা নয়, কোনো আশা আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নের কথাও না। সেসব কথা বলে কোনো লাভ নেই তারা জানে।' (ঐ)। তবু আছে 'এই সান্নিধ্যটুকুর বিলাস, বিলাস যেমন তেমনি যন্ত্রণাও।' (ঐ) এই যন্ত্রণা কখনো আর প্রশমিত হয় না। তাই বিজয়ের প্রগাঢ় প্রশান্তি সত্ত্বেও কিন্তু শুভা নিশ্চিন্ত হতে পারেনি। তাই

কখনো সে চিৎকার করে উঠতে চেয়েছে হতাশায়। পারে নি। 'কিন্তু আর কিছু করবার সময় এবার এসেছে। আর কিছু মানে এই করুণ প্রহসন একেবারে শেষ করে দেওয়ার সময়।' (পৃ. ১২৪, ঐ) কিন্তু শুভার সেই সংকল্প ও তেমন দৃঢ়তা পায়নি। এরপর এসেছে প্রতীক্ষিত একটি বিশেষ দিন। তার আগের দিন শুভাকে অফিস বস মিঃ ঘোষ সামান্য অপমানও করেছেন। ঘটনাটা এই 'ছোটবোন রুণুকে নতুন স্কুলে ভর্তি করানোর জন্য সোমবার অফিস গিয়ে পরদিন একটু দেরিতে আসার অনুমতি চেয়েছে শুভা। আর মিঃ ঘোষ তাকে অপমান করেছেন। আর বিজয়ও জানিয়েছে মিঃ ঘোষ বলেছেন—'আপনার তো একটা লিফটের সময় এসেছে। মাইনে বাড়ালে সিনেমা দেখা, হোটেলে যাওয়ার আরো সুবিধে হবে কেমন।' (পৃ. ১২৪, ঐ)।

এভাবেই উভয়ের সম্পর্কের মধ্যে সামাজিক বাধা-ব্যবধান অবাঞ্ছিতভাবে দুর্বার হয়ে উঠেছে। মিঃ ঘোষ শুভাকে বলেছেন—'আমাদের গার্ডেনরীচের অফিস থেকে ফাইলিং এর জন্যে ভাল একজন কাউকে চেয়ে পাঠিয়েছে। ভাবছি আপনার নামটা দিয়ে পাঠাব কিনা। ওখানে কাজ খুব হালকা।' (পৃ. ১২৫) এই বিদ্রূপের পরে শুভা ভেবেছে বিজয়ের সঙ্গে বোঝাপড়া সে করে নেবে। কিন্তু বিজয় আসে নি— 'বারান্দার ছায়াটা সরে যাওয়ায় শুভাকেও একট সরে দাঁড়াতে হয়।' (পৃ. ১২৫, ঐ)। বিষয়টি উভয়ের সম্পর্কে প্রতীকী হয়ে ওঠে। শুভার প্রথমে দুর্ভাবনা হয়েছে বিজয়ের হঠাৎ কোনো দুর্ঘটনা হয়েছে কিনা বা অসুখ। কিন্তু তা দানা বাঁধে না। এরপরেই সে দেখেছে 'এতক্ষণ বাদে একটা গাড়ি তেল নেবার জন্যে পাম্পে এসে দাঁড়াবার পর অপর কোনো সংশয় তার মনে থাকে না।' (পৃ. ১২৬, ঐ) গাড়িটি অফিস বস মিঃ ঘোষের এবং শুভা সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতিটা বুঝে নিয়েছে। তার প্রেম নীরবে হারিয়ে বিনা প্রতিবাদে আপোস গ্রহণযোগ্য হয়েছে। বিজয়ের ক্ষেত্রেও সম্ভবত তাই ঘটেছে। প্রেম ও দ্বন্দ্ব এখানে এভাবেই গল্প বিষয়ের সাথে যুক্ত হয়েছে।

'হাতে হাত রাখো' একটি অনবদ্য গল্পের সংকলন। রচনাটির প্রকাশ সময়কাল ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ। গল্পটিতে দুটি দীর্ঘ গল্প স্থান পেয়েছে, যার প্রথমটি প্রেমের গল্প ও দ্বিতীয়টি রহস্যে রোমাঞ্চে ভরা অ্যাডভেঞ্চার তথা গোয়েন্দা কাহিনি। আমাদের আলোচ্য প্রথমটি—ম্যানুয়েল পেরেরা ও তার প্রেম কাহিনি। এ গল্প সূচনায় লেখক জানিয়েছেন—'ম্যানুয়েল পেরেরা অবশ্য তার আসল নাম নয়। কিন্তু

যথার্থ বা ছদ্ম কোনো নামেই আমার কোনো কল্পিত কাহিনীর মধ্যে সে নেই। (পৃ. ১৯৪, হাতে হাত রাখো, গল্প নং - ১, প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প, ৩য় খণ্ড) এবং 'ম্যানুয়েল পেরেরা নামটা বানানো' বলে উল্লেখ করে লেখক জানিয়েছেন—'ম্যানুয়েল পেরেরা নামটা ঠিক ওই জাতেরই আর একটা নামের জায়গায় নেওয়া।' (ঐ) পেরেরার সঙ্গে লেখকের পরিচয় গোরেগাঁও স্টুডিওতে স্টুডিও ক্যান্টিনের ম্যানেজার দিভেচার মাধ্যমে। এবং পেরেকাকে দেখেই তাঁর মনে হয়েছে 'মাথায় একটু বেশি খাটো না হলে একেবারে আদর্শ ফিলম্ হিরোর চেহারা বোধহয় বলা যেত। চেহারাটায় ঠিক ভারতীয় ভাবটা কিন্তু নেই। রঙটা কেমন একটু বেশি রকম ক্যাটক্যাটে ফর্সা, চোখের তারাতে তেমনি একটু সবজে আভা তখনই লক্ষ্য করেছিলাম।' (পৃ. ১৯৫, ঐ) অর্থাৎ পেরেরার চেহারায় অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ছাপ রয়েছে। সে এসেছিল তার জীবনের গল্প শোনাতে। এবং নির্লিপ্তভাবে সে জানিয়েছিল 'ইচ্ছে করলে বেচতে পারেন।' (পৃ. ১৯৭, ঐ) লেখক বিরক্ত বোধ করলেও ম্যানুয়েল জানিয়েছিল 'আমি শুধু গল্পটা আপনার মত কাউকে শোনাতে চাই।' (ঐ) অর্থাৎ তার দাবি ছিল সংবেদনশীলতার কাছে। এরপরেই ম্যানুয়েল লেখকের হাতে তুলে দিয়েছিল একটি বাধানো খাতা, খাতা না বলে সেটাকে ডায়ারি বলা উচিত—'তার সাদা পাতাগুলোই কাহিনী লেখবার জন্যে ম্যানুয়েল ব্যবহার করেছে। (পৃ. ১৯৮, ঐ) ইতিমধ্যে বান্দ্রার মাউন্ট মেরিতে লেখক দেখেছেন ম্যানুয়েলকে। লেখক জানিয়েছেন—'মাউন্ট মেরি পরম করুণাময়ী।' (ঐ) তাঁর পদতলেই কি মনস্কামনা নিয়ে এসেছিল ম্যানুয়েল, এ যেন তাই তার কাহিনি। সেদিন সন্ধ্যায় লেখক দেখেছেন 'ম্যানুয়েল পেরেরা একটি মেয়েকে নিয়ে মন্দির থেকে বার হচ্ছে।' (ঐ) এবং লেখক এও আবিষ্কার করেছেন এই মেয়েটির সঙ্গেই তিনি ম্যানুয়েলকে আগেও দেখেছেন— 'সঙ্গের মেয়েটির সঙ্গে তার চেহারার বৈসাদৃশ্যটিই তখন বিশেষভাবে চোখে পড়ে ঘটানাটা স্মৃতিতে দাগ কেটে গেছে।' (পৃ. ১৯৮, ঐ) এর কারণও ম্যানুয়েলের চেহারা। এখানেই লেখক ম্যানুয়েল—এর চেহারাটা বিবৃত করেছেন— 'ইউরোপীয় হলেও তার রঙ একেবারে ইয়োরোপের উত্তরাঞ্চলের শ্বেতাঙ্গদের মত ফর্সা। চোখের তারাও নীল। শুধু কোনো পোর্তুগীজ বা স্প্যানিশ পূর্বপুরুষের দরুণ মাথার চুল একেবারে কালো।' (পৃ. ১৯৯, ঐ) অথচ তার সঙ্গীটি 'শুধু মাথায় তার চেয়ে আঙুল লম্বা নাহলে রঙটি বেশ মসৃণ কালো এবং দেহের বাঁধুনি যৌবনোদ্ধত হলেও ঝোঁকটা তার স্থূলতার

দিকেই।' (ঐ) সবচেয়ে বড়কথা ম্যানুয়েলের সঙ্গে প্রকৃতিগত দিক থেকে সে একেবারে আলাদা—'ম্যানুয়েলের শান্ত ধীর সংযত কাঠিন্যের পাশে উদ্ধত উচ্ছল তরলতা বিসদৃশ।' (ঐ) সম্ভবত এখানেই দুজনের আকর্ষণ সূত্রও ছিল, যা ক্রমশ প্রকাশ্য। ম্যানুয়েল তাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এসেছিল এবং জিজ্ঞেস করেছিল 'পড়েছেন আমার লেখাটা?' (ঐ) তখনই লেখক তা অদ্ভুত চরিত্র এই ম্যানুয়েলের লেখার প্রতি তারপরেই আকৃষ্ট হয়েছেন তা স্বীকার করেছেন—'কষ্ট যা হয়েছে তা শুধু জড়ানো হাতের লেখাটা পড়তে। নইলে কাহিনীটার নিজস্ব একটা আকর্ষণ খুব সামান্য নয়। কৌতূহল জাগিয়ে রাখা কাহিনী বলা যায়।' (ঐ) গল্পটি একটি অসামরিক প্লেনের ট্রেনার চালকের কাহিনী। লেখক জানিয়েছেন 'হলদে রঙের প্লেনটি' এখানে প্রতীক। প্রতীকটি প্লেনের ট্রেনার রাজিন্দর কাউলের এক দুশ্চেদ্য কাউলের এই নাগপাশ তার অসামান্য প্রচণ্ড এক আসক্তি। এখানে কাউল অভিন্ন ম্যানুয়েল পেরেরার সঙ্গে, এই আসক্তি চরিত্রটির সমস্ত সত্তাকে ধীরে ধীরে এক দুঃসহ ক্লেদাক্ত তামসিকতায় আচ্ছন্ন করে দিতে চায়।' (পৃ. ২০০, ঐ) কিন্তু এই অবস্থার থেকে চরিত্রটি মুক্তি পেতে চেয়েছে। তাই 'সে প্লেনে আকাশে বিচরণের সময়ে নিজেকে তার বন্ধনহীন সর্বগ্লানিমুক্ত মনে হয়, মনে হয় তার বাহনের মতোই সে ভাবহীন গতিবেগে তার ঘৃণ্য আবেষ্টনের উর্ধ্বে উঠে যেতে পারে।' (ঐ)।

কিন্তু, আবার তাকে নেমে আসতে হয় আসক্তির ক্লেদাক্ত পরিবেশে। তার আসক্তির কারণ একজন নারী। তার নাম সোফিয়া। সোফিয়া তার স্ত্রী নয়, রক্ষিতাও নয়, সে একটি অবিশ্বাস্য চরিত্র। ভালো-মন্দ, সৎ-অসৎ সমস্ত সংজ্ঞার বাইরে। কিন্তু কাউল তাকেই আটকাতে চেয়েছে, সে একদিন ছিল রাজিন্দর কাউলের তথা পেরেরার স্ত্রী। তারপর বিবাহবিচ্ছেদের পরে সে মুক্ত। —'সোফিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন। নিজের জীবিকা সে নিজেই অর্জন করে। সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর।' (ঐ) কিন্তু তাদের বিচ্ছেদের কারণ 'ঘৃণায় বিদ্বেষে' দুঃসহনীয়ভাবে হয়নি বরং 'বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছে দুজনেরই বোঝাপড়ায়। অন্তত সোফিয়াই 'কাউলকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করিয়েছে বিবাহ বিচ্ছেদে।' (ঐ) কিন্তু পুরুষ চরিত্র কাউল সম্পূর্ণভাবে তার মোহপাশ থেকে মুক্ত হতে পারে নি। সোফিয়া সেই নারী—'যে নারী তার জীবন একদিন মধুময় করে তোলে, আবার পরের দিন সেখানে আদিম পাশবিক লালসা হিংসা, ক্রুরতার বিষাক্ত আলোড়ন জাগিয়ে সমস্ত ছারখার করে দেয়।' (ঐ)।

কাউল কিন্তু যুক্তি দিয়েও এই বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ মেনে নিতে পারে নি। সোফিয়াকে যুক্তিই প্রাণিত করেছে—'উভয়েই মুক্ত স্বাধীন না হলে স্ত্রী-পুরুষের মিলন তার পরম দীপ্ত সার্থকতায় পৌঁছয় না।' (ঐ)। সে ত্যাগ করেনি কাউলকে। বরং 'আরো যেন নিবিড়ভাবে তাকে জড়িয়ে ধরেছে। আশ্চর্য তার জীবনসাধনা, অদ্ভুত তার সংরাগ। আর কাউল জানে 'সে আলিঙ্গনে কিন্তু যেমন কখনো অনির্বচনীয় মাধুর্যের তীব্রতা, তেমনি কখনো আবার শ্বাসরোধকারী মাদকতার যন্ত্রণা।' (ঐ)। আর কোন সোফিয়ার প্রেমে নিষ্ঠা বিশেষত দেহনিষ্ঠার কোন স্থান নেই—'দৈহিক আনুগত্যের কোন মূল্যই নেই তার কাছে।' (ঐ) কিন্তু কাউলের কাছে তার আত্মসমর্পণও দ্বিধাহীন। কাউল এ ব্যাপারে দীর্ঘদিন অজ্ঞ ছিল। কিন্তু, জেনেশুনেও সোফিয়ার প্রেম, সোফিয়ার মায়া সে কাটিয়ে উঠতে পারেনি। এ বিষয়ে তার সন্দেহ ছিল—'বিবাহিত জীবনে ও বিচ্ছেদের পর কিছুদিন পর্যন্ত সোফিয়ার ভাবভঙ্গি' (পৃ. ২০১) তাকে বিচলিত করেছিল কিন্তু সোফিয়ার মনে কোন অপরাধ ছিল না — 'কোনো আচরণে অপরাধী সুলভ গোপনতা তখনো ছিল না সোফিয়ার।' (ঐ) কিন্তু তবু সোফিয়া কাউলের বিশ্বাস্য হয়ে উঠতে পারেনি। অথচ এভাবেই তীব্র সংরাগে একে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে থেকেছে তারা। সোফিয়ার বন্ধু-বান্ধবীর সংখ্যা বেশি ছিল না ; কোন বন্ধুত্ব প্রায়ই দীর্ঘস্থায়ীও নয় তার — 'কিছুকাল বাদে একে একে সবাইকেই সে কোনো অনায়াস কৌশলে বিদায় দিতে জানে।' (পৃ. ২০১, ঐ) সোফিয়ার এই ব্যক্তিত্বের কাছে হার মেনেছে কাউল। সোফিয়ার চরিত্রের এই দিকটি আবিষ্কার করে কাউল বিস্মিত হয়েছিল—প্রথমে সে সচেতন হয়েছিল। সচেতন হয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল গোড়ায়— 'একটা হিংস্র আক্রোশে সে সাংঘাতিক একটা কিছু করতে চেয়েছিল।' (ঐ) কিন্তু সোফিয়াকে ধিক্কার দিয়ে সমস্ত সংকল্প যেন তার মোহেই শিথিল হয়ে গিয়েছিল কাউলের। নিজেকে কাউল ক্ষমা করেনি। আর 'সোফিয়া তার পৌরুষের আদিম অহং সর্বস্ব অধিকারবোধ যেন হাস্যকর করে তুলেছিল বিদ্রূপে।' (ঐ) কাউল ফিরে গিয়েছিল সোফিয়ার কাছে। তাদের সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন থেকেছে কিন্তু গ্লানিতে ভরে উঠেছে কাউলের দেহমন, কিন্তু সোফিয়ার বিরুদ্ধে তীব্র জ্বালা নিয়েও তার প্রতি আকর্ষণের বন্ধন সে ছিন্ন করতে পারছে না।' (ঐ) এবং তার চেয়েও বড় কথা এই যে 'ধীরে ধীরে বহুবল্লভা সোফিয়ার দৃষ্টিকোণের প্রতি ঘৃণাও তার ক্ষীণ হয়ে আসছে।' (ঐ) এই কারণেই শঙ্কা বোধ করে কাউল। বিদ্রোহ করতে চায় ক্লীবত্বের বিরুদ্ধে, কল্পনা

করতে চায় মুক্তির উপায় এবং তার কল্পনা বিলাসে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে হলদে রঙের প্লেন। অবশেষে 'পাইলট ট্রেনিং ক্লাবের নিয়ম ভঙ্গ করে একদিন সোফিয়াকে গোপনে' (ঐ) সে তুলে নিয়ে যেতে চায় নির্জন আকাশে। —কাউলের এই কল্পনাতেই ম্যানুয়েল পেরেরা লেখা গল্পের শেষ এবং সে যে কাউলের সঙ্গে অভিন্ন তার প্রমাণ হয়েছে একটি সংবাদপত্রের উল্লেখিত ঘটনায়—'বোম্বাই নয় আর একটি শহরের একটি অসামরিক বৈমানিক শিক্ষণ কেন্দ্রের একটি ট্রেনিং প্লেন এখনো পর্যন্ত নিরুদ্দেশ।' (পৃ. ২০২, ঐ)। প্লেনটিতে ট্রেনার ছাড়া কেউ ছিল না এবং ট্রেনার চালকের নাম ম্যানুয়েল পেরেরার নামে। এখানেই ম্যানুয়েল পেরেরার দ্বন্দ্বময় প্রেমজীবনের পরিসমাপ্তি। এইভাবে লেখকের অভিজ্ঞতায় একটি চরিত্রের প্রেম, সৈংরাগ তীব্র দ্বন্দ্ব, দ্বিধাজর্জর মানসিকতা, রোমান্টিক কাহিনির জন্ম দিয়েছে। গল্পটি আধুনিক যুগেরই উপযুক্ত দ্বন্দ্বজর্জর দু'জন মানুষেরই কাহিনি হয়ে উঠেছে।

'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল 'যুগান্তর' পত্রিকায় ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে। পরে এটি 'কুড়িয়ে ছড়িয়ে' (১৯৬২ খ্রিঃ) গল্পগ্রন্থে স্থান পায়। একটি রহস্য বাতাবরণ রয়েছে 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' রচনাটির ক্ষেত্রে। তেলেনোপোতা কাল্পনিক। স্থানটিও গল্পটির শুরুতেই রোমান্টিক রহস্যময়তা পাঠককে কৌতুহলী করে। গল্পটির শুরুতেই এসেছে জ্যোতিষ প্রসঙ্গ—'শনি ও মঙ্গলের মঙ্গলই হবে বোধ হয় যোগাযোগ হলে তেলেনাপোতা আপনারাও একদিন আবিষ্কার করতে পারেন।' (পৃ. ১৯৫, প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প, ২য় খন্ড)। বার হিসেবে শনি ও মঙ্গল সাধারণের কাছে অশুভ বলেই পরিগণিত। জ্যোতিষ শাস্ত্রে শনি ও মঙ্গলের যোগাযোগ লগ্ন বক্রীতার যোগ সৃষ্টি করে। কিন্তু, এর পরের লাইনগুলি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে —'কোন এক আশ্চর্য সরোবরে পৃথিবীর সবচেয়ে সরলতম মাছেরা এখনো তাদের জল জীবনের প্রথম বঁড়শিতে হৃদয়বিদ্ধ করবার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে, আর জীবনে কখনো কয়েকটা পুঁটি ছাড়া অন্য কিছু জল থেকে টেনে তোলার সৌভাগ্য যদি আপনার না হয়ে থাকে, তাহলে হঠাৎ একদিন তেলেনাপোতা আপনিও আবিষ্কার করতে পারেন।' (ঐ)। যে বিষয়গুলি এখানে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠেতা হল যে, প্রথমত, মনে হয় রোমান্টিকতার আকর্ষণে একধরনের সম্মোহন —শুভ-অশুভ বিচারের পূর্বে একধরনের মুগ্ধতা থাকে এবং দ্বিতীয়ত, ধ্বংসের একটা নেশার প্রসঙ্গ। তাই বারবার আশ্চর্য শব্দটির প্রয়োগে একধরনের মোহমুগ্ধতা সূচনা থেকেই

তৈরি করে দেন লেখক। 'তেলেনাপোতা' -র আবিষ্কার করতে হয় এই রোমান্টিকতা জীবনের অর্জন এবং আবিষ্কার তো বটেই। আর তাই গতানুগতিকতার বাইরে সরল আবেশ নিয়ে আসে এই আবিষ্কার এবং আবিষ্কারের মুগ্ধতা তার দায় নিয়ে থেকেই যায় শেষ পর্যন্ত। গল্পটি এইরকম—অভিযানের নেশায় তিন বন্ধু শহর ছেড়ে যাত্রা করে যেখানে, সেখানে একটি প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের একটি অপেক্ষাকৃত বাসযোগ্য ঘরে নিজেদের ব্যবস্থা করে নেয়। পরিবেশও ততোধিক অতিপ্রাকৃত আবহ রচনা করে—'ধসে-পড়া-দেওয়াল' 'চক্ষুহীন কোটরের মত পাল্লাহীন জানলা' (পৃঃ ১৯৬, ঐ) এ সমস্ত বর্ণনা সেই আবহের স্মারক। এই পরিবেশে একজন পান রসনায় এবং অন্যজন নিদ্রাবিলাসে মেতে ওঠেন। তৃতীয় ব্যক্তি বা গল্পকথক এই পরিবেশে গুমোট পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য টর্চ হাতে নিয়ে ভগ্নপ্রায় সিঁড়ি দিয়ে ছাদে ওঠার চেষ্টা করেন। ছাদে গিয়ে তিনি আবিষ্কার করেন —'সেই মুহূর্তে অদূরে সংকীর্ণ রাস্তার ওপারে একটি ভগ্নস্তুপ বলে যা মনে হয়েছিল তারই একটি জানলায় একটি আলোর ক্ষীণ রেখা আপনার চোখে পড়বে। সেই আলোর রেখা আড়াল করে একটি রহস্যময় ছায়ামূর্তি সেখানে এসে দাঁড়াবে।' এবং 'খানিকবাদে মনে হবে সবই বুঝি আপনার চোখের ভ্রম।' (পৃ. ১৯৬, ঐ)। এরপরে কথক পুরুষটি নিচে নেমে এসে দুই বন্ধুর পাশে একটু জায়গা করে ঘুমিয়ে পড়বেন। বেলা বাড়লে পুকুরের ধারে দেখতে থাকবেন মাছরাঙা পাখি, মোটা লম্বা সাপ যে ভাঙা ঘাটের ফাটল থেকে বেরিয়ে পুকুর সাঁতরে ওপারে উঠবে—চঞ্চল ফড়িং, ঘুঘুর ডাকে উদাস হয়ে উঠবেন। এরপর কথকটি ফাতনা ধরে বসে থাকতে থাকতে একটি মেয়েকে দেখবেন যার 'চোখে কৌতূহল আছে কিন্তু গতিবিধিতে সলজ্জ আড়ষ্টতা নেই।' (পৃঃ ১৯৭, ঐ)। এরপর কলসি নিয়ে যেতে যেতে মেয়েটির শান্ত মধুর ও গম্ভীর কণ্ঠ বিহ্বল হয়ে ছিপে টান দিতে কথক ভুলে যাবেন, ফাতনা ডুবে যাবে এবং দেখা যাবে বড়শিতে টোপ আর নেই। ফিরে এসে বন্ধুদের কাছে নিজের মৎস শিকার বৃত্তান্ত শুনে অবাক হবেন কথক এবং মেয়েটির পরিচয়ও জানবেন। মেয়েটির নাম যামিনী, সে পানরসিক বন্ধুটির জ্ঞাতিস্থানীয়া। দ্বিপ্রাহরিক আহারের ব্যবস্থাটা তাদের বাড়িতেই হয়েছে বলে কথক জানবেন। এবং যে ভগ্নস্তুপ রাতে কথকের বিস্ময় উৎপাদন করেছিল দিনে তার জীর্ণতা কথককে পীড়িত করবে এবং তিনি এটাই যামিনীদের বাড়ি জেনে বিস্মিত হবেন। এরপর কথকের সেই পানরসিক বন্ধু যে যামিনীর কাছে 'মণিদা' নামে

পরিচিত এবং তার কাছে অদ্ভুত দাবি নিয়ে উপস্থিত হয় যামিনী। তার গল্পটি তখন জানা যায়। যামিনী যে নিরঞ্জনের বাগদত্তা ছিল একদা তাকে ফাঁকি দিয়ে নিরঞ্জন বিবাহ করে সংসারী হয়েছে। কিন্তু যামিনীর অন্ধ বৃদ্ধা মা সম্পর্কের জেরে নিরঞ্জনের জন্য আজও অপেক্ষারতা। মণির কথায় জানা যাচ্ছে নিরঞ্জন যামিনীর মায়ের দূর সম্পর্কের বোনপো, যামিনীর মাকে কথা দিয়ে সে বলেছিল বিদেশ থেকে ফিরে তার মেয়েকে বিয়ে করবে। কিন্তু নিরঞ্জন আর ফেরেনি, মণি বলেছে—'আরে, সে বিদেশ গিয়েছিল কবে যে ফিরবে.....এমন ঘুঁটে কুড়ুনি মেয়েকে উদ্ধার করতে তার দায় পড়েছে। সে কবে বিয়ে থা করে দিব্যি সংসার করছে। কিন্তু সেকথা ওকে বলে কে? তা বললে বিশ্বাস করবেন না, আর বিশ্বাস যদি করেন তা হলে এখুনি তো দম ছুটে অক্কা! কে মিছিমিছি পাতকের ভাগী হবে!' (পৃ. ১৯৯, ঐ)। মণি এই সংলাপে হোক বা অন্য কারণেই হোক ঝটিতি কথক চরিত্রটি অভিনয় করে বসে বৃদ্ধাটির সঙ্গে — কিছুটা জ্ঞাতসারে কিছুটা অজ্ঞাতেই কথক চরিত্রটি নিরঞ্জন হয়ে ওঠে। যামিনী ও মণিকে বিমূঢ় করে ফিরবার সময় যামিনীর সঙ্গে কথক চরিত্রের সংলাপটিও লক্ষণীয়— 'যাবার মুহূর্তে গাড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়ে আপনার দিকে সেই করুণ দুটি চোখ তুলে যামিনী শুধু বলবে, 'আপনার ছিপটিপ যে পড়ে রইল!' আপনি হেসে বললেন 'থাক না। এবারে পারিনি বলে তেলেনাপোতার মাছ কি বার বার ফাঁকি দিতে পারবে?' (পৃ. ২০০,ঐ)। সংলাপটি তাৎপর্যপূর্ণ, বাচনভঙ্গিটিও গুরুত্বপূর্ণ। এবার গল্পটির শেষাংশে আলোকপাত করা যাক। মহানগরে এস ম্যালেরিয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়বেন কথক এবং ক্রমেই তেলেনাপোতার স্মৃতি ঝাপসা হয়ে যাবে, স্বপ্ন মনে হবে তা এবং মনে হবে 'কল্পনামাত্র' এবং গল্পের শেষে লেখকের অমোঘ উচ্চারণেই সার্থক রোমান্টিকতা সৃষ্টি হবে—'একবার ক্ষণিকের জন্য আবিষ্কৃত হয়ে তেলেনাপোতা আবার চিরন্তন রাত্রির অতলতায় নিমগ্ন হয়ে যাবে।' (পৃ. ২০০, ঐ)।

স্বপ্নপ্রসঙ্গ এ গল্পটিতে বারবার এসেছে, এসেছে অন্ধকার প্রসঙ্গ এবং অভাবনীয়ের ইঙ্গিত। তেলেনাপোতার কাল্পনিকতা নামকরণে স্পষ্ট। প্রথম থেকেই সচেতনভাবে রহস্য তৈরি করা হয়েছে এবং রহস্যটি গল্পটিতে বজায় রাখা হয়েছে। গল্পটির প্রেক্ষাপটে রয়েছে শহর থেকে দূরের কোন অরণ্য ছায়াবৃত গ্রাম এবং নাগরিক জীবনের ফাঁকে দুঃসাহসী অভিযানের কথা। যাত্রাপথটির বর্ণনা বারবার এসেছে আবছা অন্ধকার প্রসঙ্গ। যাত্রাসময় বিকেল এবং গন্তব্যপথে সন্ধ্যার আঁধার প্রভৃতি প্রসঙ্গ।

কল্পনাজাল এভাবেই বিস্তার পেয়েছে। চরিত্র বলতে এখানে কথক চরিত্রেরই প্রাধান্য। অন্যান্য চরিত্রগুলির প্রকাশ সংক্ষিপ্ত, সেই অর্থে সংলাপও খুব কম। নামকরণও নেই সব চরিত্রের। কথক চরিত্র নামহীন এবং সে সম্পূর্ণ ঘটনাটি বলেছে তৃতীয় পুরুষে, পাঠককে উদ্দেশ্য করে। নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্ভাব্য ভবিষ্যতের জন্য বর্ণন সার্থকতর হয়ে উঠেছে। মহানাগরিক জীবনে সরলতা আপেক্ষিক। তাই যামিনীর সঙ্গে অভিনয় সার্থক প্রেমের পরিণতি পেল, প্রেম নয়। বৃদ্ধাটির সরল বিশ্বাস ব্যবহৃত হয় ও তা বুদবুদের মত মিলিয়ে যায়। অথচ, এই বিশ্বাস এই সারল্য সত্য আর তাই 'তেলেনাপোতা' আবিষ্কৃত হয় সহসাই। প্রসঙ্গত মনের সূক্ষ্ম দ্বন্দ্ব জটিলতা এখানেও লভ্য। অন্ধকার অন্তত তিনটিভাবে ব্যবহৃত। এবং লক্ষণীয় একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র 'যামিনী'। 'নিরঞ্জন' যে যামিনীর প্রণয়ী, তার প্রতারণায় যামিনীর কৌমারীত্ব ঘুচল না এবং সে অপাপবিদ্ধা, রাত্রির অন্ধকারে এখানে সেই পবিত্রতার ইঙ্গিত। অন্যদিকে যাত্রাকালীন অন্ধকার ক্রমশ মনের গহনে নিয়ে যাচ্ছিল যাত্রীদের আর নৈশ অভিযানে স্বপ্নপুরির মত মনে হয়েছিল তেলেনাপোতা ও যামিনীদের জীর্ণ গৃহ। এই জীর্ণতাও ঐতিহাসিকতা ও প্রাচীনত্বের বাহক। সব মিলিয়েই তেলেনাপোতা আবিষ্কার বিস্ময়কর এবং চিরন্তন। কিন্তু, বাস্তবজীবনে তাকে স্থাপন করতে বিভ্রান্তি আসে ; তাই জ্বরের পর কথক চরিত্রটির কাছে স্মৃতি ঝাপসা স্মৃতি হয় না অথচ তা প্রাপ্তব্যও হয়ে ওঠে না। তাই তাকে স্বপ্নের মত মনে হয়, আর ফ্রয়েড দর্শন তো প্রমাণ করেইছে যে স্বপ্নও বাস্তবরহিত নয়। আর এই স্বপ্নে ও আধো জাগরণেই তেলেনাপোতার প্রতিষ্ঠা। নিছক গল্পের প্রয়োজনে নয়, বিষয় হিসেবে রোমান্টিকতাকে গ্রহণ করে এবং কল্পনা ও রহস্যকে তার সমতুল বৈশিষ্ট্য করে প্রেমেন্দ্রের এই রচনাপ্রয়াস সার্থক হয়েছে। বাস্তবতা ও রোমান্টিক রহস্যময়তা দুই-ই গল্পটিকে গতিদান করেছে।

১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েট পাবলিশিং কোম্পানি' প্রকাশিত স্বনির্বাচিত গল্পসংকলনে স্থান পেয়েছিল 'বৃষ্টি' নামক গল্পটি। 'বৃষ্টি'কে বলা যেতে পারে প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটি সার্থক প্রেমের গল্প। প্রেম বিষয়টিকে কেন্দ্র করে প্রেমেন্দ্র মিত্র অসংখ্য গল্প লিখেছেন। ট্র্যাজেডি প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রেমের গল্পের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। 'বৃষ্টি'কে শুধু ট্র্যাজিক বললেই অবশ্য তার বিচার শেষ হয় না, অহেতুক বিরহ বিষাদ যেকোন প্রেমের গল্পের মতোই আলোচ্য গল্পেরও অবলম্বন। গল্পটির

কাহিনি এইরকম— প্রচণ্ড বর্ষার দিনে হঠাৎই দেখা হয়ে যায় ডাক্তার প্রতুল ও নার্স লতার। এই হঠাৎ দেখাকে অবশ্য সম্ভব করে তুলেছিল প্রতুলের চেষ্টা। হসপিটালের বাইরে সে ইচ্ছে করেই বাসস্টপে দাঁড়িয়েছিল। লতিকাকে দেখামাত্র সে কিছুটা ছলনার আশ্রয় নিয়ে লতিকার সঙ্গে আলাপ জমিয়েছিল। এরপরে তাদের আলাপ জমে ওঠে এবং ক্রমশ প্রেম গভীর হয়ে ওঠে। জীবনের পরিণত স্তরে এসে এ কাহিনি নিজেই জানিয়েছে ডায়েরি লেখক প্রতুল। ক্রমে সেই হয়ে উঠেছে গল্পকথক এবং নায়ক চরিত্র—দুই-ই। সংলাপগুলি স্মৃতিসূত্রে উঠে এসে জীবন কাহিনিতে বৈচিত্র্যমাত্রা যোগ করেছে। ঘটনা বিবরণ থেকেই গল্পটির বিষয় বুঝে নিতে হয়। গল্প লেখক ও কথক প্রতুলের লতিকার সঙ্গে এরপর নানাভাবে সাক্ষাৎ হয়েছে। তবে প্রতুলের স্মৃতিতে এসেছে আরও একটি সাক্ষাৎ যেখানে ঝড়ের মুখে তার দেখা হচ্ছে লতিকার সঙ্গে। দুজনেই মাত্র সওয়ার এইরকম একটি দোতলা বাসে তারা চলেছে। এখানে লতিকার সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে সে জেনেছিল সাত নম্বরের প্রসূতি রোগিণী লতিকার নিজের দিদি। এরপর লতিকার বাড়িতে বৃষ্টিদিনে লতিকার সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে জানা যাচ্ছে— মেধাবী প্রতুল গ্রান্ট পেয়ে জার্মানী যাচ্ছে। কিন্তু, গ্রান্ট প্রত্যাখ্যান করে দেশেই রিসার্চ করতে চাইছে। এরপরের দৃশ্যগুলি পরপর সজ্জিত হয়েছে। প্রতুলকে এড়িয়ে চলেছে লতিকা। ড. মৈত্রের চেম্বারে লতিকার দেখা পেয়েছে প্রতুল, কিন্তু লতিকাকে তার কিছু জিজ্ঞাসা করা হয় নি। বিভ্রান্ত প্রতুল পথে নেমেছে, হাসপাতাল যাবার পথে লতিকাকে প্রশ্ন করেও উত্তর পায়নি সে, এরপর লতিকার বাড়িতে গিয়েও তার দেখা পায়নি প্রতুল। তারপর একদিন—'ভালো করে ভোর না হতেই প্রতুল সেদিন বেরিয়ে পড়ল, আজ সে লতিকার সঙ্গে দেখা করবেই। ভোরের সদ্যোজাত আলোতেও রুগণ্ নগরের কেমন একটা আচ্ছন্ন ভাব। ওপর থেকে পড়ছে বৃষ্টি, নিচে থেকে উঠছে একটা কুৎসিত ধোঁয়াটে কুয়াশা।' (পৃ. ৩৮, প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প, ২য় খন্ড)।

সেই ভোরে নাইট ডিউটি সেরে ক্লান্ত লতিকা প্রত্যাখ্যান করে প্রতুলকে। তীক্ষ্ন তীব্র স্বরে লতিকা জানায় 'কিন্তু কেন আমার জন্যে তুমি এতবড়ো ত্যাগ করবে? এ তোমার ত্যাগ তো নয়, আমার ওপর তোমার এ অত্যাচার, সারাজীবন ধরে তুমি এই ভেবে গর্ব করবে যে আমার জন্য তুমি তোমার সমস্ত ভবিষ্যৎ বিসর্জন দিয়েছ, আমার জন্যে করেছ অসামান্য আত্মত্যাগ। সমস্ত জীবন আমায় তুমি রাখতে

চাও অপরাধী করে, তোমার সে আত্মপ্রসাদের দৃষ্টি বিষে আমার জীবন জর্জরিত করতে দেব না, কিছুতেই আমি দেব না তোমায় তা করতে, তোমার এই ত্যাগ আমি চাই না। (পৃ. ৩৯, ঐ)। গল্পের দিক থেকে লতিকার এই সরে যাওয়ার আকস্মিকতা পাঠককে চমকিত করতে বাধ্য। কিন্তু, গল্পের মাপকাঠিতে এই আকস্মিকতা যত প্রয়োজনীয়ই হোক তা গল্পটির দুর্বলতাও বটে। কিন্তু, প্রেম যেখানে গভীর সেখানে এই পরিণতি অস্বাভাবিক নয়। বিশেষত, বৃষ্টি ও বর্ষাঋতু সাহিত্যে সবসময়ই এ প্রেমের দ্যোতক হয়ে ওঠে। মনে পড়বে বিদ্যাপতি 'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শুণ মন্দির মোর।' এ লেখাটি কথক লেখক প্রতুলের স্মৃতিচারণ তাই গল্পটির প্রায় শুরুতেই আছে প্রতুলের একাকিত্বের কথা, বর্ষার গভীরতা ও অবসাদ বহন করে আনার কথা। বর্ষার গভীরতা ও অবসাদ বহন করে আনার কথা, প্রতুলের উপলব্ধি—'বাইরের আকাশের দিকে চেয়ে কে আজ বলবে, এই পৃথিবী কিছুদিন আগেই ছিল আলোক আনন্দে উজ্জ্বল, প্রাণের চাঞ্চল্যে স্পন্দমান। প্রাণের সমস্ত অঙ্কুর তার দেহ থেকে ধুয়ে গেছে নিশ্চিহ্ন হয়ে। প্রতুলের জীবনও যেন তেমনি (পৃ. ৩১, ঐ) কিন্তু, এর পাশাপশি অন্য একটি গল্পও রয়েছে, সেটি লতিকার এবং সেখানেই আধুনিক লেখকের মুন্সিয়ানা। লতিকার প্রত্যাখ্যান সূত্রেই এসেছে মনতাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব বিষয়টি। লতিকার প্রত্যাখ্যান যতই আকস্মিক হোক, তা অস্বাভাবিক নয়। কারণ, মনের দ্বন্দ্ব জটিলতাই প্রেমভাবনাকে প্রভাবিত করে। লতিকার ক্ষেত্রে এর সম্ভাব্য কারণ হীনমন্যতা, তা থেকে ভীতি, দ্বন্দ্ব ও হতাশার যন্ত্রণা, এই যন্ত্রণায় বিদ্ধ হতে হতে সে সার্বিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রতুলকে ত্যাগ করার। প্রতুলের দিক থেকে তা দুর্বোধ্য আর তাই তার বেদনাও গভীর। বৃষ্টির দিনের মতই অতীতের স্মৃতিচারণায় মুখর হয়ে উঠেছিল প্রতুল। বাঙময় জীবন থেকে দূরে প্রতুলের জীবন ভাবনা গভীর ও নীরব। শুধু তা নিরর্থক বলে মনে হয় না, তার বেদনা যতই গভীর হোক তা নিয়ে তার প্রেম সার্থক। প্রেমেন্দ্রের প্রেমের গল্পে—পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এটি অন্যতম প্রেমের গল্প যেখানে ব্যর্থতা থাকলেও তার সদর্থক একটি উত্তরণও রয়েছে ; প্রেম মৃত। কিন্তু, প্রেমধারাটি সজীব অবিচ্ছিন্ন বৃষ্টিধারার মত। এখানে প্রকৃতি শাশ্বত রূপের সঙ্গে চিরকালীন প্রেম সত্ত্বাটি মিশে গেছে, তাই প্রতুলের প্রেম অমলিন, এখানেই গল্পটির সার্থকতা। প্রতুল জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছেও লতিকার কথাই ভাবছে। সুতরাং প্রেম তার কাছে বড় হয়ে উঠেছে। বিদেশের ডিগ্রী বা সম্মানীয় কাজ আসলে তুচ্ছ মনে

হয়েছে। কিন্তু লতিকা তার নিজের দিক থেকে ভেবেছে। একজনের বড় হয়ে ওঠার পথ রুদ্ধ করে দিতে চায় না, সারাজীবন একজনের ত্যাগের বিনিময়ে নিজ জীবনের সুখ শান্তি পেতে চায় না। এভাবেই প্রত্যেকের নিজস্ব ধারণায় গল্পটি অন্যমাত্রা পেয়েছে।

দাম্পত্য জীবনাভিত্তিক গল্প—

আমরা প্রথম পর্বেও দাম্পত্য জীবনকে কেন্দ্র করে নানান টানাপোড়েনের জীবনচিত্র পেয়েছি। উত্তরপর্বেও দাম্পত্যজীবনভিত্তিক বেশকিছু গল্প রয়েছে। এই পর্বের গল্পগুলির বিষয়গত দিকগুলি বিশ্লেষণ করে দেখা যাক —

১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'সংসার সীমান্তে' গল্পগ্রন্থে স্থান পেয়েছিল 'মল্লিকা' নামে একটি গল্প। 'মল্লিকা' গল্পটিকেও দ্বন্দ্ব জটিল প্রেমকাহিনি বলা যেতে পারে, তবে গল্পের আঙ্গিক কিছুটা আলাদা। গল্পটির পটভূমিকায় রয়েছে প্রধান চরিত্র সুবিকাশের প্রবাস জীবন। অপরিচিতের মধ্যে যে প্রেমাস্পদকে আবিষ্কার করে সুবিকাশ সে মল্লিকা। মল্লিকা যে জীবনে পথের দিশা খুঁজে পায়নি সেও ভ্রষ্ট হতে হতে প্রেমের চিহ্ন খুঁজে পায় সুবিকাশের মধ্যে। কিন্তু, অভ্যাসবশতঃ তাকে ত্যাগ করে অচেতন মনের জটিল কারণে। এখানেই প্রেমের রহস্যময়তা। গল্পটি এইরকম— ভদ্র-সুচাকুরে, সুদর্শন সুবিকাশ তার প্রবাস জীবনে চাকরিসূত্রে এলেও সে ছিল নিতান্ত একা। সুবিকাশের সঙ্গে চার্নি রোডে হঠাৎ দেখা হয় শ্রীপতিবাবুর। মাতৃভাষা শুনতে পারার আনন্দে সুবিকাশ ক্রমশ আগ্রহান্বিত হয়ে পড়ছিল শ্রীপতির প্রতি। শ্রীপতির বাক্যবিন্যাসের পারিপাট্য সুবিকাশকে প্রায় আচ্ছন্ন করেছিল। শ্রীপতিবাবুর মারফতেই সুবিকাশের সঙ্গে আলাপ হয় মল্লিকার। প্রথম দিনই সুবিকাশের মনে হয়—'এ যেন ফুটপাথে কেনা সস্তা ক্যালেন্ডারের ছবি আঁটা পিচবোর্ডের ছেঁড়া মলাটের পেছনে মহাকবির ছন্দোবহ রচনা।' (পৃ. ২৩৩) । সুবিকাশ প্রথম দিন বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল কারণ, শ্রীপতি ও মল্লিকার তারতম্য। শ্রীপতিবাবু ও মল্লিকার মধ্যে চেহারা, বয়স, রুচি সবেরই পার্থক্য। সুবিকাশের মনে প্রশ্ন জাগলেও তার স্বভাবসুলভ ভদ্রতায় তা সে প্রকাশ করেনি, মল্লিকাকে দেখে সুবিকাশের প্রথমেই তার অনুরাগীতে পরিণত হয়েছিল। ক্রমশ সে অনুভব করতে পরে যে শ্রীপতিবাবুর কথাগুলি শুধু কৃত্রিম নয়, কপটতাও তাতে মেশানো এবং মল্লিকার ব্যবহারও নিঃস্পৃহ। কিন্তু সুবিকাশ অনেকদিনই মোহাচ্ছন্ন ছিল—'প্রথম দিন আর

কিছুই সে বোঝেনি। বোঝেনি বেশ কিছুদিন পর্যন্ত। বুঝলে আকণ্ঠ নিমগ্ন হবার আগে সে হয়তো নিজেকে সাবধান করবার একটু নিস্ফল চেষ্টাও করত। যত ক্ষীণই হোক, তার সামাজিক বিবেকই তাকে বাধা দিত যথাসাধ্য।' (পৃ. ২৩৪, প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প, ২য় খন্ড)। সুবিকাশ অনেকদিন পর্যন্ত মল্লিকাকে শ্রীপতির স্ত্রী হিসেবে ভাবতেও পারেনি। একদিন মল্লিকা নিজেই ধরা দিল সুবিকাশের কাছে। শ্রীপতিবাবুর আমন্ত্রণে সুবিকাশ তার বাড়ি গিয়ে দেখেছিল তিনি বাড়িতে নেই, মল্লিকা তখন বাইরে বের হচ্ছিল। তবু, সুবিকাশকে নিয়ে গেল বাড়িতে এবং যান্ত্রিক আলাপ শুরু হল সেখানে। মল্লিকা সুবিকাশকে স্পষ্ট করেই জিজ্ঞাসা করল কত টাকা শ্রীপতিবাবু তার থেকে ধার নিয়েছেন। সে মুহূর্তেই শ্রীপতিবাবুর আকস্মিক প্রবেশ এবং ধারের জন্য সুবিকাশের কাছে আবদার। সুবিকাশ বিস্মিত সেজন্য যতটা হয়েছিল। তার চেয়েও বেশি বিস্মিত হল মল্লিকার ব্যবহারে,—"মল্লিকা লজ্জাও পেল না, উঠেও গেল না। ঈষৎ হেসে বললে, 'মোটে হাজার টাকা শুনে সুবিকাশবাবু বোধহয় লজ্জা পাচ্ছেন। একে ধার বললে অপমান করা হয়।" (পৃ. ২৩৬, ঐ)। এরপর নিস্ফল আক্রোশে সুবিকাশ ধার সেবার তো বটেই, আরও একাধিকবার দিয়েছে। বিবাহ উপলক্ষে শ্রীপতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ইচ্ছে করেই মল্লিকা সুবিকাশের কাছে দাবি করেছে উপহার। এরপর মল্লিকার মুখোমুখি হলে সুবিকাশের সামনে মল্লিকা মেলে ধরেছে তার জীবনের পাতাগুলি। সমাজের নিয়ম নীতির বিরুদ্ধে রূপযৌবনহীন শ্রীপতিকে বেছে নিয়ে মল্লিকা ভেবেছিল সে নিজের হৃদয়কেই প্রাধান্য দিচ্ছে। এরপর সে ক্রমশ উপলব্ধি করে যে, নিজের ইচ্ছেকেই সে প্রশ্রয় দিয়েছে ; ভালবাসা আত্মপ্রসাদ তৃপ্তি দিয়েছে, ভালোবাসা ভেবে যা নিয়ে সে পরিতৃপ্ত ছিল, আসলে তা তার অহংকার। মল্লিকা তার ভালোবাসার দায় চাপিয়েছিল শ্রীপতির উপর। ফলে, এই দায় বহন করতে গিয়ে শ্রীপতি অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়েছে। মল্লিকার শৌখিনতা তার আকাঙ্ক্ষা মেটাতে গিয়ে ছলনার আশ্রয় নিতে হয়েছে শ্রীপতিকে। ফলে, তাদের দাম্পত্য জীবন ব্যর্থ হয়েছে। মল্লিকার এই আত্মপ্রকাশ সুবিকাশকে স্বস্তি দিয়েছিল। কিন্তু, এরপরেই আবার শ্রীপতিকে অস্থির ও বিচলিত দেখায়, মল্লিকাকে কঠিন মনে হয়, কিন্তু তার চোখে একটা গভীর অবসাদ খুঁজে পায় সুবিকাশ। এর মধ্যেই মল্লিকা ধার হিসেবে কিছু টাকা চায় সুবিকাশের কাছে। সুবিকাশ এতে তীব্র আঘাত পায়। পাল্টা আঘাত করতে সুবিকাশ জানায় টাকা সে দিতে পারবে না, মল্লিকা সংযম হারিয়ে

ব্যাকুল হয়ে টাকা দাবি করে এবং অবশেষে স্বীকার করে যে তাদের পালিয়ে যেতে হবে। মল্লিকা ও শ্রীপতির জীবনের একটি কালিমালিপ্ত ইতিহাস রয়েছে, যা তারা মুছে ফেলতে পারেনি এবং এই গ্লানিময় অতীত তাদের তাড়া করে বেড়ায়। মল্লিকা ভেঙে পড়ে বলেছে সুবিকাশকে তার মুক্তির ব্যবস্থা করতে, অবশেষে নির্দিষ্ট দিনে ট্রেনে সব জিনিসপত্র উঠিয়ে সুবিকাশ যখন মল্লিকার পাশে অপেক্ষা করছে, মল্লিকা তখন বলেছে তার মাথাটা হঠাৎ ধরেছে,— সুবিকাশ ব্যস্ত হয়ে ওষুধ আনার চেষ্টায় ট্রেন থেকে নেমে এরপর ফিরে এসে দেখল কামরায় মল্লিকা নেই। 'মল্লিকার এখনো দেখা নেই, দেখা আর হবে না, তখনই সুবিকাশ বুঝেছিল। মুহূর্তের একটা চাঞ্চল্য। সব কিছু যে হাত বাক্সে ছিল, সেটা? সেটা খুলে দেখবারও দরকার নেই, সুবিকাশ জানে সব ঠিক আছে। না অত ছোটো ফাঁকি মল্লিকা তাকে দেয় নি।' (পৃ. ২৩৯, ঐ)।

শেষের লাইনেই ধরা যায় প্রেমের তীব্রতা ও মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা। 'মল্লিকা' নামের মধ্যে যেন বাধাহীন যৌবনের ইঙ্গিত রয়েছে। মল্লিকা শুভ্র বনফুল। মল্লিকার প্রেম অমলিন। শ্রীপতির অধঃপতন ভ্রষ্টাতাতেও মল্লিকার প্রেম তার প্রতি নিষ্ঠ। শুধু যে শ্রীপতির প্রতি অনুরাগেই এই নিষ্ঠা তাই নয় বরং প্রেম এক্ষেত্রে কর্তব্য স্বরূপ। স্বেচ্ছায় যে অনিশ্চিত জীবন মল্লিকা বেছে নিয়েছিল তার প্রতি দায়বদ্ধতায় সে অন্যায় করতে পিছপা হয়নি। যদিও এ নিয়ে দ্বিধাও তার যথেষ্টই ছিল। সুবিকাশকে সামনে রেখে শ্রীপতি যখন তাকে ব্যবহার করেছে সুবিকাশকে ছলনা করতে, মল্লিকা যেন চাপা আক্রাশে অন্যায়কে সমর্থন করে গেছে। শ্রীপতি যখন ইচ্ছে করেই সুবিকাশকে শোষণ করতে দু'জনের একাকিত্বের সুযোগ করে দিয়েছে, মল্লিকা যন্ত্রচালিতের মত সুবিকাশকে সঙ্গ দিয়েছে, কখনো আহত আক্রোশ প্রকাশ করেছে, কিন্তু প্রতিবাদ করেনি। অবশেষে, চূড়ান্ত আত্মঅবমাননার শেষে যেন নিজের জীবনকে ধিক্কার দিয়ে সুবিকাশের কাছে এ জীবন থেকে পালিয়ে যাওয়ার বাসনা প্রকাশ করেছে। কিন্তু, প্রেমও এক দাসত্ব, জীবন—অভ্যাস। মল্লিকা শেষ পর্যন্ত পালিয়ে যেতে পারেনি। ফিরে গেছে সম্ভবত পূর্ব জীবনে। তবে, হারিয়ে সে যায় নি, এমনকী প্রতারণাও যে করেনি, সুবিকাশ তা অনুভব করতে পেরেছে—শেষ পর্যন্ত। স্বভাবতই মল্লিকার এই ফিরে যাওয়া পাঠকের মনে প্রশ্ন তোলে। আমাদের মনে হয় সুবিকাশের প্রতি প্রেসে মল্লিকার প্রথম থেকেই দ্বিধা ছিলই। জীবনের প্রতি বিশ্বাস হারিয়েছিল বলেই মল্লিকা শেষ

পর্যন্ত তার অভ্যস্ত জীবনে ফিরে গেছে। অথবা নতুন জীবনের প্রতি তার দ্বিধাই তাকে এইরকম সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করিয়েছে। অন্যদিকে, সুবিকাশের প্রথম থেকেই মল্লিকার প্রতি যে আগ্রহ জন্মেছিল ক্রমে তা জোরালো হয়। মল্লিকার জীবন সম্পর্কে জানার পর প্রেমই সুবিকাশের মত মুখচোরা, লাজুক, সুচাকুরে ভদ্রলোককে মল্লিকাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে সচেষ্ট করে তুলেছে। কিন্তু, মল্লিকা চলে যাওয়ার পর তার মন স্থির হলে সে বুঝেছে, মল্লিকা তার কাছে ধরা দেবে না। এজন্য তার অস্থিরতাও আগের মত আর বরং গভীরতর হয়ে উঠেছে তার অনুভূতি।

শেষ পর্যন্ত যে দ্বন্দ্ব জটিলতার কথা এসেছে গল্পটিতে প্রেমেন্দ্রের প্রেমের গল্পে তা সার্বিক বিষয়। মনস্তত্ত্বগত জটিলতা প্রেমের তির্যকতাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রেমের গল্প এ ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখায় নতুন নয়। 'মল্লিকা' নামের মত মাধুর্যে অমলিন হয়ে রইল সুবিকাশের প্রেম। আর মল্লিকার তার সবটুকু না বোঝার রহস্য নিয়ে চিরকালীন আগ্রহের বিষয় হয়ে রইল সুবিকাশের এবং প্রেমও তার অনুভূতিতে গভীর হয়ে রইল। মানবমনের এই নিরীক্ষায় গল্পটি সার্থকতর হয়ে উঠেছে।

'ক্বচিৎ কখনো' (১৯৬২ খ্রিঃ) গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'কালো জল' গল্পটিও লেখা হয়েছে তৃতীয় পুরুষের জবানীতে। 'কালো জল' রচনাটি গঠনগত দিক থেকেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। 'কালো জল' নামে একটি উপন্যাসের সমালোচনা করছেন জনৈক সমালোচক। আর সমালোচনা করতে গিয়ে উপন্যাসটির গল্প বলে ফেলেছেন সমালোচক এবং স্বীকার করেছেন যে এ বইয়ের সমালোচনা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ হিসেবে জানিয়েছেন বইটি পরে 'বিমূঢ়' হয়ে যাওয়ার কথা। 'কালো জল' উপন্যাসটি থেকে তিনটি প্রধান চরিত্র বেছে নিয়ে আলোচনা করেছেন সমালোচক। দিবা, সুপ্রিয় ও বাসব এই তিনটি চরিত্র নিয়েই গল্পটি। লেখক প্রথমেই জানিয়েছেন—"কিন্তু, সাধারণত যাকে ত্রিকোণ কাহিনী বলে 'কালো জল' তা নয়। এই তিনজনের সম্বন্ধের জটিলতা প্রেমের সে মামুলি ছকে পাতা বোধহয় চলে না।' (পৃ. ৯৮, প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প, ৩য় খন্ড)। গল্পছকটি এইরকম—দিবা ও সুপ্রিয়র সাজানো ছিমছাম সংসার। সন্তানাদি তাদের নেই। স্বাচ্ছল্যের মাঝখানে অতৃপ্তিও নেই কোথাও। দিবা একটি গানের স্কুলে ম্যানেজিং কমিটির সদস্যা। সেই প্রতিষ্ঠিত গানের স্কুলে হোমরা চোমরাদের

মাঝে, সুপারিশের মাধ্যমে গান শেখানোর দায়িত্ব পায় বাসব। বাসব যে দিবার পূর্ব পরিচিত গল্পটি চলাকালে দীর্ঘক্ষণ তার কোন প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়নি। বরং প্রথমে জানা গেছে বাসব একসময় গানের জগতে একটু-আধটু নামডাক করলেও অভাবে, অত্যাচারে তার সমস্ত সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। দিবার সঙ্গে বাসবের গানের স্কুলে দৈবাৎ দেখা হলেও কথোপকথন হয়েছে খুব প্রথাগত ও সাধারণ। বাসবের কথায় সম্ভ্রম সবসময়ই প্রকাশ পেয়েছে, দিবার কথায় প্রকাশ পেয়েছে আধিপত্য।এরপরেই লেখকের কথায় জানা গেছে দিবা বাসবের কাছেই গানের শিক্ষা পেয়েছিল। দিবা পরবর্তীকালে অনেকের শিক্ষা পেয়ে গুণী শিল্পী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু, বাসবের সম্ভ্রম, দ্বিধাই সম্ভবত দিবার মনে তার প্রতি আকর্ষণের জন্ম দিয়েছে পুর্নবার। দিবা নিজের বাড়িতে বাসবকে ডেকে পাঠিয়েছে। সুপ্রিয় দু'একদিন বাড়িতে বাসবকে দেখতে পেয়ে একদিন বাসবের আসার কারণ জানতে চেয়েছে সহজভাবেই। সুপ্রিয় ইঙ্গিত দিয়েছিল এই যে দিবার থেকে টাকা নিয়ে মদ-জুয়ায় উড়াবে বাসব। কিন্তু, দিবা জানিয়েছে বাসব নিজে থেকে আসেনি। দিবা তাকে ডেকে পাঠিয়েছিল। সুপ্রিয় কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে। এরপর থেকে দিবা সুপ্রিয়র দাম্পত্য ক্রমে শিথিল এবং যান্ত্রিক হয়ে গেছে। এরপর দিবা অদ্ভুত আচরণ করেছে এবং পৃথক ঘরে রাত্রিবাস করতে শুরু করেছে। সুপ্রিয়র মিনতি সত্ত্বেও দিবা এতটুকু টলে যায়নি। অবশেষে একদিন সুপ্রিয়ার করুণ মিনতিতে দিবা জানিয়েছে — তার নিজের জন্য দু'জনেই যে যন্ত্রণা তারা পাচ্ছে তার এবার শেষ হোক। দিবা জানিয়েছে সে চলে যাচ্ছে এবং বাসবের সঙ্গেই চলে যাচ্ছে। সমালোচকের বিমূঢ়তা এখানেই আর এখানেই রচনাটির সমাপ্তি। কিন্তু, কয়েকটি প্রশ্নচিহ্ন রেখেছেন সমালোচক তথা গল্পকার—'দেহের শুচিতা নিয়ে উন্মত্ত অবাস্তব তন্ময়তাও রুগণ্ মনের একরকম বিলাস? বিবেক অর্থহীন উপদ্রব হতে পারে কখনো কখনো? যতবড় স্খলনই হোক তার অনুশোচনায় মাত্রাহীন আত্মনিপীড়নের চেয়ে জীবনের দাবি অনেক বড়? (পৃ. ১০৩, ঐ)। এই তিনটি অমীমাংসিত প্রশ্নই আসলে গল্পটির উৎসমুখ নির্দেশ করছে। প্রথমত, দেহের শুচিতা, দ্বিতীয়ত বিবেক এবং তৃতীয়ত স্খলন, তিনটি বিষয়ই আবর্তিত হয়েছে দিবা চরিত্রটিকে ঘিরে। দিবার বাতিকগ্রস্থতা প্রথম থেকেই পরবর্তী ঘটনার সূত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, পর্দা কেনার পর দিবার মনে হয়েছে তা বেমানান হয়েছে। একটু খুঁতখুঁতে অথচ পরিবর্তনে বিরাগ, দিবার স্বভাব বৈশিষ্ট্য। অন্যদিকে

বিবেকবোধ ও দ্বিধা দিবাকে তাড়িত যে করেছে, বাসবের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে পর্যন্ত তা বোঝা যায়নি। কিন্তু সুপ্রিয়র সঙ্গে কথোপকথনে গানের স্কুল প্রসঙ্গে দ্বিধা এসেছে দিবার। প্রসঙ্গটি এইরকম গানের স্কুলের কমিটি মিটিঙের নোটিস পেয়ে দিবা সেটি ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিচ্ছে—সুপ্রিয় 'সকৌতুক দৃষ্টি'তে দৃষ্টিতে দিবার দিকে চেয়ে বলে, 'কি, কমিটি মিটিং বুঝি?' 'হ্যাঁ, কোটটা পিছন থেকে পরিয়ে দিতে দিতে দিবা বলে, 'এক জ্বালা হয়েছে আমার।' (পৃ. ৯৯, ঐ)। এরপর দিবাকে যখন সুপ্রিয় বলে 'ও কমিটিতে থাকবার দরকার কি?' দিবার মুখের চেহারায় অসহায় একটা করুণ ভাব ফুটে ওঠে, 'কিন্তু, সুরপতিবাবু শোভনাদি অনিমা ওরা যে কিছুতেই ছাড়তে দেয় না।' (পৃ. ৯৯)। লেখক বলেছেন দ্বিধা ও দৃঢ়তার অভাব দিবার চরিত্রের ত্রুটি কিন্তু, সেই ত্রুটি আপাত; গানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা সে চিন্তা করতে পারে না। তাই তার চেহারায় অসহায়তা স্পষ্ট হয়, দ্বিধাহীন ভাবে সে গানকেই গ্রহণ করার কথা দৃঢ়তায় প্রকাশ করতে পারেনি। এই দ্বিধা ক্রমে সীমাহীন হয়ে দিবাকে একটি সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য করেছে। তার ফলে দিবার সামাজিক স্খলন ও বাসবের সাথে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত। কিন্তু, এই স্খলনের আগে সুপ্রিয়র সঙ্গে না থেকে আত্মনিপীড়নে নিজেকে শাসিত করেছে দিবা। এটি তার বাতিকগ্রস্থতা ও অস্বাভাবিকত্ব। কিন্তু গল্পটিকে যদি এভাবে বুঝে নিতে পারি—বাসবের সঙ্গে দিবার মেলামেশা ও সম্পর্ক ছিল একসময়। সম্ভবত বাসবের চারিত্রিক ত্রুটি এবং আর্থিক অসঙ্গতির অভাবে সেই সম্পর্ক ছিন্ন হয়। দাম্পত্য জীবনে সুপ্রিয়র সাথে দিবার সম্পর্ক ছিল মসৃণ। গানের জগতের সঙ্গে দিবার যোগাযোগ কখনও তাদের জীবনকে ব্যাহত করেনি। দিবার অবশ্য ছদ্মরাগ ছিল, গানের স্কুল নিয়ে সে বলেছিল, 'শুধু বিয়ের বিজ্ঞাপনের বাহার বাড়াবার ফিকির।' (পৃ. ৯১) অথচ সুপ্রিয়র কৌতুকে ধরা পড়েছিল গান নিয়েই দিবা 'পাগল'। 'পাগল' শব্দটা তাৎপর্যমণ্ডিত, এই পাগলামি যেমন অকারণ তেমনই যেকোন শিল্পীর মতই দিবার পরবর্তী আত্মপীড়নের সেই অর্থে কারণ ছিল না। এরপর বাসবের প্রসঙ্গ এসেছে বেশ কয়েকবার। তুচ্ছ কারণে বাসবের প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করেছে দিবা। তার আচরণ দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে। এরপরেই সে বাসবকে ডেকে পাঠিয়েছে। বাসবের সঙ্গে কথোপকথন অংশটি রচনাটিতে নেই। যা আছে তা হল সুপ্রিয়র সাথে ব্যবহার। তারপর দু'জনের আলাদা রাত্রিবাস। এবং অবশেষে দিবার সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন—'কোথায় জানি

না, কেন জিজ্ঞাসা কোরো না, কিন্তু যেতে আমায় হবেই। আর যাব ওই বাসবের সঙ্গে।' (পৃ. ১০৩, ঐ) এরপরেই তার উক্তি 'সেই আমার চরম পুরস্কার।' (ঐ)। 'পুরস্কার' শব্দটি প্রাপ্তি অর্থে ধরে নিতে পারলে বাসবের প্রতি আগ্রহ দিবার সার্থক। কিন্তু, বিদ্রূপার্থে সুপ্রিয়র প্রতি ছলনায় যেন আত্ম প্রত্যুত্তর এবং আত্মনিপীড়নও। প্রসঙ্গত, বাসবকে ভালবেসেই দিবা চলে যাচ্ছে কিনা সেই প্রশ্নটিও থেকে যায়। সুপ্রিয়কে এবং নিজেকেও সে প্রতারিত করেছে বলেই কি তার চলে যাওয়া। অথবা পলায়নবাদিতা? নাকি আত্মনিমগ্ন প্রেমই তাকে চলে যেতে বাধ্য করছে তা স্পষ্ট নয়। এবং এই অনুচ্চারণেই প্রেমের গল্পে রহস্যময় বাতাবরণে গল্পটির সার্থকতা। 'কালো জল' নামটিও গভীর তাৎপর্যবহ— 'কালো একাধারে মনের গভীর অবচেতন কোনটির প্রতি লক্ষিত। অন্যদিকে জলের শুচিতা, প্রসঙ্গটিও এখানে ছুঁয়ে যায়। আর সেটাই সম্ভবত লেখকও উল্লেখ করতে চেয়েছেন। 'দেহের শুচিতা' নিয়ে 'অবাস্তব তন্ময়তাও রুগণ্ মনের একরকম বিলাস' (পৃ. ১০৩, ঐ) কিন্তু, শেষ পর্যন্ত 'জীবনের দাবি'র প্রতি লেখক নিষ্ঠ। এবং পূর্বে উল্লেখিত প্রশ্নটি সেখানেই থেকে যায়। দিবার ক্ষেত্রে জীবনের দাবি অথবা আত্মনিপীড়ন কোনটা বড় হয়েছিল—তা মূল্যায়ন অবকাশ নেই এ গল্পে।

'ষ্টোভ' গল্পটি 'কুড়িয়ে ছড়িয়ে' (১৯৪৫ খ্রিঃ) গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। গল্পটিতে শশিভূষণ ও বাসন্তীর দাম্পত্য জীবনের হঠাৎ আবির্ভূত হয়েছে শশিভূষণের পূর্বপ্রণয়ী মল্লিকা। মল্লিকাদের আপ্যায়নে ব্যস্ত বাসন্তী একটা বাতিল হয়ে যাওয়া পাম্প ষ্টোভ বের করে। ষ্টোভে উনুনের তুলনায় তাড়াতাড়ি হবে এ কারণেই ষ্টোভটির ব্যবহার পরিকল্পনা। ঘটনাটির শুরুতেই ষ্টোভটির প্রকৃতি সম্পর্কে পাঠককে সচেতন করা হয়েছে—'পাম্প করতে করতে হাতে ব্যথা ধরে যায়। কোনোরকমে যদিবা তারপর ধরে তবু থেকে থেকে একটা অদ্ভুত শব্দ এমন দপদপ করে ওঠে যে ভয় করে।' (পৃ. ১৫৮, প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প, ২য় খন্ড)। তবু, মল্লিকাদের ট্রেন ধরার তাগিদ থাকায় শশিভূষণের স্ত্রী বাসন্তী এটা বের করেছিল। এরপর দেরী দেখে প্রথমে শশিভূষণ রান্নাঘরে আসে। এরপর মল্লিকা, কখনো মল্লিকা ও শশিভূষণ, কোথাও শশিভূষণ ও বাসন্তী বা মল্লিকা ও বাসন্তী এদের মাঝখানে ষ্টোভটির উপস্থিতি থেকেই গেছে। এমনকি পাশের ঘরের যেখানে ষ্টোভটির সশরীর উপস্থিতি নেই, সেখানেও ষ্টোভটির গর্জন পরিবেশকে ভারাক্রান্ত করেছে। এরপর মল্লিকার স্মৃতিসূত্রে পূর্বপ্রণয় প্রসঙ্গ এসেছে এবং সেইসঙ্গে জানা গেছে

তাদের বিবাহ না হওয়ার কারণও। মূলত শশিভূষণের চরিত্রের দৃঢ়তার অভাবেই তাদের বিবাহের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এরপর কোন মফস্বল শহরে মেয়েদের স্কুলে হেডমিসট্রেস হয়ে আসে মল্লিকা। মল্লিকার চাকরিস্থলে যেতে প্রত্যেকদিনই যে ষ্টেশনে গাড়ি বদল করতে হয়। সেখানেই শশিভূষণ কলেজে চাকরি সূত্রে বাস করে। হঠাৎই ট্রেন ফেল করে ষ্টেশনে অপেক্ষা করতে গিয়ে মল্লিকা এসে ওঠে শশিভূষণের বাসায়। এরপর বাসন্তীর কানে এসেছিল শশিভূষণের পূর্বপ্রণয়ী মল্লিকার কথা। কিন্তু, শশিভূষণের স্বাভাবিক নির্বিকারত্বে এবং নিজের স্বভাবজাত মর্যাদাবোধে বাসন্তী কোনদিন মল্লিকা প্রসঙ্গ তোলে নি। ক্রমে তাদের দাম্পত্য সহজ নিস্তরঙ্গ হয়ে আসে। হঠাৎই মল্লিকার আবির্ভাব। এই সূত্রে দাম্পত্য জীবনের প্রতীক হয়ে ওঠে ষ্টোভটি। ষ্টোভটির ফেটে যাওয়া নিয়ে প্রথম থেকেই উৎকণ্ঠিত ছিল শশিভূষণ। বাসন্তীর একদিন ভেবেছিল কেউ কিছু জানবে না, কিছু বুঝবে না, কোনো অপবাদ কারও গায়ে লাগবে না। সবাই জানবে, শুধু একটা দুর্ঘটনা হল।' (পৃ. ১৬২, ঐ) এবং সেদিন সে এই ষ্টোভটাকেই মুক্তির পথ বেছে নিতে গিয়েছিল শুধু মল্লিকার জন্যই। অথচ মল্লিকাকে সে চোখে দেখেনি, তার একটা ছবি পর্যন্ত নয়। মল্লিকাকে সে কী ভাবেই না কল্পনা করেছে।' (পৃ. ১৬২, ঐ) এরপর চাক্ষুষ পরিচয়ে সেই কল্পনা মুছে গেছে, কারণ, মল্লিকার বয়স ও রূপ কোনটাই লুকনো নেই, আর তা উল্লেখযোগ্য নয়। সবচেয়ে বড় কথা শশিভূষণের স্বাভাবিকতা, বাসন্তীর প্রতি নির্ভরতা বাসন্তীকে ক্রমে স্বস্তি দিয়েছে। বাসন্তী মনে করেছে 'যার মনের হৃদয়ের সমস্ত ব্যাপার আজ বাসন্তীর কাছে জলের মতো স্বচ্ছ, এমন কোনো আশ্চর্য গোপন স্থান তার কোথাও কি থাকতে পারে, যেখানে অত বড়ো ভালবাসা নিঃশব্দে গোপন করা যায়? কোনোদিন কোনো রঙ যদি শশিভূষণের মনে লেগে থাকে, বাসন্তী স্থির বিশ্বাসে জানে যে, সে রঙ অনেক আগেই ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে।' (পৃ. ১৬৩, ঐ) । এই বিশ্বাস এই নিরাপত্তাহীন বাসন্তীর দাম্পত্যের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেছিল, তাই মল্লিকার আগমনে ও বাসন্তীর কোন সংশয় ছিল না বরং এই পরিপূর্ণতা এই তৃপ্তিকে সে মল্লিকার সামনে দেখাতে পেরে খুশি হয়েছে। বাসন্তীর মনে হয়েছে এ যেন একপ্রকার যন্ত্রণার ঋণশোধ।' এরপর রান্নাঘরে ষ্টোভটি হঠাৎ ফেটে যেতে পারে ভেবেছে বাসন্তী। এবং মল্লিকা এতে ভুল ধারণা করতে পারে যে তার জন্যই বাসন্তী ইচ্ছে করেই আত্মঘাতী বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। এই আশঙ্কা করেই বাসন্তী লজ্জিত হয় এবং চেষ্টা

করে যাতে ষ্টোভটা না ফেটে যায়— কারণ, 'কিছুতেই আজ কোনো দুর্ঘটনা যে ঘটতে দেওয়া যায় না।' (পৃ. ১৬৩, ঐ)। এভাবেই দাম্পত্যজীবনে ষ্টোভের ভূমিকা এবং তৃতীয় ব্যাক্তির উপস্থিতি গল্পটিকে তাৎপর্যমন্ডিত করেছে।

প্রতীকী গল্প —

প্রেমেন্দ্র মিত্রের অধিকাংশ গল্পেই দেখা যাচ্ছে ব্যঞ্জনার একটা অবকাশ থেকে গেছে। গল্পে প্রতীক ব্যবহার শিল্পরূপ প্রসঙ্গে আলোচিত হবে। এই অধ্যায়ে আমরা আলোচ্য গল্পগুলিতে দেখতে পাচ্ছি যে খুবই সচেতনভাবেই এমন কিছু বিষয়কে অবলম্বন করেছেন লেখক, যেখান থেকে তাঁর বক্তব্য বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ এই বিষয়গুলির মধ্যেই নিহিত থেকে যাচ্ছে লেখকের উদ্দেশ্য। ছোটগল্পের একমুখীনতাই যেহেতু অন্যতম বিষয় তাই গল্পগুলির প্রতীক এখানে নির্দিষ্ট; কোথাও তা প্রেম, কোথায় অমদমিত যৌনতা প্রভৃতি হিসেবে চিহ্নিত।' এরকমই একটি অসাধাণণ গল্প 'যষ্টিরূপে তমোনাশ'। গল্পটি 'অষ্টপ্রহর' (১৯৭৩ খ্রিঃ) গল্পগ্রন্থভূক্ত। গল্পটির সূচনাতেই এসেছে প্রতীকটির ব্যবহার —'তমোনাশবাবু লাঠি হয়ে গেলেন। বেশ মজবুত গাঁটওয়ালা, মাথাটা খোদাই করা আর মটকাটুকু রূপোয় বাঁধানো লাঠি।' এবং 'আশ্চর্যের কথা, তমোনাশবাবু সবটাই টের পেলেন, বেশ স্পষ্ট করে।' (পৃ. ২৯০, যষ্টিরূপে তমোনাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প, ৩য় খণ্ড) অর্থাৎ তমোনাশবাবুর রূপান্তর তার জ্ঞাতসারে, তার চেষ্টাতেই হয়েছে। তমোনাশবাবুর দীর্ঘদিনের সংসার। স্ত্রী মনোরমা ও তার দীর্ঘদিনের দাম্পত্য। এই দাম্পত্য তমোনাশবাবুর ভূমিকা ছিল প্রায় দর্শকের। তাই গল্পের শেষে দেখা যাচ্ছে, স্ত্রী মনোরমার মনে হচ্ছে তিনি তমোনাশবাবুর গলা শুনতে পাচ্ছেন—'যা দেখেছ খুব অবিশ্বাস্য আর মনে হচ্ছে কি? আমার সম্বন্ধে সকলের কল্পনার দৌড়টাও তো দেখলে। লুকিয়ে হিন্দি সিনেমা দেখার বেশি একটা চরিত্র দোষেরও প্রমাণ নেই। নেহাত মাঝারি সাধারণ মামুলি লাঠিটার সঙ্গে খুব বেশি তফাত কি আমার ছিল।' (পৃ. ২৯৭, ঐ) আর, যখন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তমোনাশবাবুকে, তখন লোকের কথায় টের পাওয়া যাচ্ছে তার অবস্থান ও মানসিক বৈশিষ্ট্য। যেমন খুড়তুতো ভাই রতিকান্ত যখন ফোনে লালবাজারের এক চেনা অফিসারের সঙ্গে কথাবার্তা বলছে, তখন সে বলেছে যে তমোনাশবাবু সব কিছুতে মাঝারি, এবং একথা বলবার পরই সে বলতেও

পারত, জীবনে সব কিছুতেই মাঝামাঝি পৌঁছেছেন, মাঝামাঝি উন্নতি, মাঝামাঝি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, সাফল্য।' (পৃ. ২৯২, ঐ) এভাবে জীবন যাপনে অভ্যস্ত নিয়মনিষ্ঠ তপোনাশবাবুর জীবনের প্রতি আগ্রহ কমে আসা স্বাভাবিক। জানা যাচ্ছে, তমোনাশবাবু জীবনের মাঝামাঝি সময়ে উপনীত এবং জীবনের মাঝামাঝি সময়েই পঞ্চাশ থেকে ষাটের মধ্যেই যাবতীয় দায়-দায়িত্ব,সাংসারিক কর্তব্য সেরেছেন তিনি। আর মনোরমার ভাইপো 'চালাক চতুর চৌকশ ছেলে সুবীর বলেছে 'একেবারে তো ঘড়ির কাঁটাধরা জীবন। শোকে পাথর না হলে, ভয়ে কাঠ? তা ভয়টাই বা ওঁর কিসের? যেদিকে ভয়ের কিছু আছে উনি তো তার ধার মাড়ান না।' (পৃ. ২৯১, ঐ)। অর্থাৎ সাবধানী মানুষ তমোনাশবাবু কোনভাবেই বিভ্রান্ত হননি। ইতিমধ্যে তমোনাশবাবুর স্ত্রী মনোরমা দ্বিধাগ্রস্ত। কারণ তমোনাশবাবুর লাঠি অবস্থা প্রাপ্তি তিনি দেখেছিলেন—'মনোরমা কিন্তু কতটুকুই বা আর দেখেছেন? ঘাড় থেকে মুণ্ডুটা পর্যন্ত তো শুধু। ওইটুকু তাঁর চোখের ওপরই লাঠির মাথা হয়ে গেছে তমোনাশের শেষ মুহূর্তের হাসি সমেত।' (পৃ. ২৯০, ঐ) তাই, রতিকান্তকে মনোরমা বলেছেন 'মানুষতো বদলে যায়?' (পৃ. ২৯২, ঐ)। পরে অবশ্য সামলাতে না পেরে বলে ফেলেছেন 'বদলে ... বদলে মানে, এই ধর নিয়ম বাঁধা মানুষের হঠাৎ নিয়মে অরুচি হতে পারে তো একদিন? (ঐ) কিংবা সুবীরকে ডেকে এনে যখন তিনি ভাবছিলেন কোথায় যেতে পারেন তমোনাশবাবু। তখন সুবীরকে মুখ ফসকে বলে ফেলেছেন—'তার চেয়ে বল না, তোর পিসে হঠাৎ জমে পাথর হয়ে গেছে।' (পৃ. ২৯৪) অথচ একটি মানুষকে যে এভাবে বিবৃত করা যায় না, চেনা যায় না, সকলেই ক্রমে তা বুঝেছে। তাই সুবীর কল্পনায় তাকে ভেবেছে অন্যরকম। যেমন—'পিসেমশাই বলেই তো আর ধোয়া তুলসী পাতাটি নয়? কত বয়সই বা হয়েছে তার? এই বাহান্ন-তিপান্ন বেশি না কক্ষনো।' (পৃ. ২৯৪, ঐ) আর এ সময়েই যাবতীয় ভুল হয় মানুষের তমোনাশবাবুর ভুল হয়েছে হয়ত। এবং সে এই রকম ভেবেছ যে, অফিসের ষ্টেনো অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়ে মিস ম্যাবেলও সেই পথে তার শরিক হতে পারে। 'ওই ম্যাবেলের সঙ্গে একটা লটঘট যে বাধে নি তার ঠিক কি!' (পৃ. ২৯৫) অফিসের বেয়ারা ছোটেলাল এসে পড়ায় মনোরমা জেনেছে আরেক সংবাদ, যা তারও অজানা ছিল—'ভালো হিন্দি সিনেমা এলে ছোটেলালের কাছেই তিনি তার খবর নিতেন। আর তাকে দিয়ে অগ্রিম টিকিট কাটিয়ে একা একা যেতেন। বেশিরভাগ শনিবারই গেলেও এক আধবার অফিসের ঘণ্টার মধ্যে ম্যাটিনি

শোতেও নাকি গেছেন।' (পৃ. ২৯৫, ঐ) মনোরমা এতে বিস্মিত হয়েছেন, কারণ তমোনাশের মত মানুষের এই বিচ্যুতি বিস্ময়কর। এভাবেই অন্যেরা একটি লোককে আবিষ্কার করতে চেয়েছে অথচ সম্পূর্ণ সফল হয়নি। মনোরমার সেজমামা জ্যোতিপ্রসাদ বলেছে সম্পূর্ণ অন্যকথা। বৈষয়িক বলে স্বনামধন্য জ্যোতিপ্রসাদ নিজে সংসারধর্ম করেন নি, কিন্তু বৈষয়িক বিষয়ে তার পরামর্শ অমূল্য। তিনি বলেছেন— 'সংসার বড়ো বিচিত্র জায়গা, এখানে সবকিছুর জন্যে তৈরি থাকতে হয়।' (পৃ. ২৯৬, ঐ) এবং তিনি আরও বলেছেন, 'সংসারে কি যে সম্ভব আর কি যে নয় তা কেউ জানে না মা। তমোনাশের চেয়ে হিসেবী সাবধানী মানুষ' (ঐ)। ও যে বদলে যেতে পারে তা তিনি জানিয়েছেন। এবং ক্রমে মনোরমার সন্দেহ জেগেছে। বিহ্বল মনোরমার মনে হয়েছে—'কুড়ি বছর ধরে যে মানুষটাকে জানি সে কি হঠাৎ বদলে যেতে পারে? (পৃ. ২৯৬, ঐ)। এ যেন প্রশ্ন নয়, বিভ্রান্তি তার নিজের কাছেই। এরপরে বেশ কিছুদিন ধরে খোঁজখবর করে যখন জানা যাচ্ছে ব্যাঙ্কের বই হিসেবপত্র ঘেটেও গোলমাল নেই। (ঐ) তখন আকস্মিক স্মৃতিভ্রংশের সম্ভাবনা অনুমান করেছেন অনেকে কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক বন্ধু নীলরতন তা স্বীকার করেন নি। বলেছেন—'কিন্তু একথা ভেবে নিতে একটু বাধছে এইজন্যে যে সে এতদিনে চোখে পড়ত না! বিশেষ করে কাগজে কাগজে এত ছবি দেওয়া বিজ্ঞাপনের পর! তাছাড়া স্মৃতিভ্রংশ যার হয় সে তো সাধ করে সকলের চোখের আড়ালে থাকবার চেষ্টা করে না!' (পৃ. ২৯৬, ঐ) মনোরমার উপলব্ধি হয় ক্রমশ যে, একটি লোককে নানা আঙ্গিকে চেনা যেতে পারে। ক্রমশ অন্য ইঙ্গিতগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে মনোরমার কাছে—'তমোনাশের আলাদা একটি জীবন থাকতে পারে। এ প্রশ্নটি নিয়ে বিভ্রান্ত হন মনোরমা, তার মনে হয় ক্রমশ যেন 'দ্বিতীয় পরিচয় আর জীবনটা তার এক আধদিনের বোধহয় নয়।' (পৃ. ২৯৭, ঐ)। নিরুদ্দেশ হওয়া তমোনাশকে সকলেই ভ্রষ্ট বলে সন্দেহ করেন। এবং প্রায় প্রতিটি লোকই এরই সাথে উপলব্ধি করেন—'হিসেবী সাবধানী নেহাত সাধারণ মাপের মানুষ তমোনাশ। কিন্তু এদের বোঝাই বুঝি সবচেয়ে শক্ত। এদের সামনেটা যত সোজা, পেছনের গোলকধাঁধা তত জটিল।' (ঐ) প্রতিটি মানুষই এবারে অচেনা। আর, নিজের ঘরে এসে তমোনাশের সবচেয়ে নিকটজন মনোরমা—আলমারি থেকে লাঠিটা নামিয়ে বিছানায় সেটা শুইয়ে দেখতে দেখতে প্রায় অস্থির হয়ে পাগল হয়ে উঠেছেন। এবং মনে হল লাঠিটার মাথা থেকে যেন তমোনাশের শেষ

হাসিটুকু ফুটে বেরিয়েছে।' (ঐ)।

লাঠি এখানে প্রতীকী। লাঠি অনমনীয়তার প্রতীক। তা প্রায় মৃত্যুতুল্য। সারাজীবন হিসেবী, সাধারণ মানুষ তমোনাশ জীবনে ক্লান্তপ্রায় এবং মান্যতায় তিনি প্রায় লাঠির মতই—যার যাপনে বিন্দুমাত্র স্খলনের অবকাশও রাখেন নি তিনি নিজেই—নেহাত হিন্দি সিনেমা লুকিয়ে দেখা ছাড়া তার আর কোন চরিত্র দোষ কেউই খুঁজে পাননি, আবার যে কোন আকস্মিকতায় তার আপত্তিই ছিল। তাই দেখা যাচ্ছে লাঠি হলেও সম্পূর্ণ পতন তার হচ্ছে না—'কিন্তু মেঝেতে পড়তে হল না। ডিভানটার গায়ে হেলে পড়ে তারই মাথার দিকে গদির খাঁজে আটকে গেলেন।' (ঐ) আবার, চিৎকার করে উঠতে গিয়েও স্বভাবগত আপোসের কারণে তিনি চিৎকার করে উঠতে পারছেন না। অথচ আর তার কিছু দেবার ও নেবার নেই। তাই—'তমোনাশের মুখে তাই একটু হাসির রেখা ফুটে উঠেছে তা না দুঃখের না কৌতুকের।' (পৃ. ২৯০)। আর মনোরমাও দেখেছেন যে—'ঘাড় থেকে মুণ্ডুটা পর্যন্ত তো শুধু। ওইটুকু তাঁর চোখের ওপরেই লাঠির মাথা হয়ে গেছে তমোনাশের শেষ মুহূর্তের হাসিটুকু সমেত।' (পৃ. ২৯১, ঐ) এভাবেই অভ্যাস, প্রাত্যাহিকতা থেকে প্রাপ্ত যে জীবন বিশেষত মধ্যবয়সে তা মৃত্যুরই তুল্য। আর নিরুদ্দিষ্ট হওয়া বা মৃত্যুর সঙ্গে এই লাঠিদশা প্রাপ্তির পার্থক্য এই যে এই অবস্থা প্রাপ্তিতে এক ধরনের রিলিফ আছে, জীবদ্দশা অথচ তা নয়—এভাবেই প্রতীকটির নির্মাণ তাৎপর্য পায়।

'ক্বচিৎ কখনো' (১৯৬২ খ্রিঃ) গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'বাঘ' গল্পের বিষয়টিও প্রতীকী। মনের মধ্যেকার হিংস্রতার প্রতীকায়ন বলা যায় একে। গল্পের লেখক তার পূর্ব অভিজ্ঞতাসূত্রে জনৈক পরিচিত ট্রেন সহযাত্রীর কাছ থেকে একটি চিঠি পান। এই চিঠিটিই গল্প বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। পত্র লেখক লিখেছিলেন—'আপনারা বানিয়ে বানিয়ে অনেক গল্প লেখেন। বানিয়ে লেখেন বলেই সে গল্প মিথ্যে এমন কথা বলছি না। কল্পনার খাদ না মেশালে সোনার মতো সত্যকেও রূপ দেওয়া যায় না বলে আমি মনে করি। কিন্তু জীবনের সত্য যেখান থেকে আপনারা গলিয়ে তোলেন তার বাইরে কত এলাকার এখনো জরিপই হয় নি একথা নিশ্চয় মানেন।' (পৃ. ৫১, বাঘ, প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প, ৩য় খণ্ড)। 'জীবনের জরিপ' না হওয়া জায়গাটি মনস্তাত্ত্বিক কোণ। এই কোণ থেকেই গল্পটির যাত্রা আরম্ভ। ক্রমে পত্রলেখকই হয়ে উঠেছেন গল্প কথক—'এই আমিই একদিন নিজের জীবনটা শেষ করে দিতে

চেয়েছিলাম। চেয়েছিলাম একরকম অহমিকাতেই ভাবতে পারেন। ভাগ্যের সঙ্গে এমন পাশা খেলতে চেয়েছিলাম, যাতে হারলেও জিত।' (ঐ)। জানা গেছে কথক শিকারী—'আমার সঙ্গে সামান্য পরিচয়েই নিশ্চয় জেনেছেন যে শিকারের ব্যাপারে ভারতবর্ষের সেরা শিকারীদের সঙ্গে আমি টক্কর দিতে পারি। আমার দম্ভ বিশ্বাস করুন বা না করুন এ গল্পের কিছু আসে যায় না।' (ঐ) এই শিকার অভিজ্ঞতাই গল্পের অন্যতম বিষয়। গল্প সূচনায় আছে মধ্যপ্রদেশে এক অজগর বন, সেখানে মানুষখেকো কেঁদো বাঘের দাপটে গ্রামের লোকের ত্রাহি রব উঠেছে যখন, তখন 'গাঁয়ের সদ্য সদ্য মানুষ মারার খবর পেয়ে আমরা গিয়ে জুটেছিলাম। আমি আর আমার বন্ধু যমুনাপ্রসাদ।' (ঐ) যখন যমুনাপ্রসাদ ও গল্পকথক দুজন শিকারী সেই গ্রামে গিয়েছিলেন—তখনকার এই শিকারের বিপজ্জনক অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছিলেন গল্পকথক— কাছাকাছি বাঘের সম্ভাব্য চলাফেরার পথে দু-জায়গায় দুটি বাচ্চা মহিষ বাঁধবার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। কিন্তু বাঘ সেসব ছোঁয় নি। একবার নরমাংসের স্বাদ পেলে বাঘের সাধারণত অন্য মাংসে বিশেষ রুচি থাকে না। এবং একজন কাঠুরে ইতিমধ্যে বাঘের হাতে প্রাণ দিয়েছিল। তাই, মোষের বাচ্চাগুলিকে যথাস্থানে দেখে হতাশ হয়ে যখন গল্পকথক ভাবছেন—'মানুষখেকোটাকে প্রলুব্ধ করবার উপায় আর কী আছে।' (পৃ. ৫২, ঐ) এই সময় তিনি দেখেছেন জঙ্গলের বাংলোতে 'রঙীন শাড়ি' মেলা (ঐ)। বাংলোয় পৌঁছে তিনি দেখলেন—'যমুনাপ্রসাদ সস্ত্রীক আজ সকালেই আমি যখন মহিষ শাবকদের খবর নিতে বেরিয়েছি তখন একটা জীপ নিয়ে এসে ফরেস্ট বাংলোয় উঠেছে।' (পৃ. ৫৩, ঐ) এইখানেই তৈরি হয়েছে একটি ত্রিমাত্রিক প্রেমের গল্প। যমুনাপ্রসাদের স্ত্রী, সুভদ্রা, যমুনাপ্রসাদ এবং কথক এই তিনজনের সম্পর্ক নিয়ে একটি কাহিনি তৈরি হয়ে উঠেছে—'আমাদের ব্যবহার দেখলে যে কেউ মনে করতে পারত যে তাদের এখানে আসাটা নিতান্ত সাধারণ স্বাভাবিক ব্যাপার।' (পৃ. ৫৩, ঐ) কিন্তু অস্বাভাবিকত্ব ধরা পড়ে তাদের ব্যবহারে। সুভদ্রা এখানেই এড়িয়ে গিয়েছে কথককে। যমুনাপ্রসাদ যা একটু আলাপ করেছে তাও তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে। এরপরেই দেখা যাচ্ছে কথাবার্তার মাঝখানে—'যমুনাপ্রসাদ হঠাৎ অস্বাভাবিক উচ্চস্বরে হেসে উঠে বললে, 'সুভদ্রা যে আমার সঙ্গ ছাড়তে চায় না। ও নিজে জোর করে এসেছে কিনা জিজ্ঞাসা করো।' (ঐ) আর কথক সুভদ্রার দিকে তাকিয়ে দেখেছেন সে মুখ ঘুরিয়ে রেখেছে—'সেই এক মুহূর্তে তার চোখে যা দেখলাম তা অশ্রুর আভাস না বিদ্যুৎ বহ্নির

জ্বালা বোঝা গেল না।' (ঐ)। কথাবার্তায় ইতিমধ্যে কথক বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে সুভদ্রাকে এখানে আনা ঠিক হয়নি। এবং বলেছেন—'মানুষখেকো বাঘেদের মধ্যেও তফাত থাকে, হিংস্র শয়তানিতে এ বাঘটার তুলনা মেলা ভার।' (ঐ) এই হিংস্রতা ক্রমে মিলে যাবে অন্ধকার অবচেতনের সঙ্গে আর যমুনাপ্রসাদ ঠাট্টা করেছে 'বাঘের খোরাক' হবে বলে। আর কথক বলেছেন সুভদ্রাকে রেখে আসতে। এরপরে 'নিজের ঘরে যাবার পথে খোলা দরজা দিয়ে পাশের ঘরে সুভদ্রাকে দেখতে পেলাম। দরজার দিকে পেছন ফিরে জানালার ধারে পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে সে দূরের পাহাড় জঙ্গলের দিকে চেয়ে আছে।' (পৃ. ৫৪, ঐ) এই অবস্থান তাদের কথাবার্তা কথকের সাথে সুভদ্রার পরকীয়া সম্পর্কের ইঙ্গিত দিয়েছে। যমুনাপ্রসাদের আচরণে তার বিরাগ, ঈর্ষা এসবও ধরা পড়েছে। এরপরেই তারা শিকারে যাচ্ছেন এবং অপেক্ষা করছেন বাঘের জন্য। নির্বোধ উগ্র যমুনাপ্রসাদ এতে আপত্তি জানালে কথক বলেছেন এই নির্বুদ্ধিতার অর্থ আত্মহত্যা—'আত্মহত্যা করতে চাই —কে তোমায় বললে,' (ঐ) একগুয়ে যমুনাপ্রসাদ বলেছে এবং যমুনাপ্রসাদ আরও বলেছে—'তোমার এই মানুষখেকো বাঘকে আমি এক বারের জন্য তাকে নিয়তির পদে বসাতে চাই।' (ঐ)

এভাবেই ঘটনাচক্রে বাঘ নিয়তি, হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এরই মাঝে যমুনাপ্রসাদের জেদে তাদের যেতে হয়েছে ফরেস্ট বাংলোয় এবং তখন 'সাজসরঞ্জাম নিয়ে বেরুবার সময় দেখলাম সুভদ্রা নীরবে এসে বারান্দার ধারে দাঁড়িয়েছে। তার বেশভূষাটা ওই অবস্থায় সত্যি চমকে দেবার মতো। উজ্জ্বল কমলা রঙের শাড়িটা তার সুঠাম দীর্ঘ দেহটাকে যেন আগুনের শিখার মতো বেষ্টন করে উঠেছে।' (পৃ. ৫৫, ঐ) এখানে যেন সুভদ্রার সাজ রহস্যময় ও প্রতীকী হয়েছে, কেননা কথক উল্লেখ করেছেন সবিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে তিনি দেখেছেন তার দৃষ্টিতে কোন চেতনা নেই। 'দেহের ওই শিখার আগুনে তার মন যেন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।' (ঐ) এরপর যখন নিস্পন্দ হয়ে মাচালে বসে অপেক্ষা করেছেন তারা এবং তখন 'সূর্য অস্ত গিয়ে অন্ধকার নেমে আসছে 'কালো যবনিকার মত।' (ঐ) আর জংলী মোরগগুলো শেষবার ডেকে উঠেছে সেখানে যেন মৃত্যুময় হয়ে উঠেছে অন্ধকার আর ঝিঁঝির আওয়াজের সঙ্গে থেকে রাতচরা পাখিদের ডাকের চমক। এই অন্ধকার যেন দমবন্ধকর অথচ নিশ্চিত মৃত্যুর মতই। এরপর যখন দশটা বেজে গেছে তখন বাঘের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। এরপর

হঠাৎ কথকের মনে হচ্ছে— 'যমুনাপ্রসাদেরই সে কি সন্ধান পেয়েছে? নিঃশব্দে গুঁড়ি মেরে যাচ্ছে তাকে আক্রমণ করতে!' (ঐ) তখন আসন্ন কোন মৃত্যু যেন অনুভূত হচ্ছে কথকের মাচান থেকে পায়ে পায়ে নেমে এগিয়ে যাচ্ছেন কথক তার ভেতরকার কোন অনুভূতিতে সাড়া দিয়ে—'মনে হয়েছিল মৃত্যুর সঙ্গে জুয়া খেলতে আমিও পারি জটিল দুশ্ছেদ্য আমাদের হৃদয়ের সমস্যার গ্রন্থি মোচনের সুযোগ নিয়তিকে দিতে।' (পৃ. ৫৬, ঐ) এই অনুভূতি থেকেই যেন তার অন্বেষণ এবং সেখান থেকে অগ্রসর হয়ে কথক যমুনাপ্রসাদকে দেখতে পাননি — 'সেখানে তার জলের ফ্লাস্ক আর কম্বলটা শুধু পড়ে আছে।' (ঐ) অথচ 'কোথাও এতটুকু রক্তের দাগ নেই।' (ঐ) অর্থাৎ নিঃশব্দ অথচ ভয়ংকরভাবে কিছু ঘটেছে তার ইঙ্গিত এখানে রয়েছে কথকের এই উক্তি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে শ্বাপদের মত না হলেও জান্তব আদিমতা মানব মনেরও থাকতে পারে এবং এই সম্ভাবনাকে সত্যি করে—'বেশ কিছু দূরে আমাদের ফরেস্ট বাংলোর দিক থেকেই রাত্রি নিস্তব্ধতা কাঁপানো একটা হুঙ্কার শোনা গেল। সেইসঙ্গে অস্ফুট একটা আর্তনাদ।' (ঐ) এবং 'নিয়তির সঙ্গে জুয়ায় মৃত্যুর বলি হলাম, আমরা নয়, সুভদ্রাই। (ঐ)। এখানে সুভদ্রাই নিয়তির হাতের বন্দী। আর বাংলো থেকে কিছুদূরে তার জঙ্গলের কাটায় আটকানো আগুন রঙা ছিন্ন শাড়ি ঐ রাত্রে তার জঙ্গলের দিকে আসার প্রমাণ। গল্পকথনের সাক্ষ্যরূপে শেষ বাক্য তাৎপর্যপূর্ণ। যমুনাপ্রসাদকে সে কথা তিনি জিজ্ঞেস করতে পারেন নি, কেন সে মাচান ছেড়ে নেমেছিল, কথক বলেছেন, সাক্ষাৎ নিয়তি সেই বাঘ মেরেছিল সে নিজে। এখানে নিয়তিস্বরূপ যমুনাপ্রসাদ ও হিংস্র পাশবিক ব্যাঘ্র চেতনা অভিন্ন। যমুনাপ্রসাদের অতৃপ্তি ও সন্দেহই তার ভেতরের অসূয়াকে জাগ্রত করেছে, সেখানে সেই সুভদ্রার নিয়তি স্বরূপ। এভাবেই প্রতীকায়িত হয়েছে কাহিনি। বনের বাঘ নয়, যমুনাপ্রসাদের সুপ্ত পৌরুষ যেন হিংস্র পাশব স্বরূপে অবতীর্ণ এখানে।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ও 'সামনে চড়াই' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'লেভেল ক্রসিং' গল্পের কেন্দ্রিয় বিষয় রুইদাসের অনমনীয় ব্যক্তিত্ব। রুইদাস লেভেল ক্রসিং এর পাহারাদার বা রক্ষক, কিন্তু সে তার সামাজিক অবস্থানের দিক থেকে দরিদ্র, অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের মানুষ। কিন্তু শ্রেণীগত এই অবস্থান সে স্বীকার করে না তাই সীমা অতিক্রম করে পৌরুষের পরিচয় দেয়। গল্পের শেষে রুইদাসের অনুভবে সে বিষয়েরই পরিচয় পাওয়া যায়— 'তবু হঠাৎ তারা যেন এইটুকু আবিষ্কার করে অবাক হয়ে গেছে,

মাথাটা উঁচু করে রাখবার জন্যেই ঘাড়ের ওপর বসান, মাটিতে লুটোবার জন্যে নয়।' (পৃ. ৩০২, লেভেল ক্রসিং, প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প, ১ম খণ্ড)। এভাবেই শ্রেণীসীমা অতিক্রম করার মধ্যে বিষয়টি প্রতীকী হয়ে উঠতে থাকে। কিভাবে এই সীমানা অতিক্রম করে যাচ্ছে রুইদাস, গল্পসূচনা থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। যেমন, গল্পের সূচনাতেই আছে— রুইদাস এসেছে কামাক্ষা ডাক্তারের কাছে স্ত্রী রাখালীর ম্যালেরিয়ার ওষুধ নিতে। এবং এসেই সে বলেছে—'বলি কেমন ধারা ভেজাল বড়িগুলো দিচ্ছ বটে ডাক্তার, একমাস হয়ে গেল জ্বর আর গেল নি। কুইনাইন, টুইনাইন কিছু নাই বুঝি—খালি নিমপাতা বাটা।' (পৃ. ২৯৬, ঐ) রুইদাসের এই 'বেয়াড়া' কথাবার্তা তার চারপাশের লোকজন সকলেই জানে। তাই কামাক্ষা ডাক্তারও তা গায়ে মাখত না। অথচ কামাক্ষা ডাক্তারের সঙ্গে রুইদাসের অবস্থাগত প্রভেদ অনেকটাই। কিন্তু সেদিন চালকলের মালিকের ভাগনে ও ম্যানেজার বনোয়ারীলালের সামনে রুইদাসের বেফাঁশ কথায় প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে কামাখ্যা ডাক্তারও। এবং তার অবস্থার প্রতি বিদ্রূপও শানিয়েছে কামাক্ষা ডাক্তারও—'ভারি আমার লেভেল ক্রসিং-এর জমাদার, তার আবার তেজ দেখ না। যা যা ব্যাটা এখানে তোর ওষুধ মিলবে না।' (ঐ)। এরপরে কামাক্ষা ডাক্তার রুইদাসের হাত থেকে ওষুধ কেড়ে নেয়। রুইদাস হাঙ্গামা করলে এরপরেও বনোয়ারীলাল তাকে বিদ্রূপ করে —'আরে কোথাকার নবাব তুমি হে, কুইনাইন নিতে আসছো, কুইনাইন লাটবেলাট বলে পায় না।' (ঐ)। কিন্তু এতে রুইদাস আরও অশান্ত হয়ে ওঠে। এবং বেরিয়ে যায় 'হাতুড়ে' ডাক্তার কামাক্ষার ঘর থেকে। কারণ, সে দায়িত্ববান, আর তাই, 'ইচ্ছে থাকলেও আর বেশিক্ষণ তার থাকার উপায় নেই। এক্ষুণি গিয়ে একটা মালগাড়ি পাস করাবার জন্যে গেট বন্ধ করতে হবে।' (পৃ. ২৯৭, ঐ) কাজ সামান্য হলেও রুইদাস নিজের কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ, সচেতন। অথচ নিজের ব্যবহারে সে পরে নিজেই লজ্জিত হয়। সে যখন প্রায় ছুটতে ছুটতে গুমটি ঘরের দিকে তখন সে ভেবেছে, 'কোথা থেকে কি যে হয়ে গেল! কেনই বা এমন হয়ে যায়।' (ঐ) নিজের দুর্বিনীত আচরণ কিন্তু চিহ্নিত করতে পারে রুইদাস, তাকে ব্যাখ্যা করতে পারে না সে। অথচ সে ভেবেছিল যে ডাক্তারের হাত ধরে অনুরোধ করে বলবে 'একটা তেজী কিছু ওষুধ দাও ডাক্তার যাতে একবার চোখ মেলে জেগে ওঠে। ও যে চোখ মেলে চাইতেও ভুলে গেছে।' (ঐ) । সে জানে কামাক্ষা ডাক্তার ভালো মানুষ। কামাখ্যা ডাক্তার ছাড়া আর

গতিও নেই—'গরিবের ঘরেই তার পসার। গরিবের সুখ-দুঃখ অভাব-অনটন সে বোঝে। ভিজিট পেলে নেয়, না পেলে খেতের লাউ, বেগুন দিয়ে এলেও ব্যাজার হয় না।' (ঐ) অথচ দুর্মুখ রুইদাস তাকেও অপমান করে। এজন্য রুইদাসের আপশোসের সীমা নেই। তবু, হঠাৎ সে উত্তেজিত হয়, এবং অপমান করতে তার দ্বিধা হয় না তখন। রুইদাসের মানসিক এই অবস্থার জন্য তার পরিবেশেরও দায় যথেষ্ট। অসুস্থ স্ত্রী, ছোট গুমটি ঘর এখানেই তার সংসার—'রেল লাইনের পাশে লাল টালিতে ছাওয়া ছোট্ট একটি ঘর। একটা মানুষ হাত পা গুটিয়ে কোনরকমে শুতে পারে। এরই ভিতর রুইদাসের গোটা সংসার কুলোতে হয়। সংসার বলতে অবশ্য এখন তার রুগ্না স্ত্রী রাখালী। সেও একটা ছাগলী। ঘরের পেছন দিকে একটা টিন হেলান দিয়ে একটা ছাউনি মত করেছে সেইখানেই রান্না হয়।' (ঐ) আর, অসুস্থ স্ত্রী রাখালী সেখানে জ্বরে বেহুঁশ, ঘরটায় জলে থইথই অবস্থা, উলটানো কলসী সবই রুইদাসের অসহায়তাকে ব্যক্ত করেছে। এরই মাঝে আছে রুইদাসের কর্তব্যপরায়ণতা—'জলটা ঝেঁটিয়ে এখুনি বার করে দিলে ভাল হয়। কিন্তু সময় নেই। রুইদাস রাখালীকে টেনে বিছানার অন্যদিকে একটু সরিয়ে দেয়। রাখালী অস্ফুট কিরকম একটা শব্দ করে মাত্র। (ঐ) এরপরেই বিরক্ত রুইদাস যেন শুনতে পায় দূরের রাস্তায়—মোটরের রুদ্ধ আক্রোশ, রুইদাস দেখে মোটর লরি আসছে ফুলডুংরি থেকে। এসময় তার বিরোধ বাধে ড্রাইভার সাধন সিকদারের সঙ্গে। 'সিকদার প্রথমটা কড়া মেজাজে বলে গেট নামালে যে বড়। হর্ণ দিচ্ছি শুনতে পাও না'? (পৃ. ২৯৮, ঐ)। তারপরে সুর নরম করে তাকে অনুরোধ করে 'একটি দিন শুধু ছেড়ে দে রুইদাস। সকাল আটটার মধ্যে একটা খেপ পৌঁছে দেবার কথা। নটা প্রায় বাজে। কন্ট্রাক্টরের নতুন সরকার এসে অবধি আমার পেছনে লেগেছে। আজ বাগে পেয়ে চাকরিটা খতম করে ছাড়বে।' (ঐ) রুইদাস আর্দ্র হয়েও খিচিয়ে ওঠে। আবার তাকে আক্রমণ করে সিকদার — 'ভারী রেল গেটের জমাদার হয়ে ধরাকে একেবারে সরা জ্ঞান করিস। কিন্তু এ তেজ তোর ভাঙবে, আর দেরি নেই। (ঐ) রুইদাস তার মনে মনেই স্বীকার করে ঘাড় হেঁট করতে পারে না বলেই তার সাথে সকলের বিরোধ — 'নোয়ানো মাথার মাপে দুনিয়ার সব দরজা যখন কাটা তখন মাথা সোজা করে কোনখানে তার জায়গা মিলবে।' (ঐ) এবং এই আত্মাভিমানে সে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এইভাবে প্রতীকী হয়ে উঠতে থাকে লেভেল ক্রসিং ও তার পাহারাদার রুইদাস। গল্পে রুইদাস এই লেভেল

ক্রসিং-এর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে উঠতে থাকে। রুইদাসের ভাবনায় উঠে এসেছে সেই কথা—'ধান কাটতে যাকে নুইতে হয় তার মাথা যে আর কোথাও তোলবার নয়, সেটা তার বোধগম্য হয় নি।' (ঐ)। চাষবাস সে করেনি এবং পয়েন্টসম্যান থেকে নেমে সে দাঁড়িয়েছে লেভেল ক্রসিং-এ ওপরওয়ালাদের সঙ্গে তার বনিবনা হয় না। সমান সমানেও মিলিয়ে চলতে পারে না সে। বর্তমানে তার কোনঠাসা অবস্থানটা তৈরি করতে পেরেছে সে নিজের কারণে। তার নির্বাসনের রাজ্যে কারো সঙ্গে ঠোকাঠুকির অবকাশও নেই। কিন্তু ইতিমধ্যেই রুইদাসের ঝামেলা বাধে স্বয়ং হাকিমের সঙ্গে। অনুরোধ, উপরোধ, আদেশ অমান্য করে রুইদাস। প্রথমে চাপরাশির ধমক—'ওদিক পানে যাচ্ছ কোথায় হে, গেটের চাবি খুলে দাও।' (পৃ. ২৯৯, ঐ)। তারপরে হাকিমের কাছে রুইদাসের দরবার—'দয়া করে একটা সই করে দেন হুজুর। কুইনাইন অভাবে বউটা মরতে বসেছে ...।' (পৃ. ৩০০, ঐ)। রুইদাস অতিক্রম করে গেছে তার সীমানা। স্বীকার করেনি পদমর্দাদার স্বাতন্ত্র্য। আর হাকিম সাহেব ভ্রূকুটি করে এতে বিরক্ত প্রকাশ করলেও রুইদাস থামেনি। এরপর হাকিম সাহেবের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে—'তবু নিজেকে সামলে গম্ভীরভাবে বলেন, 'মালিককেও আইন মানতে হয় বুঝেছ, যাও এখন গেটটা খুলে দাও গিয়ে।' (পৃ. ৩০৪, ঐ)। রুইদাস তবু গেট খোলে না, বলে—'মাপ করবেন হুজুর পারব না। আইন মালিককেও মানতি হয়।' (ঐ) প্রতিস্পর্ধায় সে অনন্য হয়ে ওঠে। এরপর রুইদাসের সঙ্গে চাপরাশি আর্দালির মারামারি লাগে—'এতগুলো মানুষ তার চারিধারে ভিড় করে এসেছে সবাই তার বিপক্ষে সে জানে ... কিন্তু তবু হার সে মানবে না কিছুতেই। এখনও গেটের চাবি তার কাছে। সে চাবি দেবে না প্রাণ থাকতে।' (পৃ. ৩০১) এরপরে পালিয়ে বেড়ায় রুইদাস। পণ করে নিজেকে শোধরাবে। তাই বাড়ি ফেরে সে রাতের অন্ধকারে—'রাখালীকে একবার দেখে সে হাকিম সাহেবের কাছে গিয়ে ধরা দেবে। মাটিতে মাথা লুটিয়ে মাপ চাইবে। যা শাস্তি নেবার নেবে।' ঘাড় আর সে জীবনে সোজা করবে না।' (পৃ. ৩০১, ঐ)। কিন্তু তখন সে দেখে তার চারপাশের মানুষগুলি আমূল পরিবর্তিত হয়েছে। সিকদার, কামাখ্যা ডাক্তার তাকে পরামর্শ দেয়। তার পাশে দাঁড়ায়। সিকদার তাকে নিয়ে চলে যেতে চায়—'সিকদারের যা হোক একটা চুলো তো আছে। সেখানে তার বউ ছেলেমেয়ের জন্য যদি দুমুঠো জোটে তাহলে রুইদাসের বউকেও উপোসী থাকতে হবে না।' (পৃ. ৩০২, ঐ)।

এইভাবে প্রত্যেকে নিজেদের সীমা উত্তীর্ণ হয়ে রুইদাসের পাশে দাঁড়ায়। তাদের একতার মাঝখানে প্রতীকী হয়ে ওঠে লেভেল ক্রসিং—'রুইদাসকে তারা বিষ নজরে দেখে না। তার বেয়াড়া ঘাড় তার ঝাঁঝালো তেতো মুখ তারা যেন নতুন একদিক থেকে দেখেছে।' (পৃ. ৩০২, ঐ)। এভাবেই রুইদাস ও লেভেল ক্রসিং তাৎপর্যে প্রতীকায়নে সার্থক হয়ে ওঠে।

মনস্তাত্ত্বিক গল্প—

প্রেমেন্দ্র মিত্রের বেশ কিছু গল্প আছে যেগুলিকে চিহ্নিত করা হয় রহস্য গল্প বলে। প্রেমেন্দ্র রহস্য রোমাঞ্চ গল্প লিখেছেন। সেগুলি স্বতন্ত্র বিচারের যোগ্য। কিন্তু আমাদের ছোটগল্পের এই আলোচনায় আমরা সেগুলিকে রহস্যমূলক গল্প বলে উল্লেখ করছি না। কারণ, প্রেমেন্দ্রের যে মানসিকতা যেখানে বৈজ্ঞানিক চেতনা ও যুগকালীন রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য অনুসৃত হয়েছে—আর মানুষের মানবিক সম্পর্কের জটিলতা, মানবমনের বিভিন্ন কোণগুলি এই সূত্রেই তার গল্পে বিষয় হয়ে উঠেছে। মানবমনের জটিলতর দিকগুলি যেখানে অত্যন্ত তীব্রভাবে গল্প চরিত্রগুলিকে প্রভাবিত করেছে, সে গল্পগুলিকে আমরা রহস্য না বলে মনস্তত্ত্ব নির্ভর গল্প বলে সংজ্ঞায়িত করতে চেয়েছি। 'দেয়াল' এমনই একটি গল্প। গল্পটির কেন্দ্রে রয়েছে বিমান। কর্মসূত্রে বিদেশে এসে বিমান ভাড়ানেয় এমন একটি বাড়ি, যে বাড়ির দেওয়ালে কান পাতলে সে শুনতে পায় নানা অশরীরী কথাবার্তা। এই অশরীরী সংলাপের পর চরিত্রগুলিকে সে কল্পনা করতে থাকে। এবং কল্পনায় তাদের ছবি ভাসতে থাকে দেয়ালে। বিভ্রান্ত বিমানের জীবনের সঙ্গে মিলে যায় ক্রমে সেই অশরীরী সংলাপগুলি। উত্তেজিত বিমান সিঁড়ি দিয়ে নামতে গেলে তার পদস্খলন ঘটে। আপাতভাবে দেখতে গেলে দেয়ালে ছবি দেখা মানসিক দুর্বলতার লক্ষণ এবং তা রহস্যজনকও বটে। কিন্তু, সেই রহস্য দুরীভূত হয়, যখন দেখা যাচ্ছে বিমানের জীবনের সঙ্গে কথিত সংলাপগুলি মিলে যাচ্ছে। আসলে বিমানের অবচেতন মন একদা যা দেখতে চেয়েছিল তাই সে দেখেছে অশরীরী সংলাপে দেয়ালের মধ্যে। এই দেয়াল আক্ষরিক অর্থেই বিমানের মনের দেয়াল। এক অর্থে এই দেয়াল ব্যবধানের প্রতীক এবং অন্য অর্থে দেয়াল মনের দর্পণও হয়ে উঠেছে, কিংবা একে মনের ক্যানভাসও বলা যেতে পারে, যেখানে পূর্বপরিচিত চরিত্রগুলির ছবি ফুটে উঠেছে। গল্পের সূচনায় দেখা যাচ্ছে 'বিমান প্রতিদিনই

কতবার যে দেয়ালটার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় তার ঠিক নেই। রাত্রে খাওয়া দাওয়া সেরে আসবার পর তো বিশেষ করে।' (পৃ. ৩১৮, দেয়াল, প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প, ৩য় খণ্ড) আর লেখক স্পষ্টই উল্লেখ করেছেন যে 'এখন যেন ব্যাপারটা অভ্যাস হয়ে গেছে কিংবা একটা নিত্যনৈমিত্তিক অনুষ্ঠান গোছের।' (ঐ) অর্থাৎ এটা পরিষ্কার যে এই অভ্যাস কার্যত বিমানের মানসিক বৈকল্যের জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছে। আর এইসাথে উল্লেখিত হয়েছে একটি সিঁড়ির কথা—'যে নড়বড়ে সিঁড়িটা দিয়ে তার ঘরে পৌঁছতে হয়, সেটার একটা ধাপ আলগা হয়ে গেছে। একটু হঠাৎ পায়ের চাপে বেঁকে গেলে একটা দুর্ঘটনা হয়ে যেতে কতক্ষণ।' (ঐ)। এ বিষয়টি প্রতীকী। কাঠের সিঁড়িটা তার নড়বড়ে অবস্থানে বিমানের মানসিক দুর্বলতারই প্রতীক হয়ে উঠেছে। অথচ যে ঘরে বিমানের বাস এই সিঁড়ির ধাপ বেয়েই তাকে উঠে আসতে হয় সেইঘরে। দুর্বলতর মানসিকতা ক্রমে অসুখে পৌঁছে যায় বিমানের। তাই —'নিজের ঘরে উঠে এসেই দরজাটায় খিল লাগিয়ে দেয় বিমান। তারপর উত্তর আর পুবের জানালা দুটোর একটা করে পাল্লা দেয় ভেজিয়ে। পাল্লা ভেজিয়ে দেবার কিছু দরকার আছে এমন নয়।' (ঐ)। এরপরে সে নিত্যনৈমিত্তিক যে কাজটা করে তা হল জানলার পাল্লা দুটো টেনে ভেজিয়ে দেয়ালটার কাছে গিয়ে দাঁড়ানো। অথচ 'বাইরে থেকে দেখতে প্রায় যান্ত্রিক রুটিন হয়ে এলেও ভেতরের দিক দিয়ে তা নয়। বিমান যেন দেয়ালটার কাছে গিয়ে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে অন্য মানুষ হয়ে যায়।' (ঐ) এ বিষয়টি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষত রুটিন নয় সেখানেই বিমানের এই অন্য মানুষ হয়ে ওঠা। তার ভেতরের মানুষটিকে বাইরে টেনে এসেছে এটি। অথচ প্রাত্যাহিক যান্ত্রিকতা সে ভুলতে পারে নি—'বিকেলের দিকে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েই তাকে নিতান্ত অনিচ্ছায় যখন চলে যেতে হয় তখন সে এক একদিন অদ্ভুত কাণ্ড করে বসে। দরজায় তালা লাগিয়ে নেমে যেতে যেতে কাঠের সিঁড়ি থেকেই আবার ফিরে আসে।' (পৃ. ৩১৯, ঐ)। এরপর আবার দরজার তালা খুলে সে গিয়ে দাঁড়ায় দেয়ালটার সামনে। ক্রমে দেয়ালটা যেন তার নিজস্বতায় আয়না হয়ে উঠতে থাকে, হয়ে উঠতে থাকে একটা অবয়ব, অন্তত বিমানের কাছে তাই-ই —'দেয়ালটা এখন তার নিজের মুখের চেয়ে বেশি চেনা হয়ে গেছে অবশ্য। কোথায় কোথায় চুন বালি খসখসে নোনা ধরা, কি কি রকম দাগ হয়ে গেছে সব তার মুখস্থ। দেয়ালের অমসৃণ গোটা কোথায় কেমন টোল খাওয়া কি খোঁচা তোলা তাও সে সব স্থানে।' (পৃ. ৩১৮, ঐ)।

শুধু তাই নয়— 'ইচ্ছে করলে বিমান একে দিতে পারে হুবহু দেয়ালটা। এমনকী তার সঙ্গে বাঁধানো ফ্রেমের হলদে হয়ে আসা ছবিটা আর তার ওপরের নিয়ন লাইটের ব্রাকেটটাও।' (পৃ. ৩১৯) সে অবিকল চোখ বুজে দেখতে পায়। লেখক বলে দিচ্ছেন এসব 'নিজের অজান্তেই সে দেখে।' (ঐ)। এবং এখানেই মুদ্রিত হয়ে উঠছে অবচেতন মনের অন্ধকার। আর কোন কোনদিন এভাবেই সে লুকিয়ে ঢুকে পড়ে তার ঘরে, যাতে কেউ না দেখে ফেলে। এখানে তার মনের গহনে লুকিয়ে থাকা কোন অনুভূতিকে সে গোপন করতে চায়। সেই অনুভূতি তার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত, একক এবং নিভৃত। অদ্ভুতভাবেই বিমান তার জীবনে এই ঘটনাগুলি ঘটতে দেখে এরপর যখন সে নেমে যায় তখন কিন্তু 'তার মুখ দেখে তা বোঝবার উপায় নেই। খানিক নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে আবার দরজায় সিঁড়ি দিয়ে যখন সে নেমে যায় তখন তার মুখে হতাশার কোন ছায়া থাকে না।' (ঐ)। তখন সেই কেজো যুবক টিউশ্যানিতে যায়, ট্রাম কিংবা ভিড় বাসে পা রাখে, অথবা সিঁড়ির ব্যাপারে মোড়ের ফার্নিচারের দোকানে কথা বলে কিংবা বন্ধু হীরু ঘোষকে বলে নতুন বাসা খুঁজতে। হেসে ঠাট্টা করে বলে—'বাসাটির সুবিধে তো একটা নয়। দুতলার সিঁড়ি ভেঙে সিন্দুকের মত একটি চিলেকোঠার ঘর। তার এক প্রস্থ সিঁড়ি আবার কাঠের। থুথু ফেলতে হলেও সে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় নামতে হয়।' (পৃ. ৩১৯, ঐ)। কিন্তু চিলেকোঠার ঘরে ঢুকলেই সে অন্য মানুষ হয়ে যায়। রাস্তাঘাটে, বন্ধুবান্ধবদের কাছে, চেনাশুনা বিমান সরকার পরিবর্তিত হয় অন্য মানুষে — 'সিন্দুকের মত একটা অপ্রশস্ত চিলেকোঠার ঘর আর তার একটা দেয়াল তাকে অনিবার্যভাবে টানে।' (ঐ) অথচ চিলেকোঠার ঘরটি প্রথম থেকেই বিমানের অপছন্দ ছিল—'মুখে কিছু না বললেও বিমানের চোখের দৃষ্টিতেই তার বিরক্তি আর অবজ্ঞা ফুটে উঠেছিল।' (পৃ. ৩২০, ঐ)। বাড়ি দেখতে আসার সময় এ অবস্থায়ই ছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভাড়াটা সস্তা এবং টিউশনিগুলো সব কাছাকাছি হওয়া বিমান হিসেবী বিমান এতে মত দিয়েছিল। বলা যেতে পারে বাধ্য হয়ে বিমান এতে রাজি হয়েছিল। ক্রমে হীরু ঘোষ তার জন্যে চেষ্টা করেও নতুন বাসা জোগাড় করে দিতে পারে নি। আর বিমান হীরুকে জানায় নি সত্য কথাটা। 'জানায় নি যে মিনি মাগনায় রাজবাড়ি পেলেও সে এখন তার বাসা বদল করতে নারাজ।' (ঐ) আর 'শুধু একটা মাঝারি মাপের দেয়াল একটা দেয়াল ... তাই যেন ধীরে ধীরে সব দিক দিয়ে গোল হয়ে একটা কৌটোর মতো তাকে ফেলে আলাদা করে দিচ্ছে সমস্ত

সংসার থেকে।' (পৃ. ৩২০, ঐ) অথচ প্রথম দিন হীরু ঘোষই তাকে মজা করে বলেছিল যে দেয়ালে কান পাতলে মজার নাটক শোনা যাবে। নাটকটার আভাস দিয়ে হীরু বলেছিল—'জোড়ের পায়রার মতো দুজনের প্রেমালাপ।' (ঐ) আর বিমান প্রথম দিন শুনেছে 'মৃদু চাপা প্রায় চুপি চুপি বলার মতো ক্ষীণ সম্বোধন। ক্ষীণ কিন্তু অস্পষ্ট নয়।' (পৃ. ৩২১, ঐ)। এই মজার নাটক ক্রমে বিমানের ট্র্যাজেডি হয়ে উঠেছে, ক্রমে যেন এতে সে উত্তেজিত হয়েছে—'বিমানের পা দুটো যেন মেঝেতে আটকে গিয়েছিল মনের ভেতর অদ্ভুত একটা অনুভূতি ...'। (ঐ) এই অনুভূতি প্রথমে তার স্বপ্ন মনে হয়, মনে হয় শরীরী উপস্থিতি, ক্রমে দেয়াল স্তব্ধ হয়ে যায়, আবার হঠাৎই 'শব্দতত্ত্বের কোন দুর্জ্ঞেয় বিধিতে আবার সেই অলৌকিক ব্যাপার সম্ভব হয়।' (ঐ) শোনা যায় 'মধুর নারী কণ্ঠ' এবং পুরুষের স্থূলকণ্ঠ প্রায় শোনাই যায় না 'দেয়ালের সূক্ষ্ম ছাঁকনিতে আটকে যায়।' (ঐ) যখন কোন কণ্ঠ শোনা যায় না বিমান তখন অস্থির হয়ে ওঠে। ক্রমে তার ব্যক্তিজীবন, জীবনের গভীর অনুভূতি মিশে যায়, মিশে যেতে থাকে এর সঙ্গে—'দেয়াল ভেদ করে আসা কথাটা তার যেন এখন চেনা চেনা লাগে। সেই ইলার কি? গ্রামসেবিকা হয়ে কিছুদিনের জন্যে তাদের গ্রামে ও মনে যে একটা স্মৃতি রেখে গেছে?' (পৃ. ৩২২, ঐ)। দুর্জ্ঞেয় শব্দ, অলৌকিকতা এবং অস্পষ্টতর সেই যন্ত্রণা নিয়ে বিমান বেঁচে থাকে। তার মানসিক যন্ত্রণা যা বাইরের লোকের দুর্বোধ্য, যা বাইরে থেকে বোঝা যায় না দেখে, ক্রমে দেয়াল ও অন্যপাশের লৌকিক-অলৌকিক সংলাপে মনতত্ত্বগত জটিলতায় তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে গল্পটি ।

'শ্রাবণে ফাল্গুনে' (১৯৬৫ খ্রিঃ) গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'মন্দির' গল্পটির সময়কাল লেখক নির্দেশ করেছেন গল্পটির মধ্যে এইভাবে—'বহুদিন আগের কথা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধও শুরু হয় নি'। (পৃঃ ১৬১, মন্দির, প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প, ২য় খন্ড)। সময়ের একটা হিসেব এখানে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে কারণ, এখানে অনেকবার এসেছে 'অসূর্যম্পশ্যা নারী', 'ব্রাউনী ক্যামেরার' প্রসঙ্গ, সর্বোপরি সারারাত্রির অ্যাডভেঞ্চার এবং নির্জন মাইহার সারদা মন্দির প্রভৃতি। শেষদুটিকে এখানে সংযুক্ত করার কারণও সময় নির্দেশনা। এখন গল্পটির বিষয় বিস্তৃত করা যেতে পারে— গল্পটির প্রেক্ষাপটে রয়েছে মধ্যপ্রদেশ ও লেখকের অভিজ্ঞতা। বেড়ানোর উদ্দেশে লেখক গিয়েছিলেন মধ্যপ্রদেশের সাতনায় এক আত্মীয়ের বাড়িতে। সেখানে তাঁর সঙ্গে আলাপ অমরেশ ও কিষেণলালের। কিষেণলাল মধ্যপ্রদেশেরই ছেলে।

অভিজাত বংশীয়, পৈতৃক ব্যবসার কল্যাণে সে 'দস্তুরমতো ধনাঢ্য'। (ঐ)। অমরেশ প্রবাসী বাঙালী, অ্যাডভেঞ্চার প্রিয়। সাতনায় সেই প্রথম 'সাহস করে একটা ফোটোগ্রাফির দোকান খুলেছিল।' (ঐ)। ক্যামেরার ফিল্‌ম, ডার্করুমে ফিল্‌ম ডেভেলপ করা এনলার্জ করা—প্রভৃতির মাধ্যমে সে কিছু জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছিল। লেখকের ফটো তোলার শখ অমরেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছিল। অমরেশ, কিষেণলাল ও লেখক তিনজনেই ছিলেন সাহসী, অ্যাডভেঞ্চার প্রিয়। এর মধ্যে কিষেণলাল তার সমাজে মাত্রা ছাড়া রকমের আধুনিক ছিল। অন্যদিকে তার স্ত্রী অনাধুনিক, রক্ষণশীলতার প্রতিমূর্তি। সর্বোপরি রক্ষণশীল সমাজের মধ্যে যে রক্ষণশীল ভাবনার চূড়ান্ত রূপ তা গ্রহণ করে মেয়েটি 'অসূর্যম্পশ্যা' এই বিরোধ তাকে পীড়া দিত এবং তা ভুলে থাকবার জন্যই তার ছবি তোলার নেশা। আশ্চর্যের বিষয় তার স্ত্রী তার ফটোগ্রাফির ফ্রেমে ধরা দেয় নি। এই ছবি তোলার নেশায় তিনজন প্রায়ই অভিযানে বেরিয়ে পড়তেন। এইরকমই এক অভিযানে কিষেণলালের নাছোড়বান্দা আবদারে অন্য দুজন সঙ্গী হয় মাইহার—সারদা মন্দির যাত্রায়। কিষেণলাল মন্দির সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছিল মন্দিরে গিয়ে তা কিন্তু ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। যাত্রার পূর্বে কিষেণলালের 'বিশেষ জেদ' এবং যাত্রাকালে অস্বাভাবিক রুক্ষতা অন্য দুজনের অগোচরে ছিল না। মন্দিরে পৌঁছে দেখা যায় উৎসবের কথা যা বলেছিল কিষেণলাল তার চিহ্নমাত্র নেই, নির্জন প্রান্তর, অন্ধকারে নির্জনতর; লেখকের বর্ণনায়—'খাঁ খাঁ করছে চারিদিক। কোথাও একটা জনমানব নেই।' (পৃঃ ১৬৫, ঐ)। সেই বিশেষ তিথিতে এক বিশেষ উদ্দেশ্যে কিষেণলাল সেখানে গিয়েছিল—উদ্দেশ্যটা অভিসারের, তার স্ত্রী এই রাত্রে অবগুণ্ঠন সরিয়ে এখানে আসবে কথা দিয়েছিল। কিন্তু, কিষেণলালের স্ত্রী লছমীদেবী যে সে রাত্রে আসে নি এবং সেকথা পরে জানা গিয়েছিল। কিন্তু রহস্য ঘনীভূত হয়েছে এইখানে যে, অস্পষ্ট এক ছায়ামূর্তি দেখা পাওয়া গিয়েছিল—ক্ষীণ জ্যোৎস্না ছোঁয়া তরল অন্ধকারে যতটুকু দেখা যাচ্ছে, তাতে বেশবাস ও স্বচ্ছন্দ গতিতে সম্পূর্ণ আধুনিকা' (ঐ)। তিনি লছমী দেবী নন, কে তিনি তার উল্লেখ গল্পটিতে নেই স্পষ্টত। অধরামূর্তির সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে কিষেণলাল আচ্ছন্ন অবস্থায় আহতও হয়েছে। এরপর কিষেণলালের পরিবর্তন লক্ষণীয়। তার আধুনিকতা মুছে গিয়েছিল, এমনকি সাতনার বাস তুলে সে দিল্লিতে স্থায়ী নিবাসী ও সার্থক ব্যবসায়ী হয়েছে। শেষাংশটি তাৎপর্যপূর্ণ—'দিল্লিতে আসবার আগে পর্যন্ত সাতনায় কিষেণলালের পরম সুখের দাম্পত্য

জীবনই সে দেখে এসেছে। অসূর্যম্পশ্যা লছমী দেবী আধুনিকা হননি। পরিবর্তন তাঁর নয়, কিষেণলালেরই হয়েছে।' (পৃ. ১৬৬, ঐ)। 'পরিবর্তন' শব্দটি এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মনের পরিবর্তনটিই এখানে গুরুত্বপূর্ণ। রচনাটি প্রসঙ্গে অলৌকিকতা বিষয়টি বারবার ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু, প্রেমেন্দ্র মিত্রের বিজ্ঞানমনস্কতা অলৌকিকতাকে সমর্থন করে না। অলৌকিকতা গল্পে বিষয়মাত্রা যোগ করলেও দ্বন্দ্ব রেখেই গল্পটি শেষ হচ্ছে। অতিপ্রাকৃত গল্প বলতে যা বোঝায় 'মন্দির' গল্পটি তা নয়। এমনকী অলৌকিকত্ব সম্পর্কেও নিঃসংশয় হওয়া যাচ্ছে না। কারণ লেখাটির শুরুতেই লেখকের উক্তি—'সেই বয়সে এই ঘটনাটা মনকে গভীরভাবে নাড়া যে দিয়েছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। যুক্তিবাদ তখন শুধু জীবন-দর্শনের একটা পথ নয়, সেটা যেন সব কিছুর বিরুদ্ধে আস্ফালন করে প্রয়োগ করা হয়।' (পৃঃ ১৬৪, ঐ)। এই উক্তিতে যুক্তিতেই গুরুত্ব আরোপ হয়েছে, তবে 'অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতাকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টাও বোধহয় মনের সততায় ঠিক নয়'। (ঐ)। এখানে দুটি জিনিস গুরুত্বপূর্ণ—প্রথমটি অভিজ্ঞতা, যা অস্বস্তিকর। দ্বিতীয়ত, উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টার অসসতা অর্থাৎ অভিজ্ঞতাকে স্বীকৃতি দিয়েও মান্যতা সম্পর্কে সন্দেহ আছে লেখকের নিজেরই। এই সংশয়টিই তিনি গল্পের মধ্যে ছড়িয়ে রেখেছেন, বিষয় প্রাধান্যেই এই সংশয় জোরালো হয়েছে এবং লেখাটিও শেষ হয়েছে অমীমাংসিতভাবে, প্রেমেন্দ্রের অন্যান্য অনেক গল্পের মতই। রহস্য যা তা ঘনীভূত হয়েছে কাহিনীকে কেন্দ্র করেই, বাইরে থেকে তা আরোপিত হয় নি।

মনের সূক্ষ্ম বিবর্তন, পরিবর্তনগুলিও এখানে লক্ষণীয়। লছমী দেবীকে ভেবে যে ছায়ামূর্তির দেখা পেয়েছিলেন তিনজন পুরুষ সেই ঘটনাটির ব্যাখ্যা হয়ত সম্ভব হয়, এমনকি বলা অসম্ভব যে মেয়েটি সত্যিই সেখানে ঝাঁপ দেওয়ার পর তাকে দেখা যায় নি কেন? এই অসংখ্য কেনই প্রেমেন্দ্রের গল্পের উপভোগ্য উপকরণ। এক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় হয়নি। মেয়েটির পতনের পর কিষেণলালের পদস্খলন হয় এবং পরিবর্তনও দেখা দেয়। রোমান্টিকতা গল্পটির অন্তরালে স্বতঃপ্রহমান। কিষেণলালের যে অস্থিরতা ছিল, যে আগ্রহ ছিল অনাধুনিক স্ত্রীকে সংস্কারমুক্ত করে তোলার, তাই তাকে ছুটিয়ে এনেছিল মাইহার সারদা মন্দিরে। জ্যোৎস্না রাতে যে অভিসার হওয়ার কথাই ছিল এবং যে অভিসার হতেই পারত রোমাঞ্চকর—তার পরিবর্তে মুহূর্তের জন্য কিষেণলালের চোখে যে দৃশ্য ধরা পড়ল তা অলীক,

এবং স্বপ্নময়তা ভেঙেও গেল রহস্যময়ীর পাহাড় চূড়া থেকে পতনে—অলীক দৃশ্যসজ্জার এখানেই শেষ, বাকিটা কল্পনা, বিমূঢ়তা, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচল। গল্পকথক এখানে সম্পৃক্ত নন। বিচারের ভার পাঠকের উপর ছেড়ে দিয়েই তিনি নিরাসক্ত। প্রেমেন্দ্রের গল্প কৌশল ও প্রকরণ প্রসঙ্গে বিষয়টি বিস্তৃত করা হবে। শুধু এইটুকু বলাই যায় যে গল্প বলা অসমাপ্ত রেখে গল্প বিচারের দায় পাঠকের হাতে তুলে দেওয়া প্রেমেন্দ্র মিত্রের বিশিষ্ট কৌশল। এক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযুক্ত হয়েছে। গল্পের শেষে দেখানো হয়েছে কিষেণলালের মানসিক পরিবর্তন। মনের গতিবিধি নিয়ে যে লেখকের কারবার সেখানে মনই গুরুত্বপূর্ণ তা সে আলোকপ্রাপ্ত হোক বা অন্ধকারময়। এখন, বাকি রইল স্বপ্নময়ীকে দেখার অলীকদৃশ্যটি। আমাদের মনে হয় বিশ্বাস-অবিশ্বাসের বাইরে গিয়ে সে বিচার শুধুই গল্পের হাতে। অর্থাৎ এর সত্যতা একাধারে যেমন প্রামাণ্য নয় তেমনি তা অস্বীকারেরও নয়।অন্তত গল্পলেখক তো তাই বলেছেন— 'ঠিক কঠোর যুক্তিবাদী মানুষ বলতে যা বোঝায়, তা হয়তো আমি নই, কিন্তু অলৌকিক অশরীরীগোছের ব্যাপার সম্বন্ধে আমার সহজাত সংশয় চিরকালই আছে।' (পৃঃ ১৬১, ঐ)। আর এভাবেই গল্পের বুনন দৃঢ়তর হয়েছে, গল্পের প্রয়োজনে যে উপকরণ আসার তা এসেছে। তা মূল্যায়ন ও বিচার অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ তবে তার পাথুরে প্রমাণ দেবার ক্ষমতা প্রেমেন্দ্র মিত্রের মত বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়, তাই বলে গল্পটি রহস্যপূর্ণ নয় সেকথা নিশ্চিত ভাবেই তাঁর উক্তি প্রমাণ করেছে।

'ছায়াকায়া' গল্পের সূচনায় এসেছে 'নির্মম নিয়তি'-র প্রসঙ্গ। এই নিয়তি যা দুর্লঙ্ঘ্য তা মানুষের স্বভাবের মধ্যেই নিহিত। এই মানবিক জটিলতা মনের মধ্যেকার অন্ধকারে স্থান পায়। আলোচ্য গল্পটি প্রেমের গল্প হিসেবে নির্দিষ্ট হতে পারত কিন্তু তা হল না চরিত্রগুলির মানসিক জটিলতায়। নিয়তি নয়, মানবমনই যে ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করে গল্প সূচনায় আছে তারই ইঙ্গিত—'যে সূত্র একদিন অকস্মাৎ অকারণে ছিঁড়ে যায় তাই আবার নতুন করে অপ্রত্যাশিতভাবে জুড়ে দেবার মধ্যে কোনো পৈশাচিক কৌতুকও হয়তো তার নেই। যে নিষ্ঠুরতা যে পরিহাস তার ভেতরে আমরা পাই সে বুঝি শুধু আমাদের দৃষ্টির বিভ্রম।' (পৃ. ৭৫, ছায়াকায়া, প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প, ৩য় খণ্ড) গল্পটি পুরন্দর ও মীরাকে নিয়ে লিখিত—'একদিন অত্যন্ত কাছাকাছি তারা যেমন এসেছিল দুর্জ্ঞেয় কোনো জীবন স্রোতের আবর্তে'

(ঐ) এই 'দুর্জ্ঞেয়' গোপনতাই রহস্য, এই রহস্য মনের , যার সমাধান, ব্যক্তি মানুষ নিজেও জানে না। মীরার প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণে পুরন্দর তাকে জয় করতে চেয়েছিল, সেটাই ছিল তার কঠিন সংকল্প। অন্যদিকে, সে এসেছে মীরার দিদি প্রমীলার চিকিৎসক হিসেবে—'সবে তখন নতুন ডাক্তার হয়ে ফিরেছে বিদেশ থেকে। মীরার দিদি প্রমীলাই চিকিৎসক হিসাবে তার প্রথম কঠিন পরীক্ষা।' (ঐ) পুরন্দর নিয়মিত যেত প্রমীলার চিকিৎসার জন্যে। রোগশয্যায় শায়িত তখন পাণ্ডুর প্রমীলা। আর মীরা তখন 'সুস্থ সজীব উজ্জ্বল' — 'দুই বোন যেন আলাদা ধাতু দিয়ে তৈরি।' (ঐ) প্রমীলার দুর্বোধ্যতা মীরার সহজবোধ্যতা দুইই বিপরীত। আর পুরন্দরের রোগীর শয্যায় ঢুকে কখনও কখনও মনে হত 'মোমের পুতুলের সাজঘরে যেন ঢুকেছে।' (ঐ)। ঐ রোগী প্রমীলা। প্রমীলার মুখে সে 'স্বপ্নময় লাবণ্য' দেখেছিল কিন্তু তা অমানুষিক। প্রমীলাকে কুশল প্রশ্ন করতেও দ্বিধা হত পুরন্দরের। মনে হত—'এ প্রশ্নের কোনো মানেই হয় না এই আধ-সত্য আধ-স্বপ্ন মেয়েটির সামনে।' (ঐ)। রোগশীর্ণ হলেও এতটাই ব্যক্তিত্ব ছিল প্রমীলার। এরপর সেই প্রমীলাও 'ধীরে ধীরে বিলীন হয়েছে অন্ধকারে সন্ধ্যার আকাশের মত।' (ঐ) আর তাকে মাঝখানে রেখে গভীর সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল পুরন্দর আর মায়ার। তাই, প্রথমে যেদিন টের পেল পুরন্দর, সেদিন সে বিস্মিত হল। কারণ, 'প্রমীলাকে বাদ দিলে মীরার সে মূল্য আর তার কাছে নেই?' (পৃ. ৭৬, ঐ)। এখানেই প্রমীলার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হয়েছিল পুরন্দরের মনে এবং সেই প্রভাব এতটাই যে প্রমীলা তার জীবনে অস্তায়মান 'পাণ্ডুর চাঁদ হলেও সে মৃদু আলোতেই ছিল জীবনের স্পন্দন, সে আলো মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত রহস্য স্বপ্নও শেষ হয়ে গেল। (পৃ. ৭৬, ঐ)। এমনকি পুরন্দর উপলব্ধি করতে পারল যে মীরা অত্যন্ত সাধারণ ও স্পষ্ট— প্রমীলার সূক্ষ্ম রহস্যের সঙ্গে মিশে সে পুরন্দরের কাছে অপরূপ হয়ে উঠেছিল।' (ঐ)। আর প্রমীলা জীবনের 'সূক্ষ্ম রহস্যে' মৃত্যুতে অনিবার্য, অপরূপ হয়ে উঠল তার কাছে। অপ্রাপ্তিতে প্রেম হল সীমাহীন, তার গৃহবন্দী সত্ত্বা হাঁপিয়ে উঠল, মনে হল 'মীরাও যেন নগণ্য একটি মেয়ে।' (ঐ) ফলে দিনগুলি বিবর্ণ হয়ে উঠল পুরন্দরের কাছে। একদিন তার মন সত্য প্রকাশ করল, সে জানল যে 'প্রমীলার সঙ্গে এ বাড়ির সমস্ত আকর্ষণ তার কাছে ফুরিয়ে গেছে।' (ঐ) তাই এ জীবন থেকে পালিয়ে বাঁচল পুরন্দর। সে নিরুদ্দেশ হল কোন ঠিকানা না রেখে। এরপরেই দেখা গেল পুরন্দরকে জীর্ণ দরিদ্র পল্লিতে ডাক্তার

হিসেবে উপস্থিত হতে। তবে সে 'এসে অবশ্য বুঝেছে শুধু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার হিসাবেই তার ডাক এখানে পড়ে নি।' (পৃ. ৭৬, ঐ)।

অনেক কিছু বদলে গেলেও অসুস্থ রোগিণী যে মীরা তা চিনতে ভুল হয়নি পুরন্দরের। সে মীরার দৃষ্টিকে বুঝতে পারেনি—'কী আছে সে দৃষ্টিতে—হতাশা, বেদনা, ভর্ৎসনা, মিনতি? বিচার করবার মতো মনের অবস্থা পুরন্দরের নয়।' (ঐ) সে মীরাকে জিজ্ঞেস করতে পারেনি শারীরিক সুস্থতার কথা। কারণ—'এসব নিরর্থক সাজানো কথা ভাণ করে সে বলতে পারবে না। সে প্রবৃত্তি এখন অন্তত নেই।' (ঐ) ভাণ করতে পারবে না বলেই পালিয়ে গিয়েছিল পুরন্দর। ফিরে মীরার ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে সে খুঁজে পেল প্রচ্ছন্ন তীক্ষ্ণতা আর তার শীর্ণ হাসিতে সে ব্যঙ্গ ও বেদনা—দুইই অনুভব করল যেন। এরপর মীরা ও তার মা জানিয়েছেন যে নেহাত দরকারেই তারা ডেকেছেন তাকে। আর, পুরন্দরের মনে হয়েছে 'এ বিড়ম্বনার চেয়ে অনুযোগ, অভিযোজ, ভর্ৎসনা, কাঁদাকাটির আতিশয্যের একটা অশোভন পালাও বুঝি ভালো ছিল।' (পৃ. ৭৭, ঐ)। ক্রমশ পরিস্থিতিটা স্বাভাবিক হয়ে উঠলেও বিহ্বল পুরন্দর স্বাভাবিক হয়নি, সে যেন আগেকার প্রমিলার কণ্ঠই পেয়েছে রুগ্ন মীরার কণ্ঠে। আচ্ছন্ন পুরন্দর দেখেছে—'মীরার গাল বেয়ে যে দুফোঁটা জল বালিশের ওপর গড়িয়ে পড়ল তাই যেন বন্যা স্রোত হয়ে ধীরে ধীরে আড়ষ্ট মনের নির্লিপ্ততার মূল ক্ষয় করে ফেলেছে।' (পৃ. ৭৮, ঐ) আর মীরা বলেছে—'অসুখকে সত্যি আমি ভয় করি না। বাঁচব না ভাবতে আর ভয় করে না। শুধু একবার দেখা না পেয়ে মরতেও ইচ্ছা করছিল না।' (ঐ) এই আবেগ যেন পুরন্দরকেও স্পর্শ করেছে। পুরন্দর মীরাকে সান্ত্বনা দিতে চাইলেও মীরা সহজভাবে যা বলেছে সেটাই শেষ পর্যন্ত সত্যি হয়ে উঠেছে উভয়ের সম্পর্কের ক্ষেত্রে—'কিন্তু এটুকু আমি আজ বুঝেছি যে সত্যিকারের বাঁধন যেখানে ছিঁড়ে গেছে, সেখানে জোর করে গিঁট দেওয়া যায় না।' (পৃ. ৭৮, ঐ)। অবশেষে পুরন্দর কথা দিয়েছে সে পরে আসবে। বলেছে—'আজ কিন্তু আমায় মাপ করবেন। অসুখ দেখবার মতো মনের অবস্থা আমার নয়। তাছাড়া এখনই রোগ দেখতে বসলে মনে হবে শুধু ডাক্তারি করতেই যেন এসেছি।' (পৃ. ৭৯, ঐ) এই পুরন্দর সহজ ও স্বাভাবিক। কারণ, অবশেষে সে দেখেছে জীর্ণ রোগশয্যায় প্রমীলা ও মীরা আশ্চর্য কুহকে মিশে গেছে—'নিজের অমোঘ অদৃশ্য নিয়তির দিকে তাকিয়েই পুরন্দর একথা বললে, না এই জীর্ণ রোগশয্যায় অশরীরিণী প্রমীলার

আধ-স্বপ্ন ছায়া কোন আশ্চর্য কুহকে মীরার সঙ্গে মিশে তাকে আবার রহস্যমায়ায় মণ্ডিত করে তুলেছে।' (পৃ. ৭৯, ঐ)।

—এই রহস্য প্রমীলা অসমাপ্ত রেখেই অন্তর্হিত হয়েছিল, মীরার রোগশয্যায় তা সম্পূর্ণ হয়েছে। পুরন্দরের মনের মধ্যেকার জটিলতা এইভাবে ক্রমশ কেটে গিয়েছে। প্রমীলাকে পুরন্দর বুঝতে পারেনি বলেই ভালোবেসেছিল, নিজের অজান্তেই। আর প্রমীলার বাড়িতে যাতায়াতের সূত্রে মীরার সঙ্গে তার একটি সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। কিন্তু মীরার মধ্যে সেই সূক্ষ্মতা যা কাঙ্খিত ছিল পুরন্দরের তা অনুপস্থিত ছিল। এই পরিস্থিতিতে পুরন্দর নিজের কাছ থেকেই নিস্কৃতি চেয়েছিল। সে নিজেই হয়ে উঠেছিল নিজের নিয়তি। তাই সে মীরাকে ত্যাগ করে নিরুদ্দিষ্ট হয়েছিল। সচেতন অবচেতনের দ্বন্দ্বে গল্পটি অসামান্য হয়েছে। মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাই শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছে এবং আদৌ পুরন্দরের এ থেকে উত্তরণ সম্ভব হবে কিনা সে ইঙ্গিত দিয়ে গল্পটি শেষ হচ্ছে না। কারণ—'জীর্ণ রোগশয্যায়' প্রমীলার 'আধ-স্বপ্ন' ছায়া এক্ষেত্রে পুরন্দরের অবচেতনকে আচ্ছন্ন করেছিল, তা কেটেছে মীরার রোগশয্যায়। অথচ রোগ পাণ্ডুরতা, কৃশতা, জীর্ণতা সহ অপ্রাপণীয় প্রমীলার ছায়া দেখতে পেয়েছে বলেই মীরাকে গ্রহণযোগ্য হয়েছে পুরন্দরের। এভাবেই প্রেম ও দ্বন্দ্ব দুইই মিলে গল্পটি সার্থক হয়েছে।

কলকাতার আরব্য রজনী : পয়লা চোরের কেচ্ছা— এ গল্পটি 'ক্বচিৎ কখনো' গল্পগ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের গ্রন্থভুক্ত হয়েছে এবং তা প্রকাশিত হয়েছে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে। এ গল্পের শুরুতেই আছে এক রোমাঞ্চকর ও কৌতূহলদ্দীপক স্থানের বিবরণ এবং রাত্রিকালীন একটি অভিজ্ঞতা গল্পটিতে উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলেছে। অভিজ্ঞতাটির স্থান ও সময় এরকম—'ইস্পাাহানী গির্জের ঘড়িটা একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছে একশো পনেরো বছরের অবিরাম চলায়। সময়ের সঙ্গে আর ঠিক পাল্লা দিতে পারে না। একটু পিছিয়ে পড়ে।' (পৃ. ৩৫, প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প, ৩য় খণ্ড) এবং 'তার সাড়ে এগারোটার ঘণ্টা মানে তাই এগারোটা পঁয়ত্রিশ' (ঐ) ঠিক তখনই যদি কেউ ছোট্ট ত্রিকোণা পার্কে এসে ঢোকেন তখন তরল অন্ধকারে মুখোমুখি পাতা দুটো বেঞ্চের একটায় বসলেই তিনি অদ্ভুত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হবেন। কারণ, সে সময় পার্কের বেঞ্চে আগে থাকতে একটা ছায়ামূর্তিকে দেখা যাবে এবং একটু দেরি করেই যেতে হবে যাতে সেই মূর্তিটি থাকে, আগে গিয়ে বসলে সে আসবে না। আর গা ছমছমে সেই পরিবেশে—

'দৈত্যপুরীর মতো বিরাট অন্ধবাড়িগুলো যেন গায়ের ওপর হেলে পড়েছে মনে হবে। রাস্তায় তখনো আলো জ্বলছে, কিন্তু মনে হবে সে আলো যেন এভাবেই অশুভ ইঙ্গিতময় পরিবেশে থাকার পর যে কেউ লেখকের কথামত দ্রুত সেই পার্ক থেকে বের হয়ে বড় রাস্তায় বেরিয়ে নির্জন রাস্তায় নিজের পদধ্বনি শুনে সচকিত হতে থাকবেন ও ঘিঞ্জি অঞ্চলে বাস্তবতার নাগাল পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে উঠবেন। এভাবে এরপরেই শুরু হচ্ছে লেখকের অভিজ্ঞতা, যা তাঁর পরিচিত জনৈক নীলাম্বর অধিকারীর কাহিনির সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যেতে পারে। লেখক জানিয়েছেন নীলাম্বর অধিকারী কবি বা ভাবুক নয়। 'নেহাত স্থির ধীর সুস্থ মস্তিষ্ক কাগজের ব্যাপারী।' (পৃ. ৩৬,ঐ) বড়বাজারে আড়তে বসে সে কাগজের অর্ডার নেয় তার তার কাজ শেষ হয় নটা-দশটায় তারপর তার শেষ ট্রেন 'রাত এগারোটা কুড়িতে ট্রেন না পেলে তাকে নিরুপায় হয়ে ট্যাক্সি নিতে হয়। ট্যাক্সির খরচটা গায়ে বড়ো লাগে। জীবনে একবার কি দুবারের বেশি সে ট্যাক্সি নেয় নি। নীলাম্বর অধিকারী কৃপণ।' (পৃ. ৩৬, ঐ)। নীলাম্বরের কৃপণতা তার গর্বের বিষয়। এহেন নীলাম্বর অধিকারীও একদিন ট্রেন ফেল করেছিল এবং দুর্যোগের রাতে সেদিন শহর ভেসে গেছে জলে। যানবাহন সব অচল। তার মাস বরাদ্দ রিক্শা সেদিন আসেনি। (ঐ) এবং ট্যাক্সিও সে পায়নি। বৃষ্টি থামলে নীলাম্বর যখন একটা রিকশা ডেকে জলময় রাস্তায় বেরিয়েছে তখন 'শুক্ল পক্ষের চাঁদ সেই মেঘলা অন্ধকারকে নেপথ্য থেকে আরো রহস্য তরল করে তুলেছে।' (পৃ. ৩৬, ঐ)। এই অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে নীলাম্বর যাত্রা করেছে কিন্তু নীলাম্বর ষ্টেশনে পৌঁছতে পারেনি এবং রাস্তায় রিকশার চাকা আলগা হয়ে যাওয়ায় নীলাম্বর নেমে পড়েছে রাস্তায়, আর—পার্কটা দেখে সে ঢুকেও পড়েছে পার্কে—'পায়ে পায়ে এককোণের বেঞ্চি দুটোর কাছে পৌঁছে একটায় বসবার পরও সামনের বেঞ্চির লোকটিকে ভালো করে খেয়াল করেনি। লোকটা এদিকের গাঢ়তর অন্ধকার থেকেই যেন আচমকা অস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছিল বেঞ্চির গায়ে।' (ঐ) ইতিমধ্যে লোকটিকে দেখে চমকে উঠেছে নীলাম্বর, লোকটিকে শুধু দেখা গেছে তা নয় সে যেন সশব্দে ফুটে উঠেছিল। নীলাম্বর চমকে উঠে অনুভব করেছিল রোগাটে একটা মানুষ বেঞ্চে হেলান দিয়ে 'বেঞ্চির পিঠের দুদিকে হাত দুটো ছড়িয়ে গা এলিয়ে' (পৃ. ৩৭) বসে আছে। সে খাস কোলকাতার ভাষায় বলেছিল—'বিড়ি টিড়ি একটা ছাড়ুন না স্যার।' (পৃ. ৩৭) নীলাম্বর অপ্রসন্ন স্বরে জানিয়েছিল তার কাছে কিছু নেই। নীলাম্বরের

বিরক্তি শুনে সে চুপ করে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে 'দূরে হঠাৎ একটানা স্রোতের শব্দ ক্রমশ প্রখর হয়ে উঠেছিল। নদীর আর রাস্তার শব্দ যেন মেলানো। বেগবান একটা মোটর রাস্তার জল কেটে যতদূর সাধ্য দ্রুত এগিয়ে আসছে।' (ঐ) তখন বেঞ্চির ছায়ামূর্তি বলেছিল শিউপরসাদজির কথা। বলেছিল শিউপরসাদজির মোটরগাড়ি রাত বারোটার আগে ঐ গলিতে ঢোকে প্রতিদিনই। ঝড় জলেও এর বিরাম নেই। শিউপরসাদজির মোটর থেকে নেমে চোদ্দ নম্বর বাড়ির সেকেলে দরজায় চারবার টোকা দেবে। তখন দোতলার খুপরি জানালার খড়খড়ি থেকে ধমক আসবে। শিউপরসাদজির সুশীল সুবোধ বালকের মত আবার মোটরে চেপে যেন কুর্ণিশ করে পিছু হটে বেরিয়ে যাবে। নীলাম্বরের মনে হয়েছিল লোকটা পাগল টাগল হবে বোধহয়। লোকটাকে সে বলেছিল 'নাড়ির খবর হাঁড়ির খবর কী করে এত জানলে?' (ঐ) আর নীলাম্বরকে চমকে দিয়ে লোকটা বলেছিল—খবর কি একটা স্যার। আর যেমন তেমনও না।' (ঐ) বলেছে বাবুলালের পানের দোকানের সামনে রাধু দাসের সামনে দাঁড়াবে সুন্দরী তরুণী। রাধু দাস পাঁচ আনা দিলে গাড়ি চড়ে বেরিয়ে যাবে। এভাবেই টুকরো টুকরো গল্প তৈরি হয়েছে। ইতিমধ্যে গির্জার ঘড়িতে বারোটা বেজে গিয়েছিল এবং লোকটা একটা অদ্ভুত গল্প বলেছিল। গল্পটা বেচারাম চোরের। গল্পটা এইরকম— বেচারাম একজন দাগী চোর। সিধেল চোর বলে যে কোন চুরিতে সে হাত পাকিয়েছে। অল্পবয়সে চুরিবিদ্যা শেখে বেচারাম, স্কুলের গণ্ডি পেরোতে না পারলেও সে ইংরেজি বলে লোককে তাক লাগিয়ে দিতে পারে। তাই একবার ধরা পড়েও সে বেকসুর খালাস পেয়েছে এবং জজ সাহেব তাকে ছেড়ে দিয়েছেন উপদেশ দিয়ে। এই বেচারাম একদিন ফুটফুটে জোছনা রাতে একটা কানাগলিতে চুরি করতে যায়। ছাদগুলিতে শ্যাওলা জমা, আলসেতেও। সেই বাড়িতে খুপরি গোছের একটা চিলেকোঠার ঘরে বেচারাম দুজন নারী পুরুষকে কথা বলতে দেখে। তারা স্বামী স্ত্রী। দেনার দায়ে তারা আত্মহত্যা করবে। তার আগে বাসর সাজিয়ে বসেছিল তারা ফুল কিনে এসেন্স আতর ছড়িয়ে। মতিচ্ছন্ন হয়েছে ঝানু চোর বেচারামের। তার ঝুলিতে কিছু গয়না নগদ ছিল। গয়নাগুলো রেখে সে নগদ টাকাগুলো রেখে দিয়েছে তাদের দুয়ারে ; স্বামী-স্ত্রী অবাক হয়েছে। এরপর মাসখানেক পরে আবার এসেছে বেচারাম তাদের দেখতে। দেখেছে ছেলেটা মাতাল, আর মেয়েটার হাহুতাশ করছে। বেচারাম আবার রেখেছে গয়না। আর গয়না বেচতে গিয়ে ধরা পড়েছে

ছেলেটি। অদ্ভুত চরিত্রটি বলেছে 'বেচারামের নেশা লাগল ভগবান হওয়ার নেশা, পঞ্চরঙ এর চেয়ে কড়া। কিছুদিন অন্তর অন্তর বেশ কিছু লুকিয়ে সেখানে চেলে আসে।' (পৃ. ৪০, ঐ)। এইভাবে বেচারাম তাদের লোভ ধরিয়েছে, ক্রমে লোকগুলি পাল্টে গেল—'ঘরদোর সংসারের চেহারা তখন দিন দিন পাল্টাচ্ছে।' (ঐ) আসবাব, শাড়ি পোশাকে আলোয় তা বদলে গেছে ক্রমশই। একদিন বেচারাম দেখেছিল মেয়েটার গয়নার জন্য রাখা টাকা দিয়ে ছেলেটা ফূর্তি করেছে। ছেলেটা বলেছে মেয়েটার লালসা মেটে না, তা বেড়েই যাচ্ছে ইত্যাদি। এইভাবে বেচারাম রাত আড়াইটে অবধি সব দেখেছে। আর 'সব ঠাণ্ডা হবার পর পা টিপে টিপে গিয়ে জানলা গলিয়ে সেদিনের যা কিছু লুট সব রেখে এল তাদের ঘরে। টাকা কড়ি গয়না পত্র সব একেবারে ঝুলি উজোড় করে।' (ঐ) এ গল্প অসমাপ্ত রেখে এরপর লোকটি বিদায় নেয়। আর এরপরে একদিন নীলাম্বর পার্কে গিয়ে তাকে পায়নি—'পেয়েছিল পরে। ইস্পাহানী গির্জের ঘড়িতে হাপানো ঘড়ঘড়ে সাড়ে এগারোটার ঘণ্টা বাজার পরে গিয়ে।' (পৃ. ৪১, ঐ)। এইভাবে অদ্ভুত লোকটির অদ্ভুত গল্প তৈরি হয়ে উঠেছে। গল্পটি আসলে বেচারামের নয়, অদ্ভুত লোকটিরই। এইভাবে লোকটির চরিত্র ও বেচারাম এক হয়ে গেছে। বেচারাম তার জীবনের অন্যায়গুলি যেন শোধন করতে দরিদ্র লোকগুলির উপকার করতে চেয়েছে। অথচ লোভী লোকগুলি তা উপলব্ধি করতেও চায়নি। এভাবেই মহত্ত্ব হারিয়েছে দানের। গভীর মানসিক জটিলতাগুলি উঠে এসেছে অদ্ভুত গল্প ও পরিবেশের মধ্যে দিয়ে।

১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'সংসার সীমান্তে' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'অসমাপিকা' গল্পেও ধরা পড়েছে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা। গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে শঙ্কর এবং তার লতা বৌদি। শঙ্করের অভিজ্ঞতাই এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। শঙ্কর একটি বাড়িতে আশ্রিত ছিল। সে বাড়ি পুরোনো জমিদার বাড়ি, সে বাড়ির গৃহকর্ত্রী লতা বৌদি—'তিনি যেন সামান্য একটু অবহেলার প্রসাধনেই পটের বিবিটি হয়ে এখনো তাঁর সেই রঙিন কাঁচ বসানো জানলা দেওয়া ঘরের একটু বেরঙা পঙ্খের কাজ করা মেঝেতে রঙচটা গালচের ওপর একটু পোকায় কাটায় জাজিম পেতে যে কজন পারেন জুটিয়ে লুডো কি দাবা কি বিস্তি খেলছেন। (পৃ. ২১৯, অসমাপিকা, প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প, ৩য় খণ্ড)। লতা বৌদির স্বামীর সঙ্গে বয়সের ব্যবধান বিস্তর এবং মানসিকতার পার্থক্য যথেষ্ট। লতা বৌদির স্বামীর দিনের

অধিকাংশ সময় কাটে ঠাকুর ঘরে ; আর লতা বৌদি কাটান প্রায় সারাদিনই বিন্তি খেলে। মফস্বলের ছেলে শঙ্কর আশ্রয় পেয়েছিল সেই 'পড়তি জমিদার বাড়িতে। সর্বক্ষণ সে তটস্থ থাকতো—'শহরের হালচালই ভালো করে জানে না তা এরকম বাড়ির কায়দাকানুন। নিজের অজ্ঞতায় আড়ষ্টতায় খোদ ঠাকুরানীর কাছে যদি কেনো দোষ করে ফেলে তাহলেই তো সর্বনাশ।' (ঐ) সে তখনো দেখেনি কিংবা বর্ণনা শোনেনি সে বাড়ির গৃহকর্ত্রীর। তার ধারণা ছিল—'বেশ একটু মোটাসোটা গিন্নিবান্নি চেহারা, বসতে অন্তত ছোটখাটো একটা চৌকিতে কুলোয় না? (পৃ. ৩০০, ঐ)। কিন্তু লতা বৌদিকে দেখে তার চমক লেগেছিল। অপ্রত্যাশিতভাবে লতা বৌদি সাজসজ্জা কিছুই করেন না এবং একদিন তার কাছ থেকে ডাক পেয়ে দেখেছিল, প্রমীলার আসরে বিন্তি সাজিয়ে বসে আছেন লতা বৌদি। তাকে দেখে বিদ্রূপের খোঁচা দিয়ে লতা বৌদি বলেছিলেন—'আরে এতো দেখছি ময়ূর থেকে সবে নামিয়ে এনেছিস। এসব মাকাল ফল দিয়ে কাজের কাজ কিছু হয়।' (ঐ) ধরে নেওয়া যেতে পারে যে শঙ্করের চেহারা সম্পর্কে খবর অন্দরমহলে অনেক আগেই পৌঁছেছিল। আর তাই তাকে ডেকেছিলেন লতা বৌদি। আর শঙ্কর শুনেছিল এর মধ্যেও 'বুকের মধ্যে ঝংকার তোলা' (ঐ) আশ্চর্য গলা, সেই গলাতেই লতা বৌদি তাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করেছিলেন সে বিন্তি খেলতে জানে কিনা এবং সন্তুষ্ট করার মত জবাব দিতে পেরে কৃতার্থ হয়েছিল শঙ্কর। এভাবেই যোগাযোগ তৈরি হয় আর শঙ্কর চোখ চেয়ে দেখেছে—'চোখ তুলে যার দিকে চাইতে সংকোচ হয় এ বাড়ির সেই কর্ত্রী ঠাকরুণের মুখে যেন রসিকা মোহিনীর হাসি।' (পৃ. ৩০৩, ঐ)।

খুবই তাৎপর্য পায় 'এখানে মোহিনী' শব্দটি। বলা বাহুল্য শব্দটি সৌন্দর্য ও মাদকতা দুটি দিককেই নির্দিষ্ট করছে। অথচ শঙ্কর তাকে দেখে 'ভয়'ও পেয়েছে। এক অজানা শঙ্কায় শঙ্কর আরক্ত হয়ে উঠেছে। আর নাম জিজ্ঞেস করে চাপ হাসিটা চোখের দৃষ্টিতে উদ্দাম করে তুলেছেন লতা বৌদি। এরপর বারবার খেলায় ডাক পড়েছে শঙ্করের—'কি যে খেলার নেশা তা ভাবলে এখনো মজা লাগে। যাহোক একটা খেলা চাই-ই।' (পৃ. ৩০১, ঐ)।

বস্তুত অদ্ভুত একটা নেশাই তাকে যে টেনে নিয়ে গিয়েছে তা শঙ্কর অবচেতনে জেনেছে এবং এ সত্যকে সে অস্বীকার করতে চেয়েছে তাই মিথ্যা অজুহাতে তাদের আসর কামাই করেছে। লতা বৌদি

সেটা বুঝেছেন এবং হালকাভাবে জেরাও করেছেন এবং তারপরেই তাস নিয়ে মেতে উঠেছেন। নেশা যে ক্রমে ভিন্নপথে যাত্রা করেছে শঙ্কর তা স্পষ্ট বুঝেছে অথচ 'এ আসর এড়াবার চেষ্টা আর কখনো করেনি। কলেজের ক্লাসও বরং ফাঁকি দিয়েছে। এক আধদিন নয় প্রায় নিত্যই।' (ঐ) এরকমই হঠাৎ একদিন শঙ্কর দেখেছে ঘরে আর কেউ নেই। এরকমটা হওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু পরেও কেউ আসে নি। 'অত কাছে আসবার সুযোগ পেয়েও তাকে চিনতে পেরেছিল কি?' (পৃ. ৩০২) শঙ্করের কড়ির দাম গুণে ঘুঁটি চালার পর আচমকা হাত চেপে ধরেছিল লতা বৌদি। তার মাথা প্রায় তার কোলের উপর। এমনই দিনে দুজনে যখন এরকম অবস্থায় তখন লতা বৌদিকে ডাক পাঠিয়েছেন তার স্বামী, ও সে খবর দিয়েছে তার একটি দাসী। লতাবৌদি বলেছেন 'ডাকলেই যেতে হবে নাকি! যা বলগে যা পুজোর ঘরে আমি যাই না।' (পৃ. ৩০২, ঐ) শব্দগুলি খুবই তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছে। সেই সময় বাইরে থেকে ডেকে ওঠা দাসীর কথায় জানা গিয়েছিল লতাবৌদির স্বামী পুজোর ঘরে ডেকে পাঠিয়েছেন লতাবৌদিকে। লতাবৌদি আপত্তি করেও শেষ পর্যন্ত বলেছেন 'আর খেলব না রে।' (ঐ) এরপর 'আয়না দেওয়া ল্যাজারাসের বাড়ির সেকেলে বিরাট আলমারিটা খুলে দিয়ে একটা মোড়ক শঙ্করের হাতে তুলে দিয়েছেন এবং মুখ টিপে হেসেছেন। শঙ্কর দেখেছে—'কাগজে মোড়া একটা মুক্তোর মালা। মুক্তোর সাচ্চামুচো বোঝবার ক্ষমতা শঙ্করের আর কোথা থেকে থাকবে।' (পৃ. ৩০৩, ঐ) ক্রমে শঙ্কর জেনেছে এই মালা চুরি করে এনেছেন লতাবৌদি ঠাকুরঘর থেকে। লতাবৌদি বলেছিলেন 'ওর মদনমোহন বোধহয় মালার জন্য কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছে এতক্ষণ! আচ্ছা বল দেখি এ মালা ওই পাথরের পুতুলের গলায় মানায়?' (পৃ. ৩০৩, ঐ) সভয়ে পিছিয়ে গিয়ে শঙ্কর অনুভব করেছে ঐ মালা লতাবৌদি তাকেই পরিয়ে দিতে গিয়েছিলেন—লতাবৌদিও তখন মালাটা হাতে নিয়ে হেসেছেন, আর আশ্চর্যের যে মালাটা না পরিয়ে লতাবৌদি বিদ্রূপ করে যেন বলেছেন—'পাথরের ঠাকুরের মালা গলায় পরলে গলাটায় ফাঁসি লাগত বোধহয়।' (ঐ) এরপর হঠাৎ একদিন প্রায় মাঝরাত্তিরে শঙ্কর যখন শোবার ব্যবস্থা করছে তখন লতাবৌদির কাজের লোক বিষণ তাকে ডাকতে এসেছে। অবাক হয়ে শঙ্কর দেখেছিল বিষণ বেশ বিমূঢ়—'ফ্যাকাশে মুখে ছেলেটা প্রায় কাঁপছে।' (ঐ) আর শঙ্করের কড়া ধমক খেয়ে বিষণ শুধু বলেছিল—'পূজা মহল থেকে এসে বহুরানী কিরকম যেন হয়ে গেছেন।' (পৃ. ৩০৪, ঐ)।

পূজামহল মানে পুজোর ঘর না, বাড়ির কর্তার স্বেচ্ছা নির্বাসনের জায়গা, শঙ্কর জানত। আর লতাবৌদির বদলে যাওয়া দেখে বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল সে—'সেদিন তিনি যেন কোন আশ্চর্য রূপকথা থেকে বেরিয়ে এসেছেন। সোনাদানা, জড়োয়ার জমক তো আছেই তার সঙ্গে ফুলের সাজ মিলে এক বিহ্বল করা রূপের যাদু সৃষ্টি করেছে।' (পৃ. ৩০৪, ঐ)। অপরূপ সজ্জায় লতাবৌদিকে ভয়ঙ্কর লেগেছে শঙ্করের। 'অপরূপ বেশভূষার সঙ্গে বিস্ফারিত আগ্নেয়গিরির মত চোখমুখে জ্বলন্ত আবেশ এক অবিশ্বাস্য মূর্তি রচনা করেছে।' (ঐ) লতাবৌদি তীব্র ভাষায় শঙ্করকে বলেছিলেন, তিনি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবেন, তার পৌরুষকে বিদ্রূপ করে লতাবৌদি এরপর আলমারির চাবি খুলে শঙ্করের হাতে তুলে দিতে চেয়েছেন গয়না, সেই গয়নাগুলি নিয়ে চলে যেতেও চেয়েছেন। শঙ্কর ঝাপসা চোখে দেখেছিল 'সাজানো নোটের গাদা, পরমুহূর্তে তাকে ঠেলে দিয়ে লতাবৌদি হেসে উঠেছিলেন, 'না, তোর সে মুরোদ নেই। আমি একটু ছুঁলে তুই কাঠ হয়ে যাস। কাছে টানলে হাতটা বাড়াতে পারিস না। তোকে দিয়ে কিছু হবার নয়।' (ঐ) এই সংলাপে লতাবৌদির অবরুদ্ধ যৌনতা আর অবদমিত থাকেনি, তা জ্বলন্ত, তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। অবশেষে লতাবৌদি ধীরস্বরে তাকে নির্দেশ দিয়েছেন 'যেমন করে পারিস কালকের মধ্যে পুজোর ঘর থেকে কটা জিনিস চুরি করে আনবি। পাথরের ওই খেলনাটা।' (ঐ) তারপরে তাকে চলে যেতেও বলেছিলেন লতাবৌদি । অসংখ্য টাকার গোছা নিয়ে পরদিনই সে বাড়ি ছেড়েছিল শঙ্কর। এরপরে সে ফিরে এসেছে চকমেলানো তিনতলা বাড়িটির কাছে। এসেছে দূর প্রবাস থেকে সেই টাকা দিয়ে দায়মুক্ত হতে আর লতাবৌদিকে একবার দেখতে। কিন্তু 'আকর্ষণ যেমন লতাবৌদি তেমনি তিনিই প্রধান বাধা (পৃ. ৩০২, ঐ)। শঙ্কর তাই ভেবেছে সে দ্বিধা জয় করে আর একবার যাবে লতাবৌদিকে দেখতে। এইভাবে যথার্থই 'জীবন যখন নিজের অসহায় মূঢ়তায় গোলকধাঁধায় নিজেকে এমন করে ছেড়ে দেয় তখন কাহিনী হিসেবে শেষটুকু অবান্তর।' (পৃ. ৩০৫, ঐ) তখনকার সেই জটিলতা গল্পের বিষয় হিসাবে অনিবার্য হয়ে উঠেছে।

চিত্রনাট্য প্রধান ও সাংবাদিকতাধর্মী গল্প —

প্রেমেন্দ্র মিত্রের বেশ কিছু গল্পের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি তাঁর ভূয়োদর্শী নানা অভিজ্ঞতার ছাপ। প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর বিচিত্র কর্মজীবনে একাধিকবার যুক্ত হয়েছিলেন নানা পেশার সঙ্গে। এবং

সেইসবগুলির অভিজ্ঞতাই তাঁকে বিশেষভাবে প্রাণিত করেছিল। তাঁর সাহিত্যসম্ভারে সেই অভিজ্ঞতাগুলির প্রভাব কোথাও বেশ প্রত্যক্ষও স্পষ্ট। বিশেষত আমরা উল্লেখ করতে পারি ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে সিনেমা জগতে প্রেমেন্দ্রের সংযুক্ত হওয়ার ঘটনাটি। এই জগতের প্রভাব অনেকক্ষেত্রেই প্রেমেন্দ্রের ছোটগল্পকে প্রভাবিত করেছে। কিন্তু, চিত্রনাট্যের আদলে কিংবা সিনেমাটিভ প্রবণতায় যে গল্পগুলিকে বিশিষ্টতা দিয়েছেন, সেগুলিই এই শ্রেণীতে আমাদের বিবেচ্য। আবার, প্রেমেন্দ্রের সম্পাদনা কর্ম ও সাংবাদিক জীবনও তার ছোটগল্পে বিষয় হয়ে উঠেছে। এই শ্রেণীতে সে গল্পগুলিকেও রাখা হয়েছে। যেমন ইকেবানা, ঘটনা সামান্য, দৌবারিকের দুকলম প্রভৃতি। এগল্পগুলিতে কখনও সিনেমার চিত্রনাট্যকে অবলম্বন করে, কখনও সম্পাদনা ও সাংবাদিকতাকে ভিত্তি করে গল্পবিষয় নির্ধারিত হয়েছে।

'অষ্টপ্রহর' (১৯৭৩ খ্রিঃ) গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'ইকেবানা' গল্পের আদলটি এভাবেই নির্মিত হয়ে উঠেছে যেখানে গল্পটিতে দুটি চরিত্রের পারস্পরিক সংলাপ প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে গল্পটি তৈরি হয়ে উঠেছে। গল্পটির বিষয় এইরকম—পূর্বেই বিবাহিত নীলিমা ত্যাগ করে এসেছে তার পূর্বের স্বামী অনুপমকে। অনুপমকে ছেড়ে দ্বিতীয়বার সে বিবাহ করেছে শুভঙ্কর দত্তকে। শুভঙ্করের সাজানো ফ্ল্যাটে বর্তমানে তাদের নিশ্চিন্ত দাম্পত্য জীবন। শুভঙ্কর ভদ্র, বিনয়ী, মার্জিত। অনুপমের মত সে উচ্ছৃঙ্খল, দুশ্চরিত্র নয়। তাই, নীলিমা বর্তমানে তার নিরাপদ, শান্ত জীবন কাটাচ্ছে। এই জীবনযাত্রায় ছেদ পড়ে নিরুপদ্রব ফ্ল্যাটে হঠাৎ অনুপমের আগমনে। অনুপম স্বামীত্বের দাবি নিয়ে আসেনি, সে এসেছিল তার নেশার খোরাক মেটাতে, নীলিমার কাছ থেকে টাকা নিতে। কিন্তু, এসে সে ফিরে যেতে চায়নি, নীলিমার প্রতি নিবিড় আকর্ষণে। অবশেষে গল্প সূচনায় আছে একটি ফুল সাজানোর বর্ণনা— 'কয়েকটি ফুল আর বাহারি পাতার মধ্যে ঠিক চম্পক—অঙ্গুলি না হোক নধর সুঠাম কটি আঙুলের কাজ প্রথমে দেখা গেল। সযত্নে বাড়ানো নখগুলোর রঙ বোঝা যাচ্ছে বেশ কয়েকমুহূর্ত ক্যামেরা শুধু ওই ফ্রেমেই স্থির হয়ে রইল। ফুল আর লতাপাতা নানাভাবে সাজিয়ে আবার বদলানো হচ্ছে। (পৃ. ৩২৩, ইকেবানা, প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প, ৩য় খণ্ড)। এই ফুল সজ্জাতে নীলিমার অবয়ব এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সুচারুতা মিশে গেছে। অথচ গল্পের শেষে সেই ফুলসজ্জা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। ফুলগুলো এখন নতুনভাবে সাজানো। নীলিমা যখন নীচে টেলিগ্রামটা নিতে গিয়েছিল, তখন অনুপমই সাজিয়েছে। সাজানো

বলতে কিছু নয়, বাহারি ফুল পাতার মধ্যে তিনটে শুকনো, কাঁটা ওঠা মরা কাঠি আঁকাবাঁকাভাবে পোঁতা। সব মিলে অদ্ভুত একটা চেহারা কিন্তু তাতে হয়েছে।' (পৃ. ৩৩০, ঐ) এই বর্ণনায় স্বাভাবিক দাম্পত্য কাটার মত প্রতীকী হয়েছে অনুপমের ব্যক্তিত্ব। প্রথমটি সাজিয়েছে নীলিমা এবং সেই যে সাজিয়েছে এটি, তা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে ক্যামেরা— আঙুলগুলো দেখে যা মনে হয়েছিল মেয়েটি পোশাক প্রসাধনে সেইরকম আধুনিকা। পাতলা দোহারা চেহারা। .....' (পৃ. ৩২৩, ঐ) আর, গল্পের শেষেও দেখা গেছে ক্যামেরার নৈপুণ্য—'ক্যামেরা ফিরল নীলিমার মুখের ওপর। স্তব্ধ হয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে। বেশ কিছুক্ষণ অমনি নিষ্পন্দ হয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর ফিরল তার সেই সাজানো ফুলের পাত্রের দিকে।' (পৃ. ৩৩০, ঐ) মেয়েটির চেহারা ও সজ্জা বিবরণের মধ্যে দিয়ে তার অবস্থানকে বিবৃত করেছেন লেখক— 'সাধারণ মধ্যবিত্ত চেহারাকে আধুনিক করে তোলবার একটা আন্তরিক চেষ্টা আছে অবশ্য।'(ঐ) আর এর সঙ্গে মিলে গেছে মেয়েটির চরিত্র— 'মেয়েটি ফুল সাজাতে তন্ময়, মুখে সেই একাগ্রতার সঙ্গে কখনো একটু ভ্রূকুটি কখনো একটু প্রসন্নতা ফুটে উঠেছে।' (ঐ)। গল্পটি ক্রমে নাটকীয় হয়ে উঠেছে এবং চিত্রনাট্য নির্মাণ কৌশল সার্থক হয়েছে, মেয়েটির বিবর্ণতা, আতঙ্ক সবই নিপুণভাবে উঠে এসেছে গল্পটিতে। কখনও তার মুখের ভাব কঠিন, কখনও চোখের তারা স্থির, কখনো তার আঙুলের কেঁপে ওঠা কোন বিশেষ ঘটনার দিকে মোড় ঘুরিয়ে দিচ্ছে। হঠাৎই মেয়েটার গার দুপাশে কিছু আঙুল দেখা গেল — 'আঙুলগুলো একটু নাড়াচাড়ার সঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার ধরণে ঠিক যেন সরীসৃপের অস্বস্তিকর স্পর্শের আভাস দিচ্ছে।' (পৃ. ৩২৩, ঐ) ।

এরপরেই দেখা গেছে অনুপম চরিত্রটিকে। তার চরিত্রটি নির্মাণও হয়েছে অদ্ভুতভাবে এবং জানা গেছে নীলিমার সঙ্গে অনুপমের সম্পর্ক। অনুপম ও নীলিমার সংলাপের মধ্যে দিয়ে উঠেছে সেই সম্পর্কটি — মেয়েটি দাঁতে দাঁত চেপে বললে —'এতখানি সাহস তোমার হবে ভাবি নি।'

'ভাবনি।' 'সেই ঈষৎ কর্কশ কৌতুক মেশানো গলা শোনা গেল, 'স্ত্রীর কাছে স্বামীর কি সাহসের দরকার হয়'

'..... স্বামী! তুমি স্বামীত্বের দাবি কর।' মেয়েটির চোখের দৃষ্টি আর কণ্ঠ দিয়ে আগুনের ঝল্‌কা বার করে .....।' (পৃঃ ৩২৪, ঐ)।

কথায় কথায় অনুপম বলেছে—'আমার এ চেহারাটা খুব ভদ্রলোক ভালমানুষের নয়। চোখ রাঙিয়ে রুখে দাঁড়াবার ভঙ্গি করলে একটু থমকে যেতে হবে। সেই সুযোগে আমি যদি বলি যে আমি শ্রী অনুপম চক্রবর্তী হলাম তোমার পরিত্যক্ত স্বামী—' (পৃ. ৩২৪, ঐ) আর নীলিমার স্বামীকে দেখা যাচ্ছে—ছবিতে—'এই যে বলে অনুপম ফটোটা তুলে নিয়ে যেন ভালো করে দেখবার জন্যে চোখের কাছে ধরল। ক্যামেরাও এগিয়ে নিয়ে এক ফ্রেমে বড় করে ফটোটা আর অনুপমের মুখটা ধরল। ফটোতে একটি বেশ প্রসন্ন শান্ত গোলগাল মুখ দেখা গেল।' (পৃ. ৩২৭, ঐ) আবার, এ দুটি চরিত্রের বক্তব্য থেকে উঠে এসেছে অন্য একটি তত্ত্ব, যা রোমাঞ্চকর—'অনুপমের গাঢ় কণ্ঠস্বর 'নীল আমার নীলিমা' ডাক অশুভ জাদু করেছে নীলিমার উপর। নীলিমা যেন নিজের অনিচ্ছাতেও শিউরে উঠেছে, কিন্তু তুষার শীতল গলায় নীলিমা বলেছে এরপর—'এখনো ভালো কথা বলছি এখুনি চলে যাও। তোমার এ অন্যায় জুলুম আমি বেশিক্ষণ সহ্য করব না।' (পৃ. ৩২৫, ঐ) এভাবে কথোপকথন চলতে থাকায় ক্যামেরাও চলেছে স্পষ্টভাবে—'নীলিমার উপর ক্যামেরা নিবদ্ধ হল। তারপর তাকেই ফ্রেমে ধরে রেখে তার এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে এল সোফায় বসে থাকা অনুপমকেও ছবিতে একত্র করবার জন্য। নীলিমা তখন উত্তেজিত ভাবে এগিয়ে আসতে আসতে বলে চলেছে, 'সত্যি করে বল কি তোমার আসল মতলব।' (পৃ. ৩২৬, ঐ) এজন্য তৃতীয় বন্ধনীতে উভয়ের ব্যবহার নির্দেশ করা হয়েছে। অনুপমের সঙ্গে নীলিমার বর্তমান স্বামী শ্রী শুভঙ্কর দত্তের তুলনাও নীলিমার অবস্থানকে ব্যাখ্যা করেছে। যেমন অনুপম বলেছে—'এই ইনি শ্রী শুভঙ্কর দত্ত,—দস্তুরমত সচ্চরিত্র সজ্জন, জীবনে সাফল্যের চূড়ায় ধাপে ধাপে উঠেছেন।' (পৃ. ৩২৭, ঐ) আর এইভাবে বিষয় ব্যাখ্যা করেছে, চরিত্র ব্যাখ্যা করেছে সংলাপগুলি, যা চিত্রনাট্যের পরিকাঠামোয় ধরা সম্ভব হয়েছে। ইতিমধ্যে ক্যামেরা নীচের তলার ল্যান্ডিঙে নেমে গেছে। 'নীলিমা টেলিগ্রাফ পিওনের খাতায় সই করে টেলিগ্রাম নিলে। তারপর সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়েও থেমে পড়ে খুলে ফেললে টেলিগ্রামটা।' (পৃ. ৩২৯, ঐ)

অনুপমও ভাঁজ খুলে দেখেছে টেলিগ্রাম। নীলিমার মুখে 'গাঢ় আচ্ছন্নতা' দেখা গেল, জানা গেল ইংরাজিতে টেলিগ্রামের বয়ান—'আটকে পড়েছি, কাল পৌঁছোব। দত্ত।' (ঐ) নীলিমার স্বামী আজ ফিরছেন না। এরপরেই চলে যেতে যেতে অনুপম বলেছে—'দরজাটরজা কিন্তু ভালো করে বন্ধ

করে রেখো নীল। ..... নেশা তেমন চাপলে হয়তো এখানে হানা দিতে আসতেও পারি।' (ঐ) এবং সে চলে যাওয়ার পর নীলিমা বিস্মিত হয়ে দেখেছে ফুলগুলির সজ্জা বাহারি ফুলপাতার মধ্যে 'তিনটে শুকনো, কাঁটা ওঠা মরা কাঠি আঁকাবাঁকাভাবে পোঁতা, (পৃ. ৩৩০)। এই আঁকাবাঁকাভাবে পোতা শুকনো কাঠি বিসদৃশ হয়ে উঠেছে। নীলিমার জীবনের সৌন্দর্যেও বেদনার কাঁটা হয়েছে উঠেছে অনুপম ও তাদের পুরনো সম্পর্ক। এইভাবে দৃশ্যের পর দৃশ্য সাজিয়ে নাটকীয়তায় তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে ইকেবানা গল্পটি। গল্পটি সজ্জার ধরণ, সংলাপ নির্মাণ, আবহ নির্মাণ গল্পটির বিষয়কে ব্যাখ্যা করেছে। ভিন্ন স্বাদের গল্পটি হয়ে উঠেছে অসাধারণ।

দৌবারিকের দু'কলম গল্পটি ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয় 'অমৃতবাজার পত্রিকা' র শারদসংখ্যায়। গল্পটি নিজেই বিবৃত করেছে চরিত্রটি। সংক্ষেপে গল্পটি এরকম —দৌবারিক গাঙ্গুলি একদিন 'নিজের অজানা ক্ষমতা' আবিষ্কার করে আশ্চর্য হয়েছে। 'কাগজের ওপর কলম ছোঁয়াতে না ছোঁয়াতে যেন বন্যাস্রোতে কথাগুলো সব বেরিয়ে আসে। অনায়াস স্বচ্ছন্দ লেখা। ভেতরে যেন সাজিয়েগুছিয়ে জমা হয়ে আছে। শুধু একটু দরজাটা খুলে দিলেই হল।' (পৃ. ৩০৮, ঐ) এই জমা কথাগুলি আসলে গাঙ্গুলির অভিজ্ঞতা। খবরের কাজগের সাব এডিটর হয়ে সে নিছক শখেই যাত্রার দলের পালা লিখেছিল। খবরের কাজগের চাকরির ভবিষ্যৎ যখন ঝাপসা সেই সময় শৌখিন যাত্রাপার্টির অনুরোধে বিশাল মাইনের বরাত পেয়ে সেই দলে ভিড়ে গেছে গাঙ্গুলি, টিকেও গেছে, এখানেই সে দেখেছে একটি ইংরেজী দৈনিকের সহকারী সম্পাদক সুধীরবাবু ও তার বোন এনাকে। এনাকে বিবাহ করে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করে মর্যাদায় ভূষিত হয়েছে গাঙ্গুলি। আর উত্থান ইতিহাস সূচনায় এসেছে অধর ঘোষ, তার প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে । তার প্রতিদ্বন্দ্বি অধর ঘোষ প্রথম থেকেই বিরুদ্ধাচরণ করেছে তাকে— 'তোমাদের দৌবারিকের দুকলম! রথের মেলায় পাঁপড় ভাজা।' (পৃ. ৩০৬, ঐ) অথচ গাঙ্গুলি জানে এটা তাদের 'পেশাগত প্রতিযোগিতা'র জায়গা। কিন্তু, সে নিজেও জানে সে যেভাবে পয়সা উপার্জন করছে তা 'ইয়েলো জার্মালিজম'ই বটে। অধর ঘোষের সরস উক্তি—'আমাদের কাগজ তাহলে হলুদ হচ্ছে' (ঐ) এখানে তাৎপর্য পায়। গল্পটি বস্তুত হতেই পারত সচেতনতার প্রকৃষ্ট আদর্শ। কিন্তু, গল্পটিতে ব্যক্তি হিসেবে সাংবাদিক ও তার কার্য এবং পেশাগত দিকটি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠায় গল্পটি ভিন্নধর্মী

অবস্থানেই রাখতে হয়—

প্রথমত, দৌবারিক গাঙ্গুলি নিজেই একজন সাংবাদিক। তার পেশাগত নানা দিক এখানে উঠে আসে।

দ্বিতীয়ত, দেশ কাল পরিস্থিতি গল্প বিষয়ে যুক্ত হয়ে যায়।

লক্ষ্য করার মত, গাঙ্গুলির এই পেশা গ্রহণের কারণও তার টিকে থাকার জন্য মরিয়া চেষ্টা—'আধঘণ্টা ধরে পাঁচবার পাঁচটা স্লিপ অন্তত অর্ধেক লিখে ফেলে দিয়েছে টেবিলের নিচের কাগজের ঝুড়িতে দলা পাকিয়ে। শেষেরটা কুটিকুটি করে ছিঁড়েছে নিজের ওপর রাগে।' (পৃ. ৩০৬, ঐ) আর অভিজ্ঞতা গাঙ্গুলিকে সাহায্য করেছিল তাই। সে আজকের জায়গায় পৌঁছেছে—'বাংলার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত জোতদার জমিদার মালিক ম্যানেজার মহাজন সদাগর থেকে চাষাভুষো কুলি-মজুর কতরকমেরই না মানুষ। ইচ্ছে যদি থাকে আর দেখবার জানবার চোখ আর মন তাদের সকলেরই কাছে পৌঁছাতে পারে। (পৃ. ৩০৯, ঐ) এভাবেই গাঙ্গুলিকে যেমন ব্যবহার করেছে সমাজ, তেমনি সেও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সমাজ থেকে অর্থ উপার্জন করেছে। দৌরাবিকের দুকলম এর বিষয়টি কেমন—তা জানিয়েছে গাঙ্গুলি—'দৌবারিকের দুকলম মার্জিত বিদগ্ধ তথাকথিত সাহিত্যিক রম্যরচনা জাতের লেখা নয়, বেশ একটু ধুলোকাদা লাগা মাটির গন্ধ মাখা হাট মাঠ ঘাটের সুর মেশানো জিনিস', (পৃ. ৩১০, ঐ) তাই ভদ্রসমাজে এর বৈশিষ্ট্য সস্তা বটতলা মার্কা। (ঐ) অথচ পাঠক সমাজে তার অবস্থান কিন্তু কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ গাঙ্গুলি 'নিজের কানে শুনেছে ট্রামে বাসে ট্রেনে সাধারণ পাঠককে আলোচনা করতে' (পৃ. ৩০৭, ঐ) আর কেউ ফোন করে উৎসাহ দিয়েছে। পেশাগত ক্ষেত্রে আন্তরিক তারিফও পেয়েছেন গাঙ্গুলি 'তা নাহলে দৌরাবিকের দুকলম আজ ওপরমহলে এই সম্মান পেত না।' (পৃ. ৩০৭, ঐ) তবে বর্তমানে দৌবারিকের দুকলম রচয়িতার অবস্থা ও অবস্থানটি এরকম পুরনো দিনের স্মৃতি সে ফেলে দিতে পারে না আবার বর্তমান সমাজের অভিজাত শ্রেণীতে সে উঠে এসেছে বলে তার সঙ্গে ক্রমাগত মানিয়ে নিয়ে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তাই তার অভিজ্ঞতার সঙ্গে কাদা কুড়িয়ে মেশাতে হয় লেখায়, ভান করতে হয় অভিজ্ঞতার। এজন্য মানসিক বেদনা ও অর্ন্তজ্বালাও যথেষ্ট চরিত্রটির। তাই গল্পে আছে—'কিন্তু এ সাফল্যের চূড়ায় গাঙ্গুলি আর থাকতে পারবে কি! বুকের

ভেতর একটা অস্ফুট ভয়ের কাঁপুনি সে অনুভব করে। কদিন ধরেই সেটা করছে। কলম থেকে সেই অবাধ অনর্গল শ্রোত যেন আগের মতো ঠিক অনায়াসে বেরিয়ে আসছে না। থেকে থেকে মনে হয় দুপুর থেকেই লেখাটা ধরলে যেন একটু নিশ্চিন্ত হতে পারে। নিজের কাছে মানের দায়ে তা পারছে না।' (পৃ. ৩১০, ঐ) আর গাঙ্গুলি দেখেছে এখন যেন সে নিজের কাছে নিজেকে গোপন রাখতে চায়, পাছে ধরা পড়ে এই ভয়ে, লাঞ্ছিত হওয়ার আশঙ্কায় সে প্রতিমুহূর্তে আশঙ্কিত হয়ে স্থিতি ধরে রাখতে চায়। দৌবারিকের জীবন থেকে স্বাভাবিকতা বিদায় নেয় ; সে ক্রমে একটি মেয়েকে দেখে—'মেয়েটির দেহের হিল্লোল ও কৌতুকমুগ্ধ হাসি, কিন্তু সে এতে অনুপ্রাণিত হয় না সে আবার ফিরে আসে লেখায়—'চুলোয় যাক। এখুনি গিয়ে না লিখতে বসলে নয়। বিয়ার খেতে খেতে একটা রাস্তা পেয়ে গেছে। সরস করবার মতো কিছু মজাদার মশলাও।' (পৃ. ৩১১) এসময়েই গাঙ্গুলির সঙ্গে দেখা হয় সীধু বলে একটি চরিত্রের এবং তখনই দৌবারিক গাঙ্গুলি প্রথম অনুভব করে দেশকালের পরিস্থিতি। সীধুর অস্বাভাবিকত্ব, তার হতভম্ব অবস্থা, আদালতে যাওয়া প্রভৃতি তাকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তরকালের আর্থিক দৈন্য ও গরিব মানুষের কথা, যাদের মাঝখানে একদিন সে ছিল— তা মনে করায়। এভাবেই সাংবাদিকের জীবন, দ্বন্দ্ব গল্পের বিষয় ওঠে। প্রাসঙ্গিকক্রমে চলে আসে সাংবাদিকতার ধরন, বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি। এ বৈশিষ্ট্যে গল্পটি অন্যতম হয়ে ওঠে।

'ঘটনা সামান্য' গল্পটি 'সালঙ্কারা' (১৯৬৬ খ্রিঃ) গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত। এ গল্পের কেন্দ্রীয় বিষয় ত্রিকোণ প্রেম। কিন্তু গল্পটিকে এভাবে সাজিয়ে তোলা হয়েছে যে সামান্য বিষয় অসামান্য হয়ে উঠেছে। দুটি ঘটনা এখানে যুক্ত হয়েছে। প্রথমত, সিনেমা— যার সম্পর্কে লেখক মন্তব্য করেছেন যে, কোন এক স্বনামধন্য লেখকের বইটি চিত্র রূপের আকার পেয়ে দর্শক ধন্য হয়েছিল। আর দ্বিতীয়ত, খবরের কাগজের একটি কাহিনি। খবরটা এই যে একটি মহিলা কর্তৃক প্রতারিত হয়েছেন একাধিক পুরুষ, এরকম খবর প্রায় মামুলি হয়ে এলেও খবরটির বর্ণনা বিশেষত্বে অনেকেরই সেটা চোখে পড়েছিল। এদুটিকেই মিলিয়ে দেখানো হয়েছে। এখানে সিনেমাটির নাম ঝটিকা। 'লেখক চিত্রনাট্যকার বা পরিচালক কার বাহাদুরি জানি না, কিন্তু ছবির আক্ষরিক পরিচয়লিপি পর্দায় মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে প্রথম দৃশ্যের প্রথম ছবিই মনটাকে ধরে ফেলে।' (পৃ. ১০৯, প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প, ২য় খন্ড) । সিনেমাটিতে

ক্যামেরার উল্লেখ ও ব্যবহার ক্রমপ্রকাশ্য চরিত্রগুলি গল্পটিতে সিনেমার আবহ তৈরি করেছে। যেমন ক্যামেরায় দেখানো দেওয়াল ঘড়ির দোলন, পাশের টেবিলে রাখা টেলিফোন, পাশে অনবরত ক্রুশকাঠির বুনন প্রভৃতি। এরপরে যুক্ত হয়েছে মূল গল্পটি। যে কারণে গল্পটি শুধুমাত্র প্রেমের গল্প হল না তার কারণও এখানেই নিহিত। মূল গল্পে বিষয়টি এরকম—ইলা ও সোমনাথ বিবাহিত দম্পতি। ইলা পূর্বে ভালোবাসত সীতেশকে, ঘটনাক্রমে তাদের বিবাহ হয় নি। কিন্তু অসুস্থ সীতেশ ইলাকে ভুলে যেতে পারেনি। মাঝে মাঝেই সে ইলাকে ফোন করেছে। ইলা বিড়ম্বনায় পড়েছে। স্বামী হিসেবে ভদ্র, সাধারণ মানুষ সোমনাথকে সে অগ্রাহ্য করতে পারে নি, অথচ সীতেশের আবেগ নাড়া দিয়ে গেছে ইলাকে। আবার সে কিছু প্রকাশও করতে পারেনি সংসার থেকে বিচ্যুতির ভয়ে। একদিন এমনই টেলিফোন এলে সোমনাথ তা ধরেছে, কথাবার্তায় জানা গেছে সীতেশ ও সোমনাথ একদা বন্ধু ছিল। একদিন হঠাৎ সোমনাথ ইলার অনুপস্থিতিতে তাদের বাড়িতে এসেছে সীতেশ এবং অসংখ্য মুক্তো ঘরে ছড়িয়ে, কিছু উপহার রেখে লুকিয়ে চলেও এসেছে সেখান থেকে। বাড়ি ফিরে তা দেখে ইলা বেরিয়েছে সীতেশকে খুঁজতে, তার সাথে সোমনাথও বেরিয়ে এসেছে। এভাবেই গল্পটি শেষ হয়েছে।

গল্পের সূচনায় দেখা যাচ্ছে, ইলা চরিত্রটিকে। টেলিফোন রিসিভার ধরতে। আবার, দেখা যায়—'একটি কোমল রঞ্জিত দীর্ঘ নখাগ্রলোভিত হাত রিসিভারটা হলেও মাঝপথে খানিক ধরে কান পর্যন্ত না উঠিয়েই নামিয়ে রাখে।' (পৃ. ১০৯, ঐ)। ইলা বুঝতে পারে এ ফোন তারই পূর্ব প্রেমিক সীতেশের। আর সীতেশকে দেখা যাচ্ছে হাসপাতালে যেখানে সেই তরল মুখের কল্পনাটা কিছুক্ষণ বাদে ক্ষুধিত ব্যাকুল দুটো চোখ হয়ে ওঠে শার্সির একেবারে কাছে এগিয়ে আসে। 'চোখ দুটো প্রায় শার্সির গায়ে লাগানো।' (পৃ. ১১৫, ঐ) সীতেশ সেখানে নার্সকে একটি গল্প শুনিয়েছে। গল্পটি সংক্ষেপে এই — 'সেই রাজপুত্র আর রাজকন্যার গল্প' (পৃ. ১১৬, ঐ) বা রূপকথার কাহিনি। 'হাসলে মানিক কাঁদলে মুক্তো' এমন সুন্দরী রাজকন্যাকে উদ্ধার করে দেশে ফিরছে রাজপুত্র। এমনসময় উঠেছে ঝড় তুফান। রাজপুত্র রাজকন্যাকে একলা রেখে গেছে অন্ন জলের খোঁজে। রাস্তায় এক যক্ষীবুড়ি রাজপুত্রকে দুচোখের বদলে দিয়েছে অন্ন জল। ফিরে এসে রাজপুত্র দেখেছে তারই সাঙাতের সাথে ফিরে গেছে রাজকন্যা। এই রূপকথার গল্পের মধ্যেই ধরা যাচ্ছে সীতেশের ট্র্যাজেডি। অন্যদিকে ইলার মুখ দেখে মনে হচ্ছে

'সে মুখ যেন মোম দিয়ে তৈরি, তাতে আনন্দ, বেদনা আশা-আকাঙ্ক্ষা কোনো ভাবের লেশমাত্র নেই।' (পৃ. ১১১, ঐ)।

আর 'বৃষ্টির ঝাপটার বাতির চারিদিকে একটা ঝাপসা আলোর মন্ডল' (পৃ. ১১০, ঐ) যা ক্যামেরা ধরে রেখেছে তা যেন প্রতীকী হয়ে ওঠে সম্পর্কগুলির ক্ষেত্রে বিশেষত বর্ষণ এবং 'ঝাপসা আলো' বিশেষায়িত হয়ে যেতে থাকে ইলার জীবনে। এই বৃষ্টির দিনটি তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে সম্পর্কগুলির ক্ষেত্রে। এই বৃষ্টির দিনে ইলার স্বামী সোমনাথ সম্পূর্ণ ভিজে বাড়ি ফিরেছে। সোমনাথ সাধারণ এবং স্বাভাবিক—'সোমনাথের রসিকতা অবশ্য মোটা ও মামুলি ধরনের।' (ঐ) সোমনাথ সহজ, সাধারণ এবং স্বাভাবিক। সে সর্বদা হাস্যমুখর, দায়িত্বপরায়ণ স্বামী। 'আনন্দের কলধ্বনি সেখানে স্বতঃস্ফূর্ত উপলক্ষ কিছু তার না থাকলেও চলে।' (পৃ. ১১১, ঐ) এবং চিত্রনাট্যে উভয়ের সম্পর্কের সূক্ষ্ম বিষয়গুলিকেও তুলে ধরা হয়েছে। সোমনাথ সেখানে বলেছে যে সে ট্রামের চাকার তলায় পড়ে গেছে তখন 'ইলার মুখে যেন চকিত একটা ছায়া সরে যায়। সেটা যন্ত্রণা, আশঙ্কা না বিরক্তির এবারে কিন্তু বোঝা যায় না ঠিক।' (ঐ) ইতিমধ্যে ড্রয়ারের চাবি হারায় সোমনাথ। উভয়ের সংলাপে ফুটে ওঠে সম্পর্কের আড়ালে লুকিয়ে থাকা গভীর গোপন বেদনা। যেমন—সোমনাথ বলে—'কিন্তু আমি তোমার ড্রয়ারে হাত দিতেই যে চাই না। সোমনাথের গলার স্বর ঠিক কৌতুকের নয় আর। 'তোমার লুকোনো কিছু যদি থাকে?' বলে, 'তুমি আমার কাছে ওই বন্ধ অদৃশ্য ড্রয়ারের মত অর্ধেক লুকনো থাকবে এই তো আমি চাই।' (পৃ. ১১২, ঐ) আর ইলার মুখ পাংশু হয়ে যায় তখন। সোমনাথও তখন নিছক সাধারণ থাকে না। এই কথোপকথনের সময় টেলিফোন বেজে ওঠে, বিবর্ণ ইলা ছুটে যায়—কারণ সে অনুভব করে যেন এ যেন শুধু যন্ত্রের আওয়াজ নয়, তার মধ্যে তীব্র একটা জীবন্ত আকুলতা কেমন করে মিশে গেছে।' (পৃ. ১১৩, ঐ) আর নাটকীয়ভাবে জানা যায় যে ফোনটা করেছে সীতেশ। ফোনটা ধরে সোমনাথ, জানা যায় উভয়ে পূর্ব পরিচিত এবং এককালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সোমনাথের কথায় জানা যায় সীতেশের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য—'যাক, তোর সে কবি-কবি ভাব এখনো যায় নি তাহলে।' কিংবা 'গলা ধাক্কা স্কুলের বন্ধুকে দেবনা নিশ্চয়, যদিও তোর সঙ্গে স্কুলের রেষারেষিটা এখনো ভুলিনি।' এবং 'তুই যা ক্ষীণজীবী ছিলি। টুসকি মারলেই ভেঙে পড়তিস।' (পৃ. ১১৩, ঐ) সোমনাথের এই খণ্ড খণ্ড

কথাগুলো মিলিয়ে নিলেই সীতেশকেও অনুভব করা যায়। আর 'ইলার মুখে আর কিন্তু সে শঙ্কা ব্যাকুল বিবর্ণতা নেই। সে মুখ চরম কি পরিণামের জন্য প্রস্তুত হয়ে এখন কঠিন হয়ে আসছে।' (পৃ. ১১৩, ঐ)

এইভাবে সম্পর্কের জটিলতা বুনন হয়েছে। ইতিমধ্যে নাটকীয়ভাবে একদিন আবির্ভাব ঘটেছে সীতেশের। সোমনাথ-ইলার সেদিন তাদের বিয়ের তারিখ। সেদিন তাদের বাইরে কোনো হোটেলে উৎসব পালনের ব্যবস্থা ছিল। ফিরে এসে তারা দেখেছে গেটের তালা খোলা ক্রমশ দেখা গেছে। সোমনাথ বলেছে—'আমাদের বাঁধানো ফোটো জোড়ার পাশে ওই ফুলদানিটা দেখতে পাচ্ছ? দেখতে পাচ্ছ ওতে কি ফুল! আমি তো রজনীগন্ধা এনে দিয়েছিলাম, ও ব্ল্যাক প্রিন্স এখানে কে রাখল'? (পৃ. ১১৮, ঐ) আর দেখা যাচ্ছে সারা ঘরে মুক্তো ছড়ানো। হঠাৎ ফোন বেজে উঠল এসময় জানা গেল অসুস্থ সীতেশ হাসপাতল ছেড়ে পালিয়ে গেছে। সে মুহূর্তেই ইলা সব ত্যাগ করে বেরিয়ে এল রাস্তায় এবং তার পিছনে সোমনাথ—'যে রাস্তায় ঝিরঝিরে বৃষ্টির পাতলা রহস্য গুন্ঠন সবকিছুর অর্থ বদলে দিয়েছে। (পৃ. ১১৯, ঐ) এরপরে 'বিষণ্ণ বৃষ্টি ভেজা' শহরে তারা পথে পথে ঘুরে খুঁজেছে সীতেশকে, নির্জন রাস্তায় পাতা বেঞ্চে একজনকে দেখে সন্দেহ হয় তাদের সীতেশ বলে—সন্দেহ কাটবার আগেই সিনেমার শেষ। অথচ খবরের কাগজের কাহিনি অন্যমাত্রায় নিয়ে যায় গল্পটিকে যেখানে দাঁতের ডাক্তারের চেম্বারে দু'জন ভদ্রলোক প্রতারিত হওয়ার গল্প শোনান। দুটি গল্প এভাবেই মাত্রাগত দিক থেকে আলাদা হয়ে যায়। খবরের কাগজের শিরোনাম—'বাতিল স্বামী, ফেরার স্ত্রী', 'স্বামী বাহুল্যের সমাধান' প্রভৃতি একটি গম্ভীর বিষয়কে জটিলতাকে হাস্যরসের মাত্রায় নিয়ে যায়। এভাবে দুটি ভিন্ন মাত্রায় গল্পটি অনবদ্য হয়ে ওঠে নিজস্বতায়।

হাস্যরসাত্মক গল্প —

আদ্যান্ত সিরিয়াস গদ্যলেখক প্রেমেন্দ্রের বেশ কিছু গল্পে অসামান্য হাস্যরস রসিকতার সন্ধান পাওয়া যায়। গল্পগুলি মূলত সরস নির্মল হাস্যরসে উজ্জ্বল। আর, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলি হিউমার। স্যাটায়ার বা পান-এর ব্যবহার করেছেন প্রেমেন্দ্র কদাচিৎ। প্রেমেন্দ্রের বিচিত্র সাহিত্যসম্ভারে ঘনাদা সিরিজ কিংবা ছোটদের হাসির গল্পে জীবনের অসঙ্গতি ও বৈসাদৃশ্যগুলি ফুটে উঠতে দেখা যায়। ছোটগল্পেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি, আলোচ্য গল্পগুলিই তার প্রমাণ।

'আদ্যক্ষর' গল্পটি 'প্রেমই ধন্বন্তরি' (১৯৫৯ খ্রিঃ) গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত। এ গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে অটলবিহারী। অটলবিহারী এবং চিকিৎসক ড. হোড়ের স্ত্রী কুন্তলিনী দেবী তাদের মেয়ে রুমা এদের নিয়েই যে নাটক তৈরি হয়েছে সেখানেই ধরা পড়েছে নির্মল হাস্যরস তথা হিউমার। অটলবিহারী আদর্শ সুখী মানুষ। বাপ তার গত হয়েছেন। 'ঘন ঘন সুপরামর্শ দিতে বা সাহায্য চাইতে আমার মতো আত্মীয়স্বজন নেই। চরিত্রটি মাত্রামাফিক সিগারেটের ধোঁয়ায় একটু কলঙ্কিত। চেহারা এমন যে ফিল্ম কোম্পানির চরও আসে না, আবার নৃতত্ত্ববিদদেরও কৌতূহল জানায় না।' (পৃ. ১, আদ্যক্ষর, প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প, ৩য় খণ্ড) এককথায় গড়পড়তায় সাধারণ মানুষ অটল। তার জীবনে কোনদিন প্রেম কিংবা বিষাদ আসেনি। বিবাহও করেনি সে। তার সংসারে বাজার করা, রান্না করা, ঘর সাজানো থেকে যাবতীয় হিসেবপত্র রাখা ইত্যাদির কাজ করে ও কর্তৃত্ব করে চাকর উদ্ধব। সে 'ধমক দেবার' মত পুরনো নয় এবং 'বাবুর চায়ে ক চামচ চিনি লাগে' (ঐ) না জানার মত নতুনও নয়। এককথায় অটল সুখী। এহেন অটলের শখ বলতে একমাত্র ব্রীজ খেলা। হঠাৎ সেই অটলের বাড়িতে একদিন সংকট ঘনিয়ে এল। বেজে উঠল টেলিফোন। 'টেলিফোন না বলে একে লেখক বলেছেন 'নিয়তি সংকট'। উদ্ধব ফোন ধরলে অটল ভেবেছিল যে ফোন করেছে তার তাস খেলার বিশিষ্ট বন্ধু জুলু ঘোষ—'এই সকালে টেলিফোন করতে বন্ধুবর জুলু ঘোষ ছাড়া আর কার উৎসাহ হতে পারে। কাল রাতের আলফা গামা ক্লাবের খেলায় চারটে 'নো ট্রাম্প' ডেকে পাঁচশো পয়েন্ট গুনাগার দিলেও' (ঐ) সে ভুল করেনি একথা জানাতেই জুলু ঘোষ ফোন করেছে এমনই ভেবেছে অটল। আর টেলিফোন ধরার সঙ্গে সঙ্গে জমে উঠল অন্য এক গল্প। উদ্ধবের বাক্যালাপে আশ্চর্য হয়ে অটল যখন কার ফোন জিজ্ঞেস করেছে তাকে তখন উদ্ধব জানিয়েছে 'আজ্ঞে মেয়ে পুলিশ' (ঐ) এবং তখন 'হঠাৎ রিসিভারটা রুদ্ধ গর্জনে প্রায় ফাটে আর কি! উদ্ধব বিচলিত অবস্থায় হাত চাপা দিতেই ভুলে গেছে। আচমকা কেঁপে উঠে সে যে রিসিভারটা ফেলে না দিয়ে অটলের হাতে তুলে দিতে পারল এই ভাগ্যি।' (ঐ)

এরপর রুদ্ধশ্বাস অভিজ্ঞতায় অটল দীর্ঘক্ষণ কথা বললে অপর প্রান্ত থেকে শোনা গেছে কণ্ঠ—'এক ঘণ্টা এখন বাড়ি থেকে বেরুবেন না, আমি যাচ্ছি।' (পৃ. ৩, ঐ) আর, উদ্ধব জানিয়েছে আরও তথ্য 'পেরথম শুধালেন এটা আপনার বাড়ি কিনা, তারপর শুধালেন আমি আপনি মানে কথা যে

কইছে সে আপনি, মানে আপনিই নিজে' (ঐ) এরপর মালিক ও ভৃত্যের আশঙ্কিত কৌতূহলকে তৃপ্ত করতে হঠাৎ বাড়িতে ঢুকেছেন যিনি, তিনি কুন্তলিনী, তার আবির্ভাব ও দৈহিক বৈশিষ্ট্যের অসঙ্গতি সৃষ্টি করেছে নির্মল হাসির—'যথাসময়ে কলিং বেল বাজল এবং তারপর অটলবিহারীর জীবনের মূর্তিমতী নিয়তি একহাতে একটি বেঁটে ছাতি ও আরেক হাতে —না, ভ্যানিটি ব্যাগ নয়—একটি মোটা অ্যাটাচিকেস নিয়ে প্রবেশ করলেন।' (ঐ) দীর্ঘক্ষণ অটলকে তার ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে জেরা করার পর এবং পুরুষের অর্বাচীন নাবালকত্ব ও দায়িত্বহীনতা বিষয়ে দীর্ঘ জ্ঞান দান করে 'ভদ্রমহিলা নিজেই হঠাৎ অ্যাটাচিকেসটি খুলে একটি চটি ছাপানো পুস্তিকা বার করে বললেন—'সাবালক হয়েও সামাজিক দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন নয়, আপনার মতো এইরকম মানুষই অবশ্য বেশি, আপনাদের জন্যেই আমার অকারণ পরিশ্রম বেড়ে যায়।' (ঐ)।

এরপরে ভদ্রমহিলা অর্থাৎ কুন্তলিনী দেবী চেয়েছেন অটলের ডাক্তারি সার্টিফিকেট। কারণ ভদ্রমহিলার কথায় 'আপনাকে বিয়ে করতে হবে' এবং 'বিয়ে আমাকে নয় আমার মেয়েকে।' (পৃ. ৪, ঐ) বিস্মিত অটল জানিয়েছিল বিয়ে সে করবে না। তখন 'অ্যাটাচিকেস উন্মুক্ত হল।' এবং আবার একপ্রস্থ পুস্তিকা বের করে সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে জ্ঞান দান করলেন কুন্তলিনী দেবী। ইতিমধ্যে জুলু ঘোষ প্রবেশ করে ট্রাম্প সম্পর্কে কালবার্টসনের প্রবন্ধ নিয়ে কথা বলতে গেলে ভদ্রমহিলা তাকে বিদ্রূপ করে উঠেছেন এবং তার উপর 'অ্যাসিটিলিন শিখা' বুলিয়ে দিলেন। এরপর অটল ঠিক করল সে আত্মগোপন করবে, অজ্ঞাতবাসে যাবে। কিন্তু দূরে যেতে গৃহমুখী অটল উৎসাহ পায় না—'দিল্লী মাদ্রাজে চলে যাব! খুব তো বললি। লিগ, শিল্ড, ব্রীজের দুটো কম্পিটিশনেরই হাড্ডাহাড্ডি খেলা চলছে। দেখা তো দূরের কথা, খবরটাও পাব না।' (পৃ. ৬, ঐ)।

অবশেষে চৌরঙ্গি অঞ্চলের একটি 'খানদানী অঞ্চলে' বাসা ভাড়া নেয় অটল। নিরিবিলি একটি ঘরে সে নিশ্চিন্তে কিন্তু নির্জনে থাকতে পারে—'একা একা একটু থাকা। কিন্তু অটলের তাতে খুব আপত্তি নেই। দেশী-বিলিতি সমস্ত নামকরা বইয়ের দোকান হাতড়ে সে যা বই জোগাড় করে এনেছে—একমাস তার তাতে পরমানন্দেই কেটে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান সঞ্চয়।' (পৃ. ৬, ঐ) এখানে নেহাত দরকার না হলে অটল বের হয় না। কিন্তু, সেখানেই সে পরিচিত হয় ডা: হোড়ের সঙ্গে। ডা: হোড়ের

মেয়ে রুমার প্রতি সে আকৃষ্ট হয় এবং মাঠে নৈমিত্তিক ভ্রমণে তাদের পরিচয় গভীর হয়ে ওঠে। একদিন অটল যায় ডা: হোড়ের চেম্বারে। অটলের ডায়েরিতে সেকথা লিখেছে—'যাইহোক আলাপ তো হল। বয়স হয়েছে কিন্তু বেশ রসিক আমুদে লোক। বললেন, 'যাক খুব ভুল করেন নি। লোকে গা চুলকালে আমার কাছে আসে আপনি না হয় গলা চুলকোতে এসেছেন।' (পৃ. ৭, ঐ) ইতিমধ্যে ডা: হোড় দেখতে এলেন অটলকে এবং সেখানে দেখলেন 'ব্রীজের বই'। ডা: হোড়ের সঙ্গে খেলা জমে উঠল সঙ্গী হল রুমা এবং অটলের বন্ধু জুলু ঘোষ—রোজ দুপুর ও রাতে তাদের খেলা চলতে থাকে। 'রুমা জোর করে না থামালে খেলা থামে না। ডা: হোড় তো টেনে হিঁচড়ে না নিয়ে গেলে উঠতেই চান না।' (পৃ. ৮, ঐ) এ অবস্থায় হঠাৎই জুলুর সঙ্গে ঐ বাড়ির সিঁড়িতে দেখা হয় সাক্ষাৎ কুন্তলিনী দেবীর—'তিনি এই বাড়ির সিঁড়ি দিয়েই নাকি নামছিলেন, জুলুকে উঠতে দেখে নিচে থমকে দাঁড়িয়েছেন।' (পৃ. ৮, ঐ) তখন জুলু ঘোষ ও অটল মিলে যে বুদ্ধি আউরেছে তাতে বিপুল হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছে—'বাথরুমে লুকিয়ে থাকব? মুখ কালি মেখে চেহারা বদলে নেব, পাগল সাজব?' (পৃ. ৯, ঐ) এরকম ভেবেছে অটল।

এরপরে নাটকীয়ভাবে শ্রীমতী সামন্ত প্রবেশ করেন ঘরে এবং দেখা গেল ডা: হোড় আর রুমা দুজনেরই মুখ শুকিয়ে আমসি। রুমা মাতৃ সম্বোধনে তাকে জানায়—'বাবার কোন দোষ নেই মা।' (পৃ. ৮, ঐ) এরপর জানা যাচ্ছে ডা: হোড় ও কুন্তলিনী দেবী স্বামী-স্ত্রী ; তাদের ঝগড়াটা শেষ হল ডা: হোড়ের বয়ানে, এইভাবে — 'তাস! একটামাত্র আমার প্রাণের শখ, তাও তোমার দুচোখের বিষ। তোমার ভয়ে আশ মিটিয়ে একদিন খেলতে পারিনি জীবনে। কিন্তু তোমার জুলুম এই শেষ। তোমার সব রোগের গোড়া এইসব বই লেখা আজ থেকে বন্ধ।' (পৃ. ৯, ঐ)

অবশেষে উপসংহারে দেখা গেল বিবাহিত অটল ও তার স্ত্রী রুমাকে। জানা গেল টেলিফোন গাইড ধরে পাত্র খুঁজেছিলেন রুমার মা। রুমা বলেছে—'টেলিফোন গাইডে নাম ধরে তালিকা থাকে না পদবী ধরে। অটল বলে নয়, নেহাত আঢ্য বলেই তরে গেছ।' (পৃ. ১০) এবং আদ্যক্ষর সম্বন্ধে লেখকের দার্শনিক ভাষ্য আছে গল্পের সূচনায়—'শুধু নামের, মানে নামের আদ্যক্ষরের সঙ্গে জীবনের কী গভীর গূঢ় যে সম্বন্ধ, তা আর কজন জানে।' (পৃ. ১, ঐ) গভীর এই ভাষ্য অটলের নাম নয় তার

পদবীকেই নিয়তি নির্দিষ্ট করে সম্পূর্ণ ভিন্ন যাপনে নিয়ে গেছে। আদ্যন্ত হাস্যকর এই গল্পটিতে জীবনের অসঙ্গতিগুলিকে অসামান্য করে তোলা হয়েছে। এইভাবে গল্পটি নিজস্বতায় অসাধারণ হয়েছে।

'পরোপকার' গল্পটি পূর্বোক্ত গল্পগ্রন্থেরই অন্তর্গত। গল্পটির কেন্দ্রে আছে কথকচরিত্রের বন্ধু মহীতোষ। গল্পসূচনায় আছে — 'গোলগাল নাদুস-নুদুস একটি ছেলে হায়ার বেঞ্চের তলায় বাঁ হাতে আমার দিকে একটি খাতা ও পেনসিল এগিয়ে ধরে আছে। তার হস্তী বিনিন্দিত চোখে সে কী অসীম করুণা!' (পৃ. ২২৯, ঐ) মহিতোষের উপকার নিঃস্বার্থ। কিন্তু তা অসঙ্গত পরিবেশ তৈরি করে তবু তখন কৃতজ্ঞতায় গলে গিয়েছিলেন লেখক। কিন্তু এই কৃতজ্ঞতা ও করুণা ক্রমে বিভীষিকায় পরিণত হল কথকের। যেমন একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করেছেন কথক—ঘটনাটি এই যে সেদিন মহিতোষের কাছ থেকে লাল নীল পেন্সিল পেয়ে এবং তা দিয়ে লিখতে পেরে কৃতার্থ হয়েছিলেন লেখক। অথচ এরপরেই পণ্ডিতমশায়ের কড়াগাট্টা এবং তৎসহ বিদ্রূপ সহ্য করে কথক উপকারের তারতম্য অনুভব করেন, পণ্ডিতমশাই বলেছিলেন—ওহে, মাইকেল এঞ্জেলো, না নন্দলাল, এটা কি আর্ট স্কুল? লাল-নীল পেন্সিলে চালচিত্তির আঁকা হয়েছে।' এরপরেও কথক খোঁড়াচ্ছেন দেখে এর কারণ জিজ্ঞেস করেছিল মহিতোষ—কথক তা উড়িয়ে দিতে চাইলেও মহিতোষ ছাড়েনি। অস্থির হয়ে উঠে বলেছে, 'ছিঃ ছিঃ! এত জোরে পা ছুঁড়েছি তা আমি বুঝতেই পারিনি।' (পৃ. ২২৯, ঐ)। এরপরেই মহিতোষ লেখার মাঠের ধার থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে এনে রস বেশ ভালো করে ছড়া জায়গায় ঘষে দিয়েছে। (ঐ) আর শেষ পর্যন্ত জায়গাটা পেকে উঠল ডাক্তারকে কাটাকাটি করতে হল—'পা-টাই কাটতে হবে ডাক্তার একবার বলেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার দরকার হয়নি। মাঝে মাঝে এখনো একটু খুঁড়িয়ে চলি, এইমাত্র।' (ঐ) এভাবেই ছাত্রজীবনেই মহিতোষের উপকার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠেন কথক। স্কুল থেকে কলেজে পৌঁছেও এই উপকারের মাত্রা কমেনি বরং বেড়েছে—'সেদিন হঠাৎ ঘুম থেকে উঠেই দেখি। আমার মেসের ঘরে মহিতোষ এসে হাজির। মুখখানা তার বড়বেশি গম্ভীর।' (পৃ. ২২৯, ঐ)।

গল্পকথকের প্রেমের ক্ষেত্রেই সে উপকার করতে গিয়ে সর্বনাশ ডেকে এনেছে বেশি করে। সেদিন হঠাৎই লেখকের মেয়ে এসেছে মহিতোষ এবং বেদনা কাঁদো কাঁদো হয়ে বলেছে 'তুই আমাকে এত পর ভাবিস তা জানতাম না। এত বড়ো একটা ব্যাপার—তুই আমায় ঘুণাক্ষরে কিছু জানাসনি।' (পৃ. ২৩০,

ঐ) লেখক জানিয়েছেন ঘটনাটি এই যে, তিনি অপর্ণা নামে একটি মেয়েকে ভালোবাসেন এবং বিয়ের তারিখ ঠিক—'শুধু গোল বেঁধেছে বিয়ের পর স্ত্রীকে কোথায় নিয়ে গিয়ে রাখব তাই নিয়ে।' (ঐ) এ ব্যাপারে পাত্রের মায়ের পছন্দ দেশের বাড়ি আর পাত্রীর বাবা চান কোলকাতাতেই বন্দোবস্ত করতে। এই মতবিরোধে বিয়েটা আটকে আছে। এরপরে আসরে নেমেছে মহিতোষ এবং 'সাতদিন বাদে অফিসের সময় খালি বাসের মতো সত্যিই সে এসে হাজির।' (ঐ) 'অফিসের সময় খালি বাস' বিষয়টি একাধারে বিভ্রান্তিকর ও তাৎপর্যপূর্ণ মাত্রা যোগ করেছে। জানা গেল ঘটনাটি এই যে—অপর্ণাদের বাড়ি গিয়ে মহিতোষ জানাল 'তোর ভাবী শ্বশুরমশাইকে গিয়ে সব জানিয়ে বললাম, 'বেশি ট্যান্ডাই-ম্যান্ডাই করবেন না মশাই ও মেয়ের বিয়ে দেওয়াই ভার হবে তা হলে।' (পৃ. ২৩০, ঐ) মহিতোষ আশ্বাস দিয়ে বলেছিল যে শ্বশুরমশাই চিঠি পাবেন-ই কথক এর ফলে যে চিঠি এল, তা ভাবী শ্বশুরের কাছ থেকে বিয়ে ভেঙে যাবার চিঠি।' শ্বশুরমশাই জানিয়েছেন, তাঁর মেয়ের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক যেন আর না রাখি।' (ঐ) এইভাবে প্রতিনিয়তই মহিতোষের উপকারের ঠেলায় অস্থির হয়ে উঠেছেন গল্প কথক। এরপরে ঠিক করেছেন—'মহিতোষের একটা উপকার না করে কখনো থাকা যায়! কিছুমাত্র কৃতজ্ঞতার বাষ্প যার মনে আছে সে অন্তত পারবে না।' (ঐ)।

এজন্য মহিতোষকে এক কবিরাজের সঙ্গে আলাপকরিয়ে দিয়েছেন কথক—'পেশাদার কবিরাজ তিনি নন, চিকিৎসা করেন শখ করে। কিন্তু এরকম বিচক্ষণ সর্ববিদ্যা বিশারদ কবিরাজ আর দুটি মিলবে না। মানুষের দেহ যে কী ভয়ঙ্কর বস্তু তা বুঝিয়ে দিতে তাঁর জোড়া নেই। তাঁর সঙ্গে ঘণ্টাখানেক আলাপ করলে সত্যি বেঁচে আছি কিনা সন্দেহ হয়।' (পৃ. ২৩১, ঐ) এর সাথে আলাপ করে মহিতোষ সম্পূর্ণ বাতিকগ্রস্ত হয়ে উঠেছে। সম্পূর্ণ বদলে গেছে সে। অন্যের দিকে মনোযোগী হবার সময় আর তার নেই। নিজেকে দিয়ে সদাব্যস্ত হয়ে উঠেছে। এর কদিন পরে মহিতোষকে দেখা যাচ্ছে 'বিপুল দেহভার নিয়ে মেঝের ওপর উবু হয়ে বসে হাঁপাতে হাঁপাতে মহিপাথরের খলে কি একটা ওষুধ মাড়ছে।' (পৃ. ২৩১, ঐ) সে বলেছে 'বসন্ত সুকুমার বটিকাটা ঠিক তিনশো তিপান্ন বার মাড়তে হবে কিনা। একটু কম কি বেশি হলে আর ফল হবে না, প্রায় হয়ে এসেছে।' (পৃ. ঐ) এভাবে মহিতোষও বাতিকগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। অবশেষে একদিন কথক দেখেছেন 'মহি খাটের ওপর চিত হয়ে শুয়ে আছে।

আমায় দেখে ক্লান্তভাবে মাথাটা তুলে করুণ স্বরে বললে, 'না ভাই, বাড়িতে ওষুধ তৈরি করাচ্ছি, বাজারের ওষুধের উপর কোন বিশ্বাস নেই।' (ঐ) মহিতোষ আরও বলেছে যে কবিরাজমশাই-এর প্রতি সে কৃতজ্ঞ কারণ কবিরাজমশাই উপযুক্ত নিদান বাতলে, সে মোটা হওয়া সত্ত্বেও, তাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। কথক তাকে যখন জিজ্ঞেস করেছেন যে সে কাজে বাইরে বের হয় কখন ? উত্তরে মহিতোষ জানিয়েছে— 'কখন আর বেরুর ভাই, আধঘণ্টা, পনেরো মিনিট অন্তর এক একটা ওষুধ খেতে হয়, সময় পাই না।' (ঐ)। তখন কথক ফিরে এসে ভেবেছেন যে এই ব্যবস্থা দীর্ঘদিন টিকবে না। তাই সেজন্য 'সেলে কেনা আমার সেকেণ্ড-হ্যান্ড মোটরটা ওকে দান করে দেব ঠিক করেছি। হ্যাঁ দানই করে দেব বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসাবে, যাতে কোনোদিন বিক্রি করবার কথাও ভাবতেও না পারে। অকালে চুল পাকাবার এমন মহৌষধি আর আমার জানা নেই। (পৃ. ২৩২, ঐ) এভাবেই বন্ধুত্বের এবং কৃতজ্ঞার বিভীষিকার উপযুক্ত শোধ তুলেছেন কথক। বর্ণনাগুলো ভাবনার অসামান্যতায় বিচিত্র হাস্যরসিকতায় গল্পটি অসামান্য হয়ে উঠেছে।

'একটি কড়া টোষ্ট' গল্পটিও 'প্রেমই ধন্বন্তরি' (১৯৫৯ খ্রিঃ) গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত। এ গল্পের বিষয় সিনেমা জগতের অভিনেত্রী শুভ্রাদেবীকে নিয়ে রূপালি জগতের ঝলমলে উজ্জ্বলতার পেছনে লুকিয়ে থাকা অন্ধকার এ গল্পে উঠে এসেছে, যুগপৎ স্যাটায়ার ও হিউমার ধর্মিতার মধ্যে দিয়ে। গল্পের বিষয় এই যে জনপ্রিয় চরিত্রাভিনেত্রী জনৈকা শুভ্রাদেবীকে নিয়ে প্রভূত অর্থ ব্যয়ে 'বনবিহঙ্গ' নামে একটি সিনেমা পরিকল্পনা করেন প্রযোজক শ্রী বংশীলাল। একদিন স্টুডিওতে এসে হঠাৎ 'মুড' হারিয়ে ফেলেন নায়িকা। সকলে মিলে এর কারণ অনুসন্ধান করতে থাকেন। এর পাশাপাশি সকলেই অনুরোধ করেন শুভ্রা দেবীকে কিছু খাওয়ার জন্য। অনেকের পেড়াপেড়ীতে প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও শুভ্রা দেবী মুখে তোলেন তারই জন্য আনা স্পেশাল টোস্ট। তখনই তার বাধানো দাঁতের পাটি খুলে পড়ে। এরপরেই সিনেমা জগৎ থেকে বিদায় নেন শুভ্রা দেবী। বনবিহঙ্গের নির্মাণ প্রভৃতি প্রসঙ্গে স্যাটায়ারের অবকাশ রেখেছেন লেখক—'বনবিহঙ্গের পরিকল্পনার পর নায়িকার চরিত্রে রূপ দেবার জন্যে কেমন করে সমস্ত চিত্ররাজ্য তোলপাড় করে তুলে বংশীলাল শেষ পর্যন্ত অভিনেত্রী কুলসম্রাজ্ঞী শুভ্রা দেবীকে মনোনীত করেন কি করে এই যুগান্তকারী চিত্রে অবতীর্ণ হওয়ার আগ্রহে মাত্র লক্ষ মুদ্রার বিনিময়ে

শুভ্রা দেবী নিজের অসামান্য প্রতিভা বংশীলালের তাবেদারিতে সমর্পণ করতে প্রস্তুত হন ..... সে কথা কারুই অবিদিত নেই।' (পৃঃ ৩৩, প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প, ৩য় খন্ড)। এজন্য অলকা স্টুডিওতে মহরত সম্পন্ন হল। বেশভূষা নিখুতভাবে বিন্যস্ত, পরিকল্পিত। কাপড়ের পাড়ের শিল্পী মঙ্গল মহাপাত্রের সঙ্গে তিব্বতের দালাইলামার পত্র বিনিময় ব্যবহার করা হল, অর্থব্যয় করে আনা হল দুটি চমরী গাই। তাদের 'Air Conditioned' গোহালে রাখা হল, সর্বোপরি নায়িকা শুভ্রা দেবী নিজের সত্তা সম্পূর্ণ ব্যবহার করার জন্য অনেক দিন লোকচক্ষুর আড়ালে সাধ না করেছেন। প্রতিদিন সংবাদপত্রের এই খবরগুলি জনমানসে আলোড়ন তুলেছিল। অথচ হঠাৎ এই সিনেমাটি বন্ধ হয়ে গেল—'এতদিন বাদে সে রহস্য উদ্‌ঘাটন করবার জন্যই এ কাহিনীর অবতারণা। রুদ্ধ নিশ্বাসে এ রহস্যের মীমাংসার জন্যে যাঁরা অপেক্ষা করে আছেন—।' (পৃ. ৩৩) তাদের জন্য যে খবর জানিয়েছেন লেখক তাতে মানুষ সম্পূর্ণ চমকিত হয়ে উঠতে পারেন। শুভ্রা দেবীর সুন্দর 'দন্তরুচি কৌমুদী' যে আসল নয় নকল দাঁতের পাটি তা জানা গেছে রহস্য উন্মোচনে। এখানেই ঘনীভূত হয়ে উঠেছে গল্পের হাস্যরস। লেখক জানিয়েছেন আরও, কড়া করে সেঁকা এক স্লাইস পাউরুটি এই ঘটনার জন্য দায়ী, ঘটনাটির বিবরণ দিয়ে লেখক বলেছেন যে—'মঞ্চ শিল্পীর ইন্দ্রজালে পাঁচ নম্বর ফ্লোরের একটি অংশ তিব্বতের পার্বত্য তুষার প্রান্তরে পরিণত হয়েছে। বিরাট প্রপেলারের প্রচণ্ড আবর্তনে তার ওপর দিয়ে চূর্ণ লবণ তুষার ঝড় হয়ে বয়ে যাচ্ছে।' (পৃ. ৩৩, ঐ) এইরকম আবহে তৈরি হয়ে উঠেছে।

এমন সময় জানা গেল নায়িকা শুভ্রা দেবীর 'মোটরে স্টুডিওতে আসতে আসতে হঠাৎ কোন পথের মোড়ে শুভ্রা দেবী তার অভিনয়ের মুড হারিয়ে এসেছেন।' (পৃ. ৩৪, ঐ) এভাবেই উন্মুক্ত হয় রূপোলি জগৎ হারানোর কারণ, সংক্ষেপে এই যে 'সৌজন্যহীন' এক ট্রাফিক কনেস্টেবল পৌর রাজপথে 'তুচ্ছ' একটা নিয়ম ভঙ্গ করার দায়ে স্বয়ং শুভ্রা দেবীর গাড়ি দাঁড় করিয়ে তার নম্বর ইত্যাদি টুকে নিয়েছে। অসাধারণ প্রতিভাময়ী প্রতি সাধারণোচিত এই ব্যবহারে শুভ্রা দেবী গম্ভীর শুভ্রা দেবীর চেহারার বিবরণ দিয়েছেন লেখক—'তিনি শুভ্রা। তাঁর ম্যাক্স ফ্যাক্টর লেপিত গাঢ় শ্যাম গাত্রবর্ণের জন্য নয়, তাঁর অপরূপ দন্তরুচি কৌমুদীর জন্য। যে দন্ত রুচি দেখা না গেলে যেহেতু তাঁর অভিনয়ের আসল মাধুর্যই লুপ্ত।' (পৃ. ৩৪, ঐ) আর তার দেহবর্ণ 'ম্যাক্স ফ্যাক্টর লেপিত গাঢ় শ্যাম'। (ঐ) তাই এভাবেই

যাবতীয় অসঙ্গতিকে বিষয় করে আলোচ্য গল্পটিতে কোথাও বিদ্রূপ কোথাও নির্মল হাস্যরস আমদানি করেছেন লেখক। এরপরেই দেখা গেছে শুভ্রা দেবীর 'মুড' ফিরিয়ে আনার জন্য চিত্র নির্মাতা বংশীলাল তাকে অনুরোধ করছেন ক্রমে আবসকলেও। এরপরের ঘটনাটি এরকম—শুভ্রাদেবী যিনি গোটা ইন্ডাস্ট্রির প্রাণকেন্দ্র। যাকে ঘিরে সমস্ত ইন্ডাস্ট্রির উজ্জ্বলতা, তিনি যখন গম্ভীর হয়ে গেছেন, তার 'মুড' আনার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা করেছে সকলেই। এখানেই সৃষ্টি হয়েছে হাস্যরস। বংশীলালের সঙ্গে অন্যান্যরাও অনুরোধ করেছে শুভ্রা দেবীকে কিছু খেতে। শুভ্রা দেবী প্রথমে অস্বীকার করেও পরে মুখে তুলেছেন একটি কড়া করে সেঁকে আনা টোস্ট এবং দাঁত লাগানোর সাথে সাথে তার দু'পাটি নকল দাঁত উপড়ে উঠে এসেছে— 'চিত্র জগৎ থেকে এরপরেই বিদায় নিয়েছেন শুভ্রা দেবী। দেখা গেল, ট্রের ওপর দুপাটি কুন্দ শুভ্র বাঁধানো দাঁত পড়ে আছে।' (পৃ. ৩৪, ঐ) এখানেই ধরা পড়ে গেছে শুভ্রা দেবীর ছদ্মবেশ। ধরা গেছে তার 'মুড' হারানোর গূঢ় তত্ত্বটি। সেইসঙ্গে গ্ল্যামার জগতের অসহায় অন্তঃসার শূন্যতার চিত্রটিও ফুটে উঠেছে। গল্পটির শেষাংশটিতে ঘনিয়ে এসেছে হিউমার—সেইদিন থেকে শুভ্রাদেবী ছায়ালোক থেকে নিরুদ্দেশ। তিনমাস ধরে তার জন্য ব্যর্থ সন্ধান করে ভগ্ন হৃদয় প্রযোজক ও পরিচালক শ্রী বংশীলাল মার্কিন প্লেনে তাঁর বার্থ বুক করেছেন এই সেদিন।' (পৃ. ৩৪, ঐ)। এইভাবে গল্পটিতে একাধারে কমেডি এবং সূক্ষ্ম হলেও বিষাদের ছায়া ঘনিয়ে এসেছে, গল্পটির সার্থকতা এখানেই।

এইভাবে বিচিত্র ধরনের গল্পে, জীবনরসিকতায়, নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতায়, সমকালের জটিলতায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে প্রেমেন্দ্রের ছোটগল্পগুলি সার্থকতর হয়ে উঠেছে।